NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EEC

PAPER 6
MODULES XXI-XXIV

ELECTIVE ECONOMICS
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, 2020

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau
of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক অর্থনীতি

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায় EEC : 06 : 21

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	শ্রীমতী রাপ্তী রায়	অধ্যাপক আশিস দাশগুপ্ত
একক 2	ঐ	ঐ
একক 3	ঐ	ঐ

পাঠক্রম ঃ পর্যায় EEC : 06 : 22

রচনা	সম্পাদনা
অধ্যাপিকা শেফালি কর	অধ্যাপক আশিস গুহ এবং শ্রীমতী রাপ্তী রায়

পাঠক্রম ঃ পর্যায় EEC : 06 : 23

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	অধ্যাপিকা অর্চিতা ঘোষ	অধ্যাপক আশিস দাশগুপ্ত
একক 2	ঐ	ঐ
একক 3	ঐ	ঐ

পাঠক্রম ঃ পর্যায় EEC : 06 : 24

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	অধ্যাপক বিবেকানন্দ মুখার্জী	অধ্যাপক গৌতম গুপ্ত
একক 2	ঐ	ঐ
একক 3	ঐ	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EEC – 06

অর্থনীতির ঐচ্ছিক পাঠক্রম

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
21

একক 1	❑	ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের ধরন	7-41
একক 2	❑	ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবে মূলধনের প্রবাহ	42-53
একক 3	❑	অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে উদার অর্থনৈতিক নীতি	54-72

পর্যায়
22

একক 1	❑	জাপানে মেইজি-শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা	75-90
একক 2	❑	জাইবাৎসু	91-95
একক 3	❑	চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস	96-103
একক 4	❑	চীনে সাম্প্রতিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কার	104-108

পর্যায়
23

একক 1 ❑ পরিবেশ এবং অর্থব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 111-116

একক 2 ❑ নিঃশেষযোগ্য সম্পদ এবং পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদ 117-139

একক 3 ❑ দূষণ ও বাহ্যিকতা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের একাধিক পদ্ধতি 140-176

পর্যায়
24

একক 1 ❑ পরিবেশের মূল্যায়ন 179-193

একক 2 ❑ পরিবেশ ও উন্নয়ন 194-199

একক 3 ❑ পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ 200-208

একক ১ ☐ ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের ধরন

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ শিল্পবিপ্লবের সূচনা

- ১.২.১ শিল্পবিপ্লবের সময়কাল
- ১.২.২ প্রাক্ শিল্পবিপ্লব আমলে ব্রিটেনের পরিস্থিতি

১.৩ ব্রিটেনেই শিল্পবিপ্লব ঘটল কেন

১.৪ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ধরন

- ১.৪.১ বস্ত্রশিল্প
- ১.৪.২ লৌহশিল্প

১.৫ জন বিপ্লব

- ১.৫.১ জনসংখ্যার সময়ানুক্রমিক হিসাব
- ১.৫.২ জনসংখ্যার হিসাব থেকে প্রাপ্ত তথ্য
- ১.৫.৩ পেশা অনুযায়ী জনসংখ্যার বৃদ্ধি
- ১.৫.৪ মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়া
- ১.৫.৫ জন্মহার বৃদ্ধি

১.৬ কৃষি বিপ্লব

- ১.৬.১ উৎপাদনের নতুন কৌশল
- ১.৬.২ গণ্ডিবাঁধন আন্দোলন
- ১.৬.৩ কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর
- ১.৬.৪ শিল্পায়নে কৃষি বিপ্লবের অবদান

১.৭ পরিবহণ বিপ্লব

- ১.৭.১ সড়ক উন্নয়ন
- ১.৭.২ খাল নির্মাণ
- ১.৭.৩ রেলপথ নির্মাণ
- ১.৭.৪ পরিবহণ বিপ্লবের অবদান

১.৮ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পবিপ্লব

১.৯ সারাংশ

১.১০ অনুশীলনী

১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ব্যাখ্যা করতে পারবেন—

- তদানীন্তন ব্রিটেনে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল, যেগুলিকে আমরা সম্মিলিতভাবে শিল্পবিপ্লব আখ্যা দিতে পারি।
- এই বিপ্লব ঘটেছিল জনসংখ্যা, কৃষি, বাণিজ্য, পরিবহণে। সব মিলিয়েই সূচিত হয় তথাকথিত, প্রথম শিল্পবিপ্লব 'First Industrial Revolution'।

১.১ প্রস্তাবনা

১৭৫০ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের এই শিল্পবিপ্লব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বুঝতে হবে তদানীন্তন ব্রিটেনের পরিস্থিতি কেমন ছিল। এখনকার উন্নয়নশীল দেশগুলির মতোই কি ছিল তার আর্থিক অবস্থা?

এ ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হল শিল্পবিপ্লবের কারণ কী?

এই কারণ অনুসন্ধান পর্বে আমাদের ধরতে হবে বিপ্লবের পুরো প্রক্রিয়াটিকে। তবে ইতিবাচক এভাবে ধরতে হলে শুধু ১৭৫০ সালটিকে বিভাজন রেখা হিসাবে নেওয়া সম্ভব নয়। শুধু ব্রিটেন নাম দেশটিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করাও যায় না। এর জন্য আমাদের শুরু করতে হবে সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের পরিস্থিতি দিয়ে। আসলে ইউরোপ, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপকে, না জানলে আমরা বুঝতে পারব না, প্রথম শিল্প বিপ্লব কেন ব্রিটেনেই ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব অর্থনীতি থেকে ক্রমেই নিজের সময়কালের তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছিল পশ্চিম ইউরোপ। এর সূচনা ওই সপ্তদশ শতাব্দীতেই। অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদরা এই সময়টিকে অনেক সময়েই সঙ্কটের কাল বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, উন্নয়নের কিছু কিছু সূচক এই সময়ে বাড়লেও সবগুলি বাড়েনি।

প্রথমত, এই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতে দেখা গিয়েছে। মধ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপে শুধু যে এই হার কমেছিল তা নয়, প্রকৃত জনসংখ্যাই কমছিল। এর জন্য দুর্ভিক্ষ কিছুটা দায়ী হলেও সচেতন

প্রচেষ্টাও নজরে পড়েছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সমতা বজায় ছিল না ইউরোপের সব অঞ্চলের মধ্যে। শিল্পেও দেখা দিয়েছিল মন্দা। ষোড়শ, এমনকি পঞ্চদশ শতকে ইতালিকে কেন্দ্র করেই মূলত বিকাশ ঘটেছিল শিল্পের সেখানে ছিল হস্তশিল্পীদের প্রাধান্য। পাশাপাশি, ফরাসি দেশ, বেলজিয়াম এবং ইংল্যান্ডে ছিল বস্ত্র কারখানা। ব্রিটেনের রপ্তানি বাণিজ্যে পশমের জামাকাপড় রপ্তানির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কিন্তু ওই পশম শিল্পেও দেখা দিল মন্দা। এর জন্য দায়ী তদানীন্তন ইউরোপের যুদ্ধবিগ্রহ। অন্য দিকে, লাতিন আমেরিকা থেকে আমদানি করা রূপো ও দামী পাথরের পরিমাণও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক থেকে কমতে শুরু করে। ফলে মুদ্রার দোকানে দেখা দেয় ঘাটতি।

পাশাপাশি তখনকার অর্থনীতিতে ছিল কৃষির প্রাধান্য। কিন্তু ব্যবসায়ীদের হাতে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমা হচ্ছিল, তা খরচ করতে তাঁরা পারছিলেন না, কারণ, কৃষিপণ্যের মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া শিল্পপণ্যের বাজারে পরিধি ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সাবেক অর্থনীতির এই সঙ্কটই মানুষের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল।

ষোড়শ শতকের ইউরোপে কৃষিকে কেন্দ্র করে যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল, তা ছিল মূলত দুটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে—বল্টিক ও অন্যান্য অঞ্চল এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। তবে স্পেনও ছিল বাণিজ্যের আর একটি কেন্দ্র। সেখানে থেকে মূলত আমদানি করা হত রূপো। বিনিময়ে স্পেন কিনে নিত শিল্পে উৎপন্ন পণ্য। কারণ, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও ব্রিটেনের তুলনায় স্পেন ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। তবে ১৬২০-র দশক ঘটে যায় জন-বিপর্যয়। স্পেনের উপনিবেশগুলির জনসংখ্যা কমে যায়, বহু কর্মীর মৃত্যু ঘটে। স্পেনে রূপোর খনিতে কর্মরত শ্রমিক মারা যান। প্রয়োজন হয়ে পড়ে ইউরোপীয় বাণিজ্য ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার, তাকে আরও সক্রিয় করার। আর, ঠিক এটাই ঘটেছিল দুটি দেশের নেতৃত্বে—নেদারল্যান্ডস এবং ব্রিটেন তার আধিপত্য বজায় রেখেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত। তারপর তার স্থান দখল করে নেয় ব্রিটেন।

১.২ শিল্পবিপ্লবের সূচনা

এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে আর্থিক সমৃদ্ধি আসে একটি শিল্পবিপ্লবের হাত ধরে। নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন (যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাদ দিয়ে) হল এমনই এক পরিস্থিতি, যেখানে, কোনও একটি প্রজন্মের তুলনায় তার পরবর্তী প্রজন্ম বেশি উৎপাদন ও ভোগ করতে সক্ষম হয়। তবে এই পরিস্থিতি সেই সব রাষ্ট্রেই আসে, যেখানে শিল্পের বিকাশ ঘটে। উন্নত দুনিয়া এবং আজকের উন্নয়শীল দুনিয়ার মধ্যে জীবনযাত্রার মানের যে ফারাক, তার মূল কারণ একটাই—উন্নত দুনিয়ায় শিল্পোন্নয়ন ঘটেছে, উন্নয়নশীল বা তথাকথিত পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে ঘটেনি। সমকালীন ব্রিটেনকে সমগ্র ইউরোপের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল এই শিল্পায়ন—যা প্রথম শিল্পবিপ্লব বলে খ্যাত।

এর মানে অবশ্য এই নয় যে, নিয়ম করে শিল্পবিপ্লবের মতো একটি ঘটনা প্রতিটি দেশে ঘটতেই হবে। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে অর্থনীতির গঠনে এমন কিছু পরিবর্তন আসবে, যেগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং স্থায়ী। এইসব পরিবর্তনকেই সম্মিলিত ভাবে শিল্পবিপ্লব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন স্তরে ঘটলেও এগুলি একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত।' পরিবর্তনগুলি হল :

১। উৎপাদনে আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ ;

২। পরিবারে ব্যবহারের বদলে দেশের বা বৈদেশিক বাজারের জন্য উৎপাদনের লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষায়ণ ;

৩। গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরাঞ্চলে বাস করার প্রবণতা বৃদ্ধি ;

৪। উৎপাদনের সাবেক ব্যবস্থার ভিত্তি প্রসারিত হওয়া, যাতে তা পরিবার বা জনজাতির উপর কম নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। বরং শিল্পসংস্থার ধাঁচে তা গঠিত হতে থাকে।

৫। কৃষিজ পণ্য উৎপাদন ছেড়ে আরও বেশি সংখ্যক শ্রমিকের শিল্প বা পরিষেবা ক্ষেত্রে যোগদান ;

৬। হাতে কাজ করার বিকল্প এবং পরিপূরক হিসাবে মূলধনের আরও ব্যাপক ও নিবিড় প্রয়োজ ;

৭। নতুন সামাজিক ও পেশাগত শ্রেণী তৈরি হওয়া। জমি ছাড়া উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ (যেমন, মূলধন) এর মালিকানার ভিত্তিতে তৈরি হয় এইসব নতুন শ্রেণী।

পরস্পর নির্ভরশীল এইসব পরিবর্তন যদি একসঙ্গে ঘটে, যথেষ্ট ব্যাপকতার সঙ্গে ঘটে, তাহলেই তাকে শিল্পবিপ্লব বলা যেতে পারে। সব সময়েই এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে থাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বার্ষিক উৎপাদন (পণ্য ও পরিষেবা) বৃদ্ধি।

সেই ব্রিটেনের প্রথম শিল্পবিপ্লবের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তা ঘটেছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তার জন্য প্রয়োজন হয়নি সরকারি সহায়তার—যা পরবর্তী কালে এটা শিল্পবিপ্লবগুলিতে প্রয়োজন হয়েছিল।

১. ২. ১ শিল্প বিপ্লবের সময়কাল

শিল্পবিপ্লবের দিনক্ষণ একেবারে নির্দিষ্ট করা না গেলেও আর্নল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) ১৭৬০ সালকেই সূচনা বর্ষ হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ, যিনি বিষয়টি সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটি ধারণা তৈরি করে দেন। তবে মার্কিন ঐতিহাসিক অধ্যাপক নেফ (J. Nef)-এর মতে বৃহৎ শিল্প বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন চোখে পড়েছে ষোড়শ শতাব্দী এবং সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই। আসলে নেফ বলেছেন, এই বিপ্লব রাতারাতি ঘটেনি, এটি ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, যা শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে এবং শেষ হয় ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে শিল্প রাষ্ট্র (industrial state) গঠন হওয়ার মধ্য দিয়ে।

সম্প্রতি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেও ঐতিহাসিকরা শিল্পবিপ্লবের সূচনা পর্বটি ধরতে চেয়েছেন। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নথিপত্র তাঁরা এই উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছেন। ১৯২০-র দশকে পল মান্টু (P. Mantoux) লিখেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে, ব্রিটেনের বন্দরগুলির মাধ্যমে আমদানি, রপ্তানি এবং পণ্য পরিবহনের রেখা উঁচুতে উঠতে উঠতে একসময়ে লম্বের আকার নিয়েছে। অর্থাৎ, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৭৮১ সালের মন্দার পর থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে উন্নয়নের সূচকগুলি। অধ্যাপক টি এস অ্যাশটন (T. S. Ashton) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : ১৭৮২ সালের পর থেকে শিল্পোৎপাদনের সব ক্ষেত্রেই উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। জাহাজে করে কয়লা পরিবহন ও তাম্র খনন বা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার অর্ধেকের বেশি ঘটেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ১৮ বছরেই। সাধারণ কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির ৭৫ শতাংশ, ছাপানো কাপড়ের ৮০ শতাংশ, সুতিবস্ত্রের রপ্তানির ৯০ শতাংশও ঘটেছে ওই একই সময়ে। জার্মান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জি ডব্লিউ হফম্যান (G. W. Hoffman) ব্রিটেনের শিল্পোৎপাদনের একটি সূচক তৈরি করেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, "১৭৮০ সালেই সর্বপ্রথম শিল্পোন্নয়নের বার্ষিক হার ২ শতাংশ ছাড়িয়েছিল। তারপর এক শতকেরও বেশি সময় ধরে এই হার কমিয়ে রাখতে পেরেছিল ব্রিটেন।"

বর্তমান তাই ধরে নেওয়া হয় ১৭৮০-র দশক থেকেই সূচনা হয় প্রথম শিল্পবিপ্লবের। এই ধারণাটিকে আরও স্পষ্ট আকার দিয়েছেন অধ্যাপক ডব্লিউ ডব্লিউ রসটো (W. W. Rastow)। তাঁর মত হল ১৭৮৩-১৮০২ সময়কালেই আধুনিক সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপতি হয়েছিল। ওই সময়েই ব্রিটেনের অর্থনীতি যাত্রা শুরু করে উন্নয়নের পথে (রসটোর ভাষায় 'টেক-অফ' (take off) থেকে 'সেল্ফ সাসটেইন্ড গ্রোথ' (self sustained growth) পর্বে প্রবেশ করে ব্রিটেনের অর্থনীতি।) এই সময়েই আধুনিকতার বীজ প্রোথিত হয় এবং ক্রমে তা স্বতঃপ্রণোদিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপ নেয়, যার থেকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি ব্রিটেনকে।

১. ২.২. অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ প্রাক্-শিল্পবিপ্লব আমলে ব্রিটেনের পরিস্থিতি

প্রাক্-শিল্পবিপ্লব পর্বে কেমন ছিল ব্রিটেনের পরিস্থিতি? তা কী এখনকার উন্নয়নশীল দেশগুলির মতোই (যেমন এশিয়া, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকা) ছিল? শিল্পোন্নত ব্রিটেনের সঙ্গে তদানীন্তন ব্রিটেনের ফারাক কী ছিল? ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গেই বা তার পার্থক্য কী ছিল?

বিংশ শতাব্দীর উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা পাই : তাদের হতদরিদ্র অবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের শ্লথ গতি, অদক্ষ শ্রমিক এবং উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি দেশের মধ্যেই আঞ্চলিক বৈষম্য। এইবার আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে হলে দেখতে হবে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডে কতটা উপস্থিত ছিল।

(ক) দারিদ্র্য : জাতীয় আয় সংক্রান্ত তথ্যের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায় ওই সময়কার ব্রিটেন কতটা দরিদ্র ছিল। তদানীন্তন ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস-এর জন্য জাতীয় আয়ের সর্বপ্রথম হিসাবে প্রকাশ করেন গ্রেগারি কিং (Gregory King)। ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা কতটা জোরালো ছিল, তা তুলে ধরার জন্য

গ্রেগারি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই হিসাব দাখিল করেন। পরবর্তী প্রয়াসে ব্রতী হন জোসেফ ম্যাসি (Jossef Massie)। এর পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে আরও অনেক হিসাব আমরা পাই।

এই সমস্ত তথ্য পুনর্বিন্যাস করে আমরা জানতে পারি যে, সপ্তদশ শতকের শেষে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস-এর মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় ছিল বছরে ৮ থেকে ৯ পাউন্ডের মধ্যে। ১৭৫০-এর দশকে তা বেড়ে হয় ১২ থেকে ১৩ পাউন্ড এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে পৌঁছে যায় ২২ পাউন্ডে। পাশাপাশি, ১৭৫৪ থেকে ১৯৫৪-র মধ্যে মূল্য সূচকের ওঠা-পড়া অনুধাবন করলে জানা যাবে এই দু' শতকে মূল্যস্তর ৬ গুণ বেড়েছে। তবে অধ্যাপিকা ফিলিস ডিন (Phyllis Deane) প্রথম শিল্পবিপ্লবের প্রাক্কালে ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের সঙ্গে ষাটের দশকের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির একটি তুলনা টেনেছেন। ১৭৫০-এর দশকে মাথাপিছু জাতীয় গড় আয় যদি বছরে ১২ পাউন্ড হয়ে থাকে, তাহলে মূল্যবৃদ্ধি ধরলে ষাটের দশকের গোড়ায় তা দাঁড়াবে ৯০ পাউন্ডের মতো। কিন্তু ওই সময়ে ভারতের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় ছিল ৩০ পাউন্ডের কম। ব্রাজিল ও মেক্সিকোর মতো দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলিতে তা ছিল মোটামুটি ওই অষ্টাদশ শতকের ব্রিটেনের সমান। এই সমস্ত হিসাব একান্তভাবেই অনুমান নির্ভর হলেও এখান থেকে একটি সত্য সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়—প্রথম শিল্পবিপ্লবের ঠিক আগে উন্নয়নের যে পর্যায়ে ইংল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছিল, তা ছিল দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার প্রথম শিল্প প্রসারের সময়কার তুলনায় অনেকটাই বেশি।

পাশাপাশি, সেই সময়ে প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে যথেষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্জন করতে পেরেছিল ব্রিটেন। শীতকালে মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়া, মাঝে মাঝে ঘটা দুর্ভিক্ষ, অত্যাধিক জনবহুল শহরগুলিতে মহামারী-এসব বাস্তব সমস্যা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটেন অর্জন করেছিল কিছুটা উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদন, অর্থনীতিতে কিছুটা অগ্রগতি।

বেশিরভাগ দেশের তুলনাতেই সাধারণভাবে ইংরেজদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী তিনটি রাষ্ট্র ছিল হল্যান্ড এবং ফ্রান্স। গ্রেগরি কিং এবং অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) এই মনোভাব ব্যক্ত করলেও এ বিষয়ে সংশয় নেই যে, অন্য দেশগুলির তুলনায় গড়ে একজন ইংরেজ শ্রমিকের সে সময়ে ভাল খাবার, ভাল জামা পরার সংশয় নেই যে, অন্য দেশগুলির তুলনায় গড়ে একজন ইংরেজ শ্রমিকের সে সময়ে ভাল খাবার, ভাল জামা পরার এবং ভালভাবে থাকার মতো যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি ছিল। ফ্রান্স পরিভ্রমণের সময়ে আর্থার ইয়ং (Arthur Young) এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ইংরেজ শ্রমিকের তুলনায় একজন ফরাসী শ্রমিকের অবস্থা ছিল ৭৬ শতাংশ খারাপ। সেই কারণেই ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন, এখনকার উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির মতো অন্য-দেশের সমৃদ্ধি দেখে হতাশায় ভুগতে হয়নি ইংরেজদের।

(খ) উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে থাকা : প্রাক্-শিল্পায়ন যুগের আর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল জীবনযাত্রার নিচু মান এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না পাওয়া। যদিও বা কিছুমাত্র উন্নতি ঘটে, তখনই তা আবার নীচে নেমে যায়। কাজেই চোখে পড়ার মতো কোনও পরিবর্তন ঘটে না। জনসংখ্যা, মূল্যস্তর এবং

উৎপাদনশীলতা—এই তিনটি ক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বগতি যে ঘটবেই এমন নিশ্চয়তা থাকে না। গ্রেগরি কিং এবং স্যার উইলিয়াম পেটি-র (William Petty) হিসাব অনুসারে অষ্টাদশ শতকের প্রথম চার/পাঁচ দশকে জনসংখ্যা ছিল ৫৮ থেকে ৬০ লক্ষের মধ্যে। ওই সময়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার এতই কম ছিল যে, জীবনযাত্রার মান একশো ভাগ বাড়াতে হলে সময় লাগত দেড়শো বছর। যুদ্ধ, মহামারী কিংবা অজন্মা এক বছরের মধ্যে মুছে দিত সমস্ত অগ্রগতি। বস্তুত প্রাক্-শিল্পবিপ্লব আমলের ইংল্যান্ডে সাধারণভাবে প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হার ছিল ০.৫ শতাংশেরও কম। প্রকৃতপক্ষে ওই সময়ে কোনও কারণে জনসংখ্যার বাড়লে মাথাপিছু উৎপাদন কমে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক প্রবণতা। আবার উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি বা নতুন কাঁচামাল আবিষ্কার কিংবা নতুন বাজার তৈরি হওয়ার ফলে উৎপাদন বাড়লে অচিরেই বেড়ে যেত জনসংখ্যা। ফলে মাথাপিছু আয়ের প্রাথমিক বৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি শূন্যে এসে ঠেকত। তবে সমৃদ্ধি এবং মহামারীর পরম্পরা চলতে থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ছিল যৎসামান্য।

সমাজে প্রতিপত্তি সে যুগে পুরোপুরি নির্ধারিত হত জমির মালিকানা দিয়ে। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করত জমির উর্বরতার উপর। শ্রমিকের এক জায়গা থেকে অন্যত্র গমনও নির্ধারিত হত ১৬৬২ সালের বসবাস আইনের মাধ্যমে। দরিদ্রদের ভরণ-পোষণের ভার পুরোপুরি নিতে হত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গির্জা (প্যারিশ)-কে।

(গ) কৃষির উপর নির্ভরশীলতা : প্রাক্-শিল্পায়ন পর্বের অর্থনীতি সচরাচর কৃষি-নির্ভরই হয়ে থাকে। ১৮৪১ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের জনগণনার পেশার বিভাজন না থাকার ফলে অবশ্য বলা সম্ভব নয়, ঠিক কতজন কৃষিতে যুক্ত ছিলেন। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃষক পরিবারের অনুপাত ছিল ৬৮ শতাংশ। ১৭৫০ সাল নাগাদ তা কমে দাঁড়ায় ৬০ শতাংশের মতো।

যাইহোক, প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটুকু জানা যায় যে, ব্রিটেনের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি-নির্ভর। জনবসতি গ্রাম-নির্ভর এবং উৎপাদনের মূল একক ছিল পরিবার। মুখ্য শিল্প বলতে ছিল বস্ত্র। তবে তার বাণিজ্য ছিল দেশের মধ্যেই সীমিত এবং গুরুত্বের দিক থেকে তা ছিল কৃষির নীচে।

পরিবারের প্রায় প্রত্যেক সদস্যই যেহেতু পশমের বস্ত্র বয়ন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, সেই কারণে এটা অনুমান করা শক্ত নয় যে, প্রতি দশ জনের একজন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডে বেশিরভাগ বাসিন্দাই ছিলেন গ্রামে। তবে শহরের প্রসার ইতিমধ্যেই ঘটতে শুরু করেছিল। গ্রেগরি কিং-এর পরিসংখ্যানে আবার ফিরে আসা। তিনি দেখিয়েছেন ১৬৯৫ সাল নাগাদ ইংল্যান্ড ও ওয়েল্‌স প্রদেশের ২৫ শতাংশ মানুষ শহরে থাকতেন, কিংবা বাজার-কেন্দ্রিক ছোট শহরে। তবে এইসব ছোট শহর আসলে ছিল বড় গ্রামেরই নামান্তর। লন্ডন শহরের জনসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ। এ ছাড়া ছিল আরও ৩টি শহর, যেখানে জনসংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়েছিল। এগুলি হল : নরউইচ (Norwich) (২৯ হাজার) বিস্টল (Bristol) (২৫ হাজার বার্মিংহ্যামে (Birmingham) (১২ হাজার)।

কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষে লন্ডন ছাড়াও দ্রুত উঠে এসে বড় শহরের খ্যাতি অর্জন করে অন্য শহরগুলি। লিভারপুল, বার্মিংহ্যাম, নরউইচ, ব্রিস্টলের জনসংখ্যা ২৫ হাজার ছাড়ায়। শহর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ম্যাঞ্চেস্টারও (Manchester)। প্রতি ৫ জন ইংরেজের একজন বাস করতে শুরু করেন বড় শহরে।

(ঘ) পেশাগত বিশেষায়ণের অভাব : প্রাক্-শিল্পবিপ্লব আমলের অর্থনীতির অপর বৈশিষ্ট্য হল শিল্পে শ্রমিকদের বিশেষায়ণের অভাব। সাধারণত এখন দেখা যায় উৎপাদনের এক একটি পর্যায়ের দায়িত্বে থাকেন এক একজন শ্রমিক। আবার বিভিন্ন ধরনের শিল্পেও একজনের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু শিল্পায়ন শুরু হওয়ার আগে একই ব্যক্তির সব কাজ করাটা আদৌ আশ্চর্যের বা ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল না।

অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডে ফিরে এলে কিন্তু নজরে পড়বে যে, সেখানে বিশেষায়ণের ততটা অভাব ছিল না। অন্তত বর্তমানে এশিয়া বা আফ্রিকায় এখনও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেভাবে পরিবার ভিত্তিক, তদানীন্তন ইংল্যান্ডে তা ছিল না। শিল্পে পিছিয়ে থাকা দেশগুলিতে কিন্তু পরিবারভিত্তিক উৎপাদন শুধুই ব্যবহৃত হয় নিজেদের পরিবারের সদস্যদের জীবনধারণে, তা বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবেশ করে না বাজারে। কিন্তু সপ্তাদশ শতকের মধ্যেই এ ধরনের উৎপাদন গৌণ হয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডে। আর তার আরও একশো বছর বাদে ১৮০৩ নাগাদ এই ক্ষেত্রটি ইংল্যান্ড এবং ওয়েল্‌স প্রদেশে প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গিয়েছিল বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন প্যাট্রিক কলকুহান (Pattrick Colquhoun)।

বিশেষায়ণকে অবশ্যই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে ধরা যেতে পারে। জমি নেই, এমন শ্রমিক অর্থাৎ 'প্রোলেতারিয়াত' (Proletariat) শ্রেণীর উদ্ভব হতে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডেই।

পারিবারিক উৎপাদন প্রথা নিশ্চিহ্ন হওয়া বা শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডে কিছু কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গড়ে ওঠা। উত্তর আমেরিকা, ভারত, আফ্রিকা ইত্যাদি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পাদিত হত চার্টার্ড কোম্পানির মাধ্যমে। বাণিজ্যের ঝুঁকি নেওয়ার জন্য ছিলেন 'আন্ডার রাইটার' (Under writer) এবং বিমা ব্রোকাররা। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড স্থাপিত হয়ে যায় ১৬৯৪ সালেই। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যেই ব্রিটিশ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সে দেশের সরকার এবং বিদেশী বণিকদের এক উন্নত আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছিল।

(ঙ) বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগের অভাব : শিল্পের উন্মেষ ঘটার আগে সাধারণতঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক সংযোগ থাকে নামমাত্র। শুধু পরিবহণ ব্যবস্থা নয়, ফারাক থাকে প্রধান খাদ্য ইত্যাদিতেও। এটা অবশ্য আবহাওয়ার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, ক্রয়ক্ষমতা রুচি ইত্যাদির উপরও নির্ভরশীল।

অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ড সম্পর্কিত পরিসংখ্যানে শ্রীমতী গিলবয় (Gilboy) দেখিয়েছেন, লন্ডন, ল্যাঙ্কাশায়ার এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বেতন বৃদ্ধি/ হ্রাসের প্রবণতা এবং তার অঙ্কে যথেষ্ট ফারাক ছিল। পণ্য মূল্য ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কেও একই কথা খাটে। সেই কারণেই একটি অঞ্চলের পরিসংখ্যান অন্যান্য অঞ্চলে প্রযোজ্য হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, তদানীন্তন ব্রিটেন অষ্টাদশ শতক থেকেই চিরাচরিত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমে। ত্যাগ করতে শুরু করে। জনসংখ্যা, মূল্যস্তর, উৎপাদন এবং আয়—১৭৫০ থেকে সবই যে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

১.৩ ব্রিটেনেই শিল্পবিপ্লব ঘটল কেন?

শিল্পবিপ্লব ঘটার প্রেক্ষিত ব্রিটেনে তৈরি হয়েই ছিল। প্রাক্-শিল্পবিপ্লব আমলে ইংল্যান্ড তথা ব্রিটেনের পরিস্থিতি অনুধাবন করেই তা আপনারা বুঝতে পেরেছেন।

অথচ প্রাক্-বিপ্লব ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই, সে সময়ে ফ্রান্সেই অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী রাষ্ট্র ছিল। শিল্পের বিকাশও সেখানে ঘটেছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লব যে সেখানে হতে পারেনি, তার অন্যতম কারণ ফরাসী বিপ্লবের পরে সেগুলির ধ্বংসপ্রাপ্তি।

অন্যদিকে ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বেশ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল ব্রিটেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই তার এই যাত্রা শুরু হয়। নতুন নতুন দেশে উপনিবেশ গড়তে শুরু করে ব্রিটেন। আসলে উপনিবেশগুলির অর্থ কিছুটা বাণিজ্য, কিছুটা শোষণের মাধ্যমে যে ব্রিটেনের হাতে এসেছিল, ঐতিহাসিকরা সেটা স্বীকার করেন। বাণিজ্যের হাত ধরে ব্রিটেনে উৎপন্ন পণ্যের বাজার আর ওই ক্ষুদ্র দেশটির গণ্ডির মধ্যে সীমিত রইল না। বাজার ছড়িয়ে পড়ল প্রায় সমগ্র বিশ্বে। আবার বাজার বাড়াই শ্রমের বিশেষায়ণের পথ সুগম করেছিল, যার হাত ধরে ঘটতে থাকে একের পর এক যন্ত্রের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন।

এই বাণিজ্য বৃদ্ধির মূলে ছিল ব্রিটেনের শক্তিশালী নৌবহর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সব যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলিতে ব্রিটেন যুক্ত ছিল। কিন্তু বেশিরভাগই দেশের বাইরে ঘটেছিল বলে ধ্বংসের আঁচ তার গায়ে লাগেনি। তাই শক্তিশালী নৌবহরের দৌলতে ফ্রান্স, হল্যান্ড, স্পেনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল ব্রিটেন। ব্রিটেনের এই সাফল্যে বাড়তি ইন্ধন জুগিয়েছে এখানকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, যা ফ্রান্স বা জার্মানির ছিল না। তাই সেখানে সুস্পষ্ট কোনও শিল্পনীতিও তৈরি হয়নি।

এই নীতিহীনতার জন্যই কোনও সার্বিক বাণিজ্য নীতি ফ্রান্স বা জার্মানিতে ছিল না। যেমন, ফ্রান্সকে ভাগ করা হয় চারটি শুল্ক অঞ্চলে। জার্মানি বিভাজিত হয় সাড়ে তিনশো স্বাধীন অঙ্গরাজ্যে। প্রতিটি অঞ্চল এইসব দেশে ইচ্ছামতো শুল্ক বসাতো, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চালাত। অন্যদিকে ব্রিটেনে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ব্যবস্থা অনেক বেশি সক্রিয়, ছিল বলে শিল্পদ্রব্যের ব্যাপক চাহিদাও গড়ে উঠেছিল।

শিল্পবিপ্লবের পক্ষে ব্রিটেনের আর যে-সুবিধাটি ছিল, তা হল এখানে দাস প্রথা বা বেগার শ্রমিক/ভূমিদাস প্রথার প্রচলন ছিল না। ভূমিদাসরা জমিতে কাজ করতে বাধ্য ছিল বলে ইচ্ছা করলেই কারখানায় যোগ দিতে পারত না। তাই ইউরোপের এইসব দেশে শিল্পে প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগান ব্যাহত হত।

ব্রিটেনের এই সমস্ত সুবিধাকে তালিকার আকারে লিখলে দেখা যাবে—

১। এখানে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ও শোষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত মূলধন ছিল। ওই অর্থই বিনিয়োগ করা হয় শিল্পে।

২। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে শক্তিশালী নৌ-বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল।

৩। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে শিল্পসামগ্রীর বিশাল বাজার গড়ে উঠেছিল।

৪। শিল্পে শ্রমের যোগান ছিল, বিশেষায়ণের সুযোগ ছিল, যা বিভিন্ন উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

১.৪ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ধরন

বিপ্লবের পূর্বাবাস ব্রিটেনের অর্থনীতিতে ছিলই। তার সূচনা কিন্তু হয় বস্ত্রশিল্পে নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে। বয়নের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে এই শিল্পে উৎপাদন বাড়ে, তার গুণমানও বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের ঢেউ এসে লাগে লৌহশিল্পে। ১৭৯৩ সালে জেম্‌স ওয়াট (James Watt) বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করার পর থেকেই এর শুরু। জর্জ স্টিভেন্‌সনের (George Stevenson) রেল ইঞ্জিন তৈরি, ছাপাখানা তৈরি ইত্যাদি লোহার চাহিদা আরও বাড়িয়ে দেয়।

বস্ত্রশিল্প ও লৌহশিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলি নিয়ে আমরা এবার আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করব।

১.৪.১ বস্ত্রশিল্প

অধ্যাপক রস্টো শিল্পবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষেত্রটিকেই চিহ্নিত করেছেন 'প্রথম উড়ান সূচনার (টেক-অফ) মূল ক্ষেত্র' হিসাবে। জে. এ. শুমপিটারের (J. A. Schumpeter) মতে, 'ইংরেজদের শিল্পোন্নতির ইতিহাস (১৭৮৭-১৮৪২) কার্যত একটি শিল্পের অগ্রগতি দিয়েই বর্ণনা করা যেতে পারে'। অধ্যাপক ফিলিস ডিনও বলেছেন, শিল্পবিপ্লবে বস্ত্রশিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, বস্ত্রশিল্প কেমন করে বিপ্লবের নেতৃত্ব তুলে নিয়েছিল।

বহু শতক ধরেই বস্ত্রশিল্পীরা ব্রিটেনের জাতীয় আয়ে বড় রকমের অবদান রাখছিলেন। তবে শিল্পবিপ্লবের ঠিক আগে পশম শিল্পে এবং পশম সামগ্রী বয়নেই ইংল্যান্ড বিশেষ উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। আসলে প্রচুর চারণভূমি থাকার দরুন এখানকার ভেড়াদের থেকে মিলত উঁচু মানের পশম। তার থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পশম বস্ত্র তৈরি করার দক্ষতা অর্জন করেন প্রস্তুতকারকরা।

তুলনায় বস্ত্রশিল্প ছিল কিছুটা পিছিয়ে। ভারতীয় মসলিনের তুলনায় দাম বা গুণমানের দিক থেকে ব্রিটেনের বস্ত্র ছিল নিকৃষ্ট। প্রাচীন হাত-চরকা দিয়ে যে ধরনের মোটা কাপড় বোনা হত, তার উৎপাদনও ছিল কম, চাহিদাও সীমিত। পশম ও বস্ত্র দুটি শিল্পই অবশ্য ছিল পরিবার নির্ভর। একমাত্র ম্যাঞ্চেস্টার ছাড়া বাকি সব শহরের তন্তুবায়রা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকও ছিলেন। সুতো আসত লেভান্ট, আমেরিকার দক্ষিণের প্রদেশগুলি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে। পাউন্ড প্রতি দর ছিল সেরা মানের পশমের চেয়েও বেশি। ১৭৬০-এর দশকের প্রথম দিকে বার্ষিক বিক্রির অঙ্ক ছিল মাত্র ৬ লক্ষ পাউন্ড। রপ্তানির গড় মূল্য ছিল মাত্র ২ লক্ষ পাউন্ড। অন্যদিকে পশম সামগ্রী রপ্তানির মূল্য ছিল সাড়ে ৫ কোটি পাউন্ড।

বস্ত্রশিল্পে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল ১৭৩০-এর দশকে আবিষ্কৃত 'ফ্লাইংশাট্‌ল' (Flying Shuttle) যেটি আবিষ্কার করেন প্রযুক্তিবিদ 'কে'। বস্ত্র ও পশম দুটি শিল্পেই বয়নের এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। দ্বিতীয়টি হল 'পল' (Paul) আবিষ্কৃত 'কার্ডিং মেশিন' (Carding Machine)। ১৭৮৪ সালে পেটেন্ট নেওয়া এই যন্ত্রটি ল্যাঙ্কাশায়ারের বিখ্যাত কাপড়কলগুলিতে স্থান করে নেয় ১৭৬০ নাগাদ। তবে এই যন্ত্রগুলি বস্ত্রশিল্পের সঙ্কট কাটাতে পারেনি। এই দুটি যন্ত্র আবিষ্কারের আগে চিরাচরিত প্রথায় তিন থেকে চারজন সুতো প্রস্তুতকারী একজন তন্তুবায়কে কাঁচা মাল সরবরাহ করত। ফ্লাইং শট্‌ল তন্তুবায়ের কাপড় বোনাকে আরও দ্রুত করলেও সুতোর যোগান আসতে লাগল সেই আগের গতিতে। সুতরাং সুতোর ঘাটতি আরও প্রকট আকার ধারণ করল। দেশের মধ্যে এবং বিদেশে বস্ত্রের চাহিদাপূরণ করাও ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠছিল না। সেই পথ করে দিল 'হারগ্রিভস' (Hargreaves) আবিষ্কৃত 'স্পিনিং জেনি' (Spining Jenny)। ১৭৬৪ সালে আবিষ্কৃত এই যন্ত্রের পেটেন্ট নেওয়া হয় ১৭৭০ সাল। এর আগেও যে যন্ত্রে সুতো কাটা হয়নি, তা নয়, তবে চিরাচরিত চরকাকে পিছনে ঠেলে দেওয়ার মতো এতটা সফল আবিষ্কার এর আগে হয়নি এই শিল্পে। ১৭৮৪ সাল নাগাদ এই ধরনের সুতো কাটার যন্ত্র এত বিশাল আকার ধারণ করেছিল যে, তাতে ১০০ থেকে ১২০টি মাকু পরানো যেত। তাই একজনের পক্ষে চিরাচরিত পদ্ধতিতে যে পরিমাণ সুতো কাটা সম্ভব হত, তখন তা বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ। তাই কম শ্রমে বেশি পরিমাণ সুতো কাটা সম্ভব হচ্ছিল। ১৭৭০ থেকে ১৭৮৮—এই সময়ের মধ্যে সুতো কাটার পদ্ধতি আমূল বদলে দিয়েছিল হারগ্রিভ-এর এই যন্ত্র। পশম তৈরি কমতে কমতে প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছিল, লিনেনের কদরও ছিল না বললেই চলে। সুতিই হয়ে উঠেছিল কর্মসংস্থানের কেন্দ্রবিন্দু।

তবে সুতি বস্ত্রশিল্পে বিপ্লব যদি কোনও মন্ত্র ঘটিয়ে থাকে, তাহলে সেটি হল 'ওয়াটারফ্রেম' (Waterframe)। ১৭৬৯ সালে আর্করাইট (Arkwright) যেটির পেটেন্ট নিয়েছিলেন। বয়নের সময় টানা ও পোড়েন-দুটি ক্রিয়ার উপযুক্ত শক্ত সুতো সেই প্রথম তৈরি হল ব্রিটেনে। এতদিন টানা-র জন্য লিনেন ব্যবহার করতে হত। শুধু পোড়েনের জন্য ব্যবহৃত হত সুতি। তাই ওয়াটার-ফ্রেম-এর সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেনে তৈরি হল পূর্ণাঙ্গ সুতি বস্ত্র। জেনি ছোট, বড় সব আকারেরই হত বলে তা পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থাতেও ব্যবহৃত হত। কিন্তু ওয়াটার-ফ্রেম প্রথম থেকেই ছিল কারখানায় ব্যবহারোপযোগী। প্রথমে এটি চালানো হত জলবিদ্যুতে, পরে বাষ্পে। পরিবারভিত্তিক থেকে কারখানাভিত্তিক শিল্পের পত্তন হয় এর মাধ্যমে।

কয়েক বছর বাদে ক্রম্পটন (Crompton) তাঁর 'মিউল' (Mule) যন্ত্রের পেটেন্ট নেন ১৭৭৯ সালে। এটি ছিল জেনি এবং ওয়াটার ফ্রেম-এর মিলিত রূপ। এর ফলে এত মসৃণ ও সূক্ষ্ম সুতো তৈরি সম্ভব হল যে, ভারতীয় বস্ত্রকেও তা প্রতিযোগিতায় পিছনে ফেলে দিল।

১৭৮০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে তুলো আমদানি বেড়ে যায় আট গুণ। তার থেকে বোনা সুতোও হয়ে ওঠে আগের থেকে অনেক সূক্ষ্ম, অনেক শক্তও। ১৮১২ নাগাদ একজনের পক্ষে যে পরিমাণ সুতো কাটা সম্ভব ছিল, তা হারগ্রিভ-এর জেনি আবিষ্কারের আগে করতেন ২০০ জন মিলে। ফলে সুতো কাটা ক্রমেই পূর্ণাঙ্গ পেশার রূপ নিতে লাগল। এতদিন তন্তুবায়রা এ কাজ কৃষিকর্মের পাশাপাশি চালাতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ছিল পরিবারের মধ্যে সীমিত। কিন্তু তন্তুবায়রা দেখলেন সুতোর যোগান নিয়মিতভাবে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে, আয়ও বাড়ছে। তাই তাঁদের অনেকেই কৃষি ছেড়ে বস্ত্রশিল্পকেই পূর্ণ সময়ের পেশা হিসাবে বেছে নিতে শুরু করলেন। ফলে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার প্রবণতা দেখা দিল। বাষ্পশক্তির ব্যবহার এমন এমন স্থানে সুতো কারখানা স্থাপনের সুযোগ করে দিল, যেখানে জলাশয় নেই (অর্থাৎ জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করা সম্ভব নয়)।

তবে সুতো তৈরিতে যে ধরনের পরিবর্তন এসেছিল, তার তুলনায় পিছিয়ে ছিল বস্ত্রবয়ন শিল্পের আধুনিকীকরণ। ১৮২০, ১৮৩০ বা ১৮৪০-এর দশকের আগে পর্যন্ত ছিল হস্তচালিত তাঁদেরই প্রাধান্য। তার পর থেকে অবশ্য স্থান করে নেয় বিদুৎচালিত তাঁত।

তবে, মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে এককোণে পড়ে থাকা শিল্প থেকে সুতো তৈরি যে প্রথম স্থানে উঠে আসে, অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত ওয়েল্‌থ অব নেশন্‌স-এ (Wealth of Nations) সে কথা উল্লেখ করেছেন। ১৮০২ সালে তা গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের ৪ থেকে ৫ শতাংশ দখল করে নেয়। ১৮১২ সাল নাগাদ তা পৌঁছে যায় ৭ থেকে ৮ শতাংশে। এ দিক থেকে তা পিছনে ফেলে দিয়েছিল পশম শিল্পকে। এই পর্যায়ে সুতোকলগুলিতে নিযুক্ত ছিলেন ১ লক্ষ কর্মী, তন্তুবায় হিসাবে আরও ৫ লক্ষ। ১৮১৫ সাল নাগাদ ব্রিটেনের রপ্তানি মূল্যের ৪০ শতাংশ আসত সুতিবস্ত্র থেকে, পশমবস্ত্র থেকে ১৮ শতাংশ। ১৮৩০ নাগাদ সুতিবস্ত্র রপ্তানি ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

প্রকৃত অর্থে বস্ত্রশিল্পের বিকাশের হার ছিল আরও বেশি। কারণ গুণমান বাড়লেও দর কমতে থাকে এত দ্রুত গতিতে, যার নজির উৎপাদনশিল্পের ইতিহাসে ছিল না। সুতির দাম ১৭৮৬/৮৭ সালের প্রতি পাউন্ডে ৩৮ শিলিং থেকে কমে ১৮০০ সাল নাগাদ দাঁড়ায় ১০ শিলিং। ১৮০৭-এ ৬ শিলিং, ৯ পেন্স। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার কারণে তা বেড়েছে আরও বেশি হারে।

কিন্তু কারখানাগুলির উৎপাদন ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বাজার একসময়ে পড়তির দিকে যেতই। ব্রিটিশ বণিকরা একের পর এক রাষ্ট্রে সরবরাহ করতে শুরু করায় তা অবশ্য ঘটতে পারেনি। সেই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে রপ্তানি ১৭৮০-র দশকের তুলনায় বাড়ে ১০ গুণ। নেপোলিয়নের যুদ্ধ পর্ব সাঙ্গ হওয়ার মধ্যে তা বেড়েছিল আরও তিনগুণ।

সুতো তৈরিতেই কেন এই নবদিগন্ত সূচিত হয়েছিল, তার কিছু কারণ এখানে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কায়েমি স্বার্থের সংঘাতের ফলে ব্যাহত হয় পশম শিল্পের বিকাশ। রেশম শিল্প আমদানি শুল্কের অত্যধিক বোঝার ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে লিনেন বস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান আশানুরূপ বাড়ানো যায়নি।

তবে সুতি বস্ত্রশিল্পের উন্নতি এসেছিল ওই সব বস্ত্রশিল্পের অতীত সাফল্যের ইমারতের উপর ভিত্তি করেই। সেইসব শিল্পে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই এক্ষেত্রে কাজে লেগেছে। কারণ সে যুগে বেশিরভাগ ইংরেজ পরিবারই কোনও না কোনও ধরনের বস্ত্রতৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিল। পারিবারিক শিল্প একদিনেই কারখানাভিত্তিক হয়ে ওঠেনি। তবে যে হাজার হাজার সুতোকল ও তাঁর কুটিরগুলিতে চলত, তাই এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। ওই ছোট ছোট সুতো প্রস্তুতকারী বা তন্তুবায়রা না থাকলে ওই পরিমাণ উৎপাদনের জন্য গড়তে হত অসংখ্য কারখানা। তার জন্য আবার প্রয়োজন হত শত শত ধনী শিল্পপতির, যা বাস্তবে সম্ভব ছিল না। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও চাহিদা বাড়াবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই শিল্প যে উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল, তার মূল কারণ কিন্তু ওই সব ছোট ছোট পারিবারিক উদ্যোগ। সবাই আগ্রহী ছিল বলেই যন্ত্রগুলির প্রসার ঘটেছিল অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডে।

শ্রম-নিবিড় শিল্প হওয়াটাও সুতিবস্ত্র শিল্পের প্রসারের আর একটি কারণ। ওই সময়কার ইংল্যান্ডে দক্ষ তন্তুবায়রা সংখ্যায় উদ্বৃত্তই ছিলেন।

আর একটি কারণ হল ভারতীয় সুতিবস্ত্র ও মসলিনের কল্যাণে এই পণ্যটির জন্য নতুন করে রুচি বা চাহিদা তৈরি করতে হয়নি। বাজার তৈরি হয়েই ছিল। দেশের মধ্যেই আরও ভাল পণ্য তৈরি হতে শুরু করল এবং কম দাম হওয়ায় তা অনেকেরই সাধ্যের মধ্যে চলে এল, তখন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেল বাজারের পরিধি। লিনেন ও রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতাতেও এগিয়ে গেল সুতিবস্ত্র। অধ্যাপক রস্টো-র মতে এই অগ্রণী ক্ষেত্রটি এতই বিস্তৃত ছিল যে, সমগ্র অর্থনীতির উপর তা প্রভাব ফেলেছিল। এই শিল্পের হাত ধরেই কারখানা প্রথার প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের সূত্রপাত ঘটে। ধীরে ধীরে কয়লা, লোহা, যন্ত্রপাতি, কার্যকরী মূলধনের চাহিদা বাড়তে শুরু করে। শেষ অবধি কম খরচে যাতায়াতের চাহিদা তৈরি হয়, যা অন্যান্য শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করেছিল।

সুতিবস্ত্র শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তা ল্যাঙ্কাশায়ারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। ভৌগোলিক কারণ, স্বচ্ছ জল ইত্যাদির জন্যই সম্ভবত এটা ঘটেছিল। এটাই কিন্তু বৃহৎ শিল্পের আর্থিক সুবিধাগুলি ভোগ করার সুযোগ এনে দিয়েছিল ছোট ছোট তন্তুবায়দের সামনে। ফলে মূল আবিষ্কারের পরবর্তী পর্যায়ে যে সব উদ্ভাবন ঘটেছিল, সেগুলির সুফল তাঁরা নিতে পেরেছিলেন। আসলে অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডে যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটাই অনুন্নত ছিল যে, বিস্তৃত এলাকায় সুতোকল ও তন্তুবায়রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে উদ্ভাবনের সুফল পৌঁছতেই কেটে যেত বহু দশক। পাশাপাশি থাকার জন্য একটি কুটির থেকে জেনি সহজেই ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত কুটিরে।

সুতিবস্ত্র শিল্পের শুধু যে উন্নয়ন হয়েছিল তা-ই নয়, তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেও ওই শিল্প সক্ষম হয়েছিল। আসলে সর্বপ্রথম ব্রিটেনেই আবিষ্কৃত হয়েছিল ওই সব নতুন যন্ত্র, যেগুলি থেকে তৈরি হয়েছিল মসৃণতর অথচ সস্তার সুতো। উদ্ভাবক হিসাবে তাই লাভ ঘরে তুলেছিল ব্রিটেনই। তার প্রতিযোগী দেশগুলিতে যখন এই শিল্পের প্রসার ঘটতে শুরু করল, ততদিনে দাম আরও কমেছে, নেতৃত্ব হাতে থাকার কারণে ক্রমবর্ধমান আয়ের সুফল পৌঁছে গিয়েছে ব্রিটেনের সুতিবস্ত্র শিল্পে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে জাতীয় আয়ে এই শিল্পের অবদান পৌঁছে যায় ৫০ লক্ষ পাউন্ডে। রপ্তানিতে অবদানের অঙ্কও ছিল প্রায় একই রকম। অথচ ১৭৬০-র দশকের গোড়ার জাতীয় আয়ে সুতিবস্ত্র শিল্পের অবদান ছিল মাত্র ৫ লক্ষ পাউন্ড। রপ্তানিতে তার অংশও ছিল যৎসামান্য—আড়াই লক্ষ পাউন্ড।

এই শিল্পের প্রধান কাঁচা মাল তুলো আমদানি করা হত বিদেশ থেকে। ১৭৮০-র দশকে যে আমদানি ছিল বছরে ১ কোটি পাউন্ডের কম, ১৮৪০-এর গোড়ায় তা দশগুণ বেড়ে যায়।

তবে কারখানা ভিত্তিক উৎপাদনে রূপান্তর ঘটতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গিয়েছিল। এর কারণ হিসাবে একদিকে ছিল পারিবারিক কর্তাদের কারখানায় কাজ করতে যাওয়া বা পরিবারের সদস্যদের পাঠানোর ব্যাপারে প্রবল আপত্তি। তাঁরা মনে করতেন ওতে তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব হবে। অন্যদিকে, পুঁজিপতিরাও ভবন নির্মাণ করে কারখানা বসিয়ে তা চালু রাখার ব্যাপারে কিছুটা নির্লিপ্ত ছিলেন। কারণ মন্দার সময়ে তাঁর মুনাফায় টান পড়ার আশঙ্কা ছিল। এই দুটি কারণে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যাই বেশি ছিল ১৮৪০-এর দশক পর্যন্ত। ১৮৫০-এর দশকের আগে পর্যন্ত বহাল তবিয়তে চালু ছিল হস্তচালিত তাঁত। তারপর তা ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এই আধুনিকীকরণ পর্বে পুঁজিপতি যন্ত্রচালিত তাঁতের মালিকরা কিন্তু যথেষ্ট আধিপত্য নিয়ে চলতেন। চাহিদা কম থাকলে প্রথমেই তিনি পারিবারিক উৎপাদকদের ছাঁটাই করতেন। চাহিদা বাড়লে আবার তিনি তাদেরই কাজে লাগাতেন। ১৮৫০-এর দশকের আগে কাজের সর্বোচ্চ সময়সীমা আইন, ন্যূনতম মজুরি আইন বা শিশুশ্রমিক আইন—কোনটাই চালু হয়নি। ১৮৩৫ সালে বস্ত্রকলগুলির ২৫ শতাংশের বেশি শ্রমিক পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছিলেন না। ৪৮ শতাংশই ছিলেন মহিলা ও ছোট মেয়ে। ১৩ শতাংশ শিশুর বয়স ছিল ১৪ বছরের নীচে। শিল্পবিপ্লব বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত এঁদের সামনে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথও ছিল না। তাই ১৭৮০ থেকে ১৮৫০—সুতিবস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের এই সময়ে উদ্বৃত্ত শ্রমকে কাজে লাগানো হয় ব্যাপকভাবে।

১৮১৫ থেকে ১৮৪৫-এর মধ্যে সুতিবস্ত্র শিল্পে দাম কমেছে। কিন্তু মুনাফার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন শিল্পপতিরা। এর একটি কারণ অবশ্যই উৎপাদকদের উদ্ভাবনী শক্তি (innovation)। শুধু মূল আবিষ্কারের (invention) পর কাজ করতে করতে যন্ত্রপাতি বা কলা-কৌশলে উদ্ভাবন না ঘটলে সংশ্লিষ্ট

শিল্প এক জায়গাতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই শিল্পেও একাধিক উদ্ভাবনের ফলে উৎপাদনের খরচ কমতে থাকে। তবে মুনাফার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মূল কারণ ওই কম মজুরিতে অফুরন্ত শ্রমিকের যোগান। মহিলা, ছোট মেয়ে ও দরিদ্র শিশুরা দিনে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করেছে নামামাত্র মজুরিতে। পাশাপাশি আরও বেশি সময় কাজে আগ্রহী পারিবারিক উৎপাদকরা তো ছিলেনই। দরকার পড়লেই তাঁদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন কারখানার উৎপাদকরা। ১৮২০ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে এই শিল্পের মোট উৎপাদন চারগুণ বেড়েছিল, কিন্তু মজুরি কার্যত বাড়েনি।

সুতরাং এই শিল্পের ব্যবসার পরিমাণ যা ছিল, তার বেশির ভাগটাই চলে যেত শিল্পপতিদের হাতে। তাঁরা সেটাকেই লগ্নি করতেন ওই শিল্পেই। ফলে কারখানায় বসত নতুন যন্ত্রপাতি, বাড়ত উৎপাদন। নতুন প্রযুক্তি সুবিধাও নিতে পারতেন শিল্পপতিরা।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, সুতো কাটা, কাপড় বোনার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত আবিষ্কার এবং উৎপাদনের পর্যায়ে উদ্ভাবনই সুতিবস্ত্র শিল্পে চালিকা শক্তির কাজ করেছে। পরবর্তী স্তরে গড়ে ওঠে বহুতল সুতোকল, যেগুলিই ছিল লোহার ফ্রেমে নির্মিত কারখানা ভবনের প্রথম নিদর্শন। গ্যাসের সাহায্যে আলো জ্বালার ব্যবস্থার ফলে দিবারাত্র কাজ করা সম্ভবপর হয়। প্রথম রেল সংযোগ গড়ে উঠেছিল লিভারপুল ও ম্যাঞ্চেস্টারের মধ্যে, যা পণ্য পরিবহণ ও কর্মী স্থানান্তরের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।

১.৪.২ লৌহশিল্প

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে অন্য যে শিল্পটিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল, সেটি হল লৌহশিল্প। সুতিবস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে একটি পরিবারভিত্তিক কুটিরশিল্প ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছিল কারখানাভিত্তিক শিল্পে, যেখানে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যথেষ্ট মূলধন বিনিয়োগের। লৌহশিল্প কিন্তু আগাগোড়াই ছিল কারখানাভিত্তিক ও মূলধন-নির্ভর।

সুতিবস্ত্র শিল্পের সঙ্গে লৌহশিল্পের দ্বিতীয় তফাতটি হল, লৌহ শিল্প ব্রিটেন থেকে কাঁচামাল আহরণ করেই সম্প্রসারিত হয়েছিল। সুতিবস্ত্র শিল্পের মতো তাকে আমদানি করা কাঁচামাল (তুলো)-এর উপর নির্ভর করতে হয়নি। অষ্টাদশ শতকের উদ্ভাবনগুলি ব্রিটেনের লোহা শিল্পকে (১) কাঠ কয়লার বদলে কয়লা ব্যবহার করতে শিখিয়েছিল এবং (২) উৎপাদন বাড়ার ফলে আমদানি করা লোহার বদলে দেশজ লোহার ব্যবহার সম্ভবপর হয়েছিল। মনে রাখা প্রয়োজন কাঠকয়লার যোগান ক্রমশই কমছিল। কারণ বনজ সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। অন্যদিকে কয়লার যোগান ছিল অফুরন্ত। সুতিবস্ত্র শিল্পের প্রসার ঘটেছিল উদ্বৃত্ত ও সস্তার শ্রমিক ব্যবহার করে। কিন্তু লৌহশিল্প সাশ্রয় করেছিল কাঁচামালে।

তবে কাঠকয়লা থেকে কয়লার ব্যবহার শুরু হওয়ায় বনভূমির কাছে কারখানা গড়ার প্রয়োজনীয়তাও কমে গেল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ণের প্রসারের ফলে জমির চাহিদা বাড়ছিল। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটেনে সীমিত হয়ে আসছিল বনাঞ্চল। কমছিল কাঠকয়লার যোগান, বেড়ে যাচ্ছিল তার দামও। ১৭০৯ সালে আব্রাহাম ডার্বি (Abraham Derby) সর্বপ্রথম কোক কয়লা ব্যবহার করে লোহা তৈরি করেছিলেন। সেটাই কাঠকয়লা যুগের অবসানের সূচনা। তবে পুরোপুরি শোকের ব্যবহার চালু হতে হতে এসে গিয়েছিল ১৭৫০-এর দশক। ১৭৭৫ সালে জেম্‌স ওয়াট-এর বাষ্পচালিত ইঞ্জিন চালু হওয়ার পর লৌহ শিল্পপতিদের আরও বেশি সুবিধা হল। তখন আর বনাঞ্চলের কাছে (কাঠকয়লার জন্য) বা জলের উৎসের কাছে (জলবিদ্যুতের জন্য) কারখানা গড়ার প্রয়োজন রইল না। আধুনিক শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হল লোহা তৈরি।

অন্যদিকে লোহাশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এটি উৎপাদকের পণ্য। সরাসরি এই পণ্যটির জন্য ক্রেতাদের চাহিদা নেই। শিল্পের চাহিদার উপরই নির্ভর করে লোহার চাহিদা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে লোহার দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে সেতু, ভবন, কারখানা নির্মাণে তার ব্যবহার বাড়ল ব্যাপকভাবে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি চাহিদার অভাব এই শিল্পের উন্নয়নের পথে যথেষ্ট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওই সময় থেকেই রাস্তা, রেল ইঞ্জিন, জাহাজ, যন্ত্রপাতি, গ্যাস সরবরাহ ও নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য লোহার চাহিদা বাড়তে থাকে ব্যাপকভাবে। আসলে লোহা শিল্পের বিকাশের আগের পর্বে কিছুটা শিল্পোন্নয়ন হতেই হবে। তা নাহলে লৌহশিল্পের উন্নয়ন ধরে রাখা যাবে না।

শিল্পবিপ্লবে লৌহশিল্পের গুরুত্ব

শিল্পবিপ্লবের সময়কাল ১৭৭০ থেকে ১৮৫০। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র অর্থনীতিতে লৌহশিল্প কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, তা দিয়েই তার গুরুত্ব বুঝতে হবে। অর্থনীতির বাদবাকি ক্ষেত্রগুলির কাছ থেকে এই শিল্প অনেক কিছু আহরণ করেছিল। অন্য শিল্পে তার অবদানও অনস্বীকার্য।

এই অবদানের কথা জানতে হলে আগে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এই শিল্পে (ক) প্রযুক্তিগত কী কী পরিবর্তন এসেছিল এবং (খ) জাতীয় অর্থনীতিতে সেগুলির প্রভাব কী রকম।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাঁচামালের সঙ্কটে ভুগতে হয়েছিল লৌহশিল্পকে। কাঠকয়লার সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হয় ১৬২৫ থেকে ১৬৩৫ সালের মধ্যে। ওই সময়ের মধ্যে লৌহপিণ্ডের উৎপাদন বছরে ২৬ হাজার টনে পৌঁছে গিয়েছিল। ১৭২০-র দশকের মধ্যে লৌহপিণ্ডের উৎপাদন ছিল বছরে ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টনের মধ্যে। তবে ব্রিটেনের উৎপন্ন বেশিরভাগ নমনীয় লোহা (Wrought iron) ও ইস্পাত তৈরি হত আমদানি করা (বিশেষ করে সুইডেন থেকে) লোহার খণ্ড থেকে।

এই শিল্পে মন্দার একটি কারণ অবশ্যই ছিল কাঁচামালের অভাব। একদিকে দেশ থেকে আহরণ করা কাঁচামাল আকরিক লোহার মান ছিল নিচু। তার থেকে টেকসই ইস্পাত তৈরি করা দুস্কর হত। অন্যদিকে জ্বালানি হিসাবে কাঠকয়লা ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছিল। ভঙ্গুর বলে তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়াও যেত না। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় লৌহশিল্প গড়ার প্রাথমিক শর্তই ছিল, তা বিস্তৃত বনাঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে। সুতরাং তা ছিল লোকালয় থেকে, অন্যান্য শিল্পাঞ্চল থেকে অনেক দূরে। লৌহ শিল্পপতিরা সাধারণত ছিলেন ধনী ব্যক্তি, যাঁদের জমি-জমা প্রচুর ছিল এবং উৎপাদনের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তাঁরা তৎপর ছিলেন। লক্ষ্য ছিল ওই শিল্পে উৎপাদন বাড়ানো।

লোহা তৈরির জন্য কাঠকয়লার পরিবর্তে কোককয়লা ব্যবহারের জন্য প্রথম পেটেন্ট মেলে ১৫৮৯ সালে। তবে বাণিজ্যিকভাবে গ্রহণযোগ্য চুল্লি তৈরি হতে হতে কেটে যায় বহু বছর। ১৭৫০-এর দশকে কোক-ভিত্তিক একটি মাত্র চুল্লি ছিল ডার্বি পরিবারের হাতে।

১১৭৫ সালে জেম্‌স ওয়াট-এর বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার চুল্লিগুলি আরও ভালভাবে চালানোর সুযোগ এনে দিল। এদিকে কাঠকয়লার চুল্লিতে নতুন করে বিনিয়োগ একরকম বন্ধই হয়ে গেল। ১৭৯০ নাগাদ তা কমে দাঁড়ায় ২৫, কোক কয়লার চুল্লির সংখ্যা বেড়ে হয় ৮৬। আবার, বাষ্পচালিত চুল্লি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয় বনাঞ্চল খুঁজে খুঁজে সেখানে লোহার কারখানা গড়া ও প্রয়োজনে তা সরিয়ে নেওয়া প্রবণতা। ১৮০৬ সালের মধ্যে লৌহপিণ্ড উৎপাদনের ৪৭ শতাংশ কারখানাই খনিগুলির কাছে অবস্থিত হতে শুরু করে। ১ টন লোহা তৈরি করতে সে সময়ে প্রয়োজন হত ১০ টন কয়লা।

তবে কয়লা ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা ছিল, তার ফলে লৌহপিণ্ডকে লৌহখণ্ডে রূপান্তরের সময়ে এসে যেত কিছু অবাঞ্ছিত যৌগ। ফলে লৌহখণ্ড হয়ে পড়ত ভঙ্গুর ও অ-নির্ভরযোগ্য। কোক কয়লার ব্যবহারে ওই ধরনের যৌগের পরিমাণ আরও বেড়ে যেত। বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উপযোগী পদ্ধতির পেটেন্ট (বিশেষ গলন পদ্ধতির মাধ্যমে) ১৭৬১ সালে সর্বপ্রথম পেয়েছিলেন উড ভাই-রা (Wood Brothers)। অবশ্য ১৭৮৩-৮৪ সালে এর স্থান নেয় কর্ট (Cort) আবিষ্কৃত লোহা তৈরির বিশেষ পদ্ধতি। কর্ট নানা ভাগ্য বিপর্যয়ে তাঁর পেটেন্ট রক্ষা করতে পারেননি বলে তাঁর আবিষ্কার কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্য আবিষ্কারগুলির তুলনায় ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক দ্রুত। ব্রিটেনে উৎপন্ন লোহা থেকে নমনীয় লোহা এবং ঢালাই লোহা আরও বেশি করে তৈরি করার সম্ভাবনা বেড়ে গেল, পরিণামে দেশজ লোহার চাহিদাও বাড়ল। ১৭৮৮ থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে দেশজ লোহার উৎপাদন চারগুণ বেড়েছিল। ১৮১২ সালের মধ্যে সুইডেন থেকে লৌহখণ্ডের আমদানি পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। ইস্পাত তৈরির জন্য তা আমদানি হত। কিন্তু ততদিনে আমদানি করা লৌহখণ্ডের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল ওই পণ্যটির রপ্তানি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে ব্রিটেনে লৌহপিণ্ডের উৎপাদন আড়াই লক্ষ টন অতিক্রম করে। ১৭৬০ সালে তা ছিল মাত্র ৩০ হাজার টন। রপ্তানির অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছিল বছরে ৬০ হাজার টন। খননকার্য থেকে শুরু করে তৈরি পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে লৌহশিল্পের অবদান দাঁড়িয়েছিল জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশের মতো। ১৭৬০-এর দশকে তা ছিল মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশ। এই শিল্পের এতটা অগ্রগতির মূলে রয়েছে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার, যা শুধু ওই ইঞ্জিন ব্যবহারের সুযোগই যে এই শিল্পকে দিয়েছিল তা নয়, উন্নতমানের কয়লা, আকরিক লোহার ব্যবহারও তার ফলে সম্ভব হয়েছিল।

অর্থনীতিতে এই শিল্পের প্রভাব

নানা ধরনের উদ্ভাবনের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছিল লৌহশিল্পে কাঁচামালের খরচ। মূল উদ্ভাবনগুলির হাত ধরে এসেছিল আরও কিছু যান্ত্রিক কলা-কৌশল, যা সময় ও শ্রম বাঁচাতে সক্ষম হয়।

১৭৮২ সালে জন উইলকিনসন (John Wilkinson) প্রবর্তিত বাষ্পচালিত হাতুড়ি প্রতি মিনিটে ১৫০ বার আঘাত করতে পারত। কর্ট-এর বাষ্পচালিত রোলিং মিল (Rolling Mill) যে সময় ব্যয় করে ১৫ জন লৌহখণ্ড প্রক্রিয়া করত, চিরাচরিত পদ্ধতিতে তা হত ১ টন। এর ফলে দামও কমে এসেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ব্রিটিশ লৌহখণ্ডের দাম ছিল টন প্রতি ২০ থেকে ২৮ পাউণ্ডের মধ্যে। প্রতিযোগী সুইডেনের লোহার দাম কিন্তু ছিল টনে ৩৫ থেকে ৪০ পাউণ্ড। ১৭৮০ এবং ১৭৯০-এর দশকে উৎপাদনের সুবিধার জন্য চালু হয় বহু নতুন যন্ত্রপাতি।

এতসব উদ্ভাবনের ফলে লৌহশিল্পের ধরন আমূল বদলে গিয়েছিল। স্ট্যাফোর্ডশায়ার (Staffordshire), ইয়র্কশায়ার (Yorkshire) এবং সর্বোপরি সাউথ ওয়েল্‌সের (South wales) কারখানাগুলিতে কয়লা খনন, আকরিক লোহা উত্তোলন থেকে শুরু করে সবই হত এক একটি বৃহৎ কারখানার পরিচালনায়। এইভাবে বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা ভোগ করতে শুরু করল ব্রিটেন, যা এই শিল্প বিপ্লবের আগে সম্ভব হয়নি। পরিণামে কম দামে ভাল মানের লোহা তৈরি সম্ভবপর হল, যেটা আবার নতুন আর একটি শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করতে শুরু করল। আপনাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে, কী সেই শিল্প। বলা বাহুল্য, সে শিল্প হল কারিগরি বা মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প।

লৌহশিল্পে আর একটি বড় রকমে আবিষ্কার ঘটে ১৮২৮ সালে। নিয়েলসেন (Nielsen) আবিষ্কার করেন যে, চুল্লিতে ব্যবহার্য বাতাস একটু গরম করে নিলে কোকের খচর কমে, উৎপাদনও অনেকটা বাড়ানো সম্ভব হয়। এই আবিষ্কারের পর স্কটল্যান্ডেই তৈরি হতে শুরু করল এমন লোহা, যার দাম ছিল ব্রিটেনে তো বটেই, বিশ্বে ন্যূনতম। এই শিল্পে আরও যে সব অগ্রগতি চোখে পড়তে শুরু করল, তার মধ্যে

ছিল—(ক) কারখানা অর্থাৎ উৎপাদন ইউনিটের আকার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া ; (খ) কাঁচামাল হিসাবে কয়লার ব্যবহার কমতে থাকা, যার ফলে সাশ্রয় হতে শুরু করে খরচে ; (গ) কারখানার নকশায় আধুনিকীকরণ।

১৭৯০ এবং ১৮০০-র দশকগুলিতে নেপোলিয়নের যুদ্ধই লোহার চাহিদা অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রতিরক্ষার প্রয়োজন ছাড়াও অসংখ্য খাল নির্মাণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় লোহা। যুদ্ধ শেষে কিছুটা মন্দা দেখা দিলেও নতুন করে লোহার ব্যবহার শুরু হয় ভবন ও সেতু নির্মাণ, যন্ত্রপাতি, খালে চলাচলের নৌকা তৈরি, গ্যাস ও জলের পাইপ, বাতিস্তম্ভ, রেললাইন, স্তম্ভ ইত্যাদি। তবে ১৮৩০-এর দশকে রেল বিপ্লব শুরু না হওয়া পর্যন্ত এই শিল্পে ১৭৮০ বা ১৮০০-র দশকের তুলনায় কিছুটা শ্লথগতি লক্ষ করা গিয়েছে। তবে সেই বৃদ্ধির হারও ছিল বিশ্বের সমস্ত দেশের তুলনায় বেশি। বিশ্বে লৌহপিণ্ডের মোট উৎপাদনে ১৮০০ সালে ব্রিটেনের অবদান ছিল ১৯ শতাংশ। ১৮২০ সালে তা বেড়ে হয় ৪০ শতাংশ, ১৮৪০ সালে ৫২ শতাংশ।

সুতরাং ব্রিটেনের অর্থনীতিতে লৌহশিল্পের সার্বিক প্রভাব সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য এখানে পরপর বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অধ্যাপক রস্টো-র সংজ্ঞা অনুসারে একেই বলা যেতে পারে কাঁচা মালের চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে পশ্চাদ সংযোগ বা 'Backword linkage'।

প্রথমত, আকরিক লোহার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছিল লৌহশিল্প। ব্রিটেনে আকরিক লোহা এবং কয়লার খনিজ সম্পদ বহু স্থানেই একত্রে অবস্থান করছিল। একই খনিতে বিবিধ সম্পদ থাকাটাও প্রথম শিল্প বিপ্লব ব্রিটেনে ঘটার অন্যতম কারণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ১৭৬০ থেকে শুরু করে প্রায় এক শতকেরও বেশি সময় ধরে এই শিল্প পুরোপুরি দেশজ আকরিক লোহার উপরই নির্ভর করেছে।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনের চুনাপাথর এবং কয়লার চাহিদাও বেড়ে গিয়েছিল লৌহশিল্পের বিকাশের ফলে।

তৃতীয়ত, কয়লা এবং আকরিক লোহার চাহিদা বাড়ার ফলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে শুরু করে। খালগুলি মূলত কিন্তু কাটা হয়েছিল, কয়লা জাহাজে পাঠানোর জন্য। ওই কয়লার প্রায় ২০ শতাংশই ব্যবহৃত হত লৌহশিল্পের চুল্লিতে।

চতুর্থত, আধুনিক মূলধন-নির্ভর বৃহদায়তন কারখানার সব বৈশিষ্ট্যই দেখা গিয়েছিল লৌহশিল্পে। কারখানায় খনি থেকে জল বের করা, আকরিক লোহা ভাঙা, চুল্লি জ্বালানো, হাতুড়ি চালানো, লৌহখণ্ডে নির্দিষ্ট আকার দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হত বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। আধা-দক্ষ পূর্ণবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের প্রয়োজনও তৈরি করেছিল এই শিল্প। যন্ত্রপাতি, মূলধন বিনিয়োগ বাড়ায় ব্রিটেনে আধুনিক অর্থনীতির ভিত গড়ে দিয়েছিল লৌহশিল্প।

এবার আসা যাক এই শিল্পের সঙ্গে ব্রিটেনের সমগ্র অর্থনীতির অগ্রবর্তী সংযোগ বা 'Forward linkage'-এর প্রসঙ্গে।

প্রথমত, বলা প্রয়োজন, এই শিল্প এমন এক শিল্পসামগ্রী তৈরি করে দিল, যা একটি শিল্পোন্নত দেশের পক্ষে অপরিহার্য। অত সস্তায় এবং বেশি পরিমাণে লোহা উৎপন্ন হওয়াটা নিঃসন্দেহে শিল্পবিপ্লব ঘটার ব্যাপারে প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় এগিয়ে দিয়েছিল ব্রিটেনকে। যন্ত্রপাতি, লাঙ্গল, লেদ, প্রতিরক্ষা সামগ্রী, বন্দুক, বন্দুক বহনের গাড়ি, জাহাজের নোঙ্গর, বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম, টেলিগ্রাফের তার সবকিছু তৈরি করতেই প্রয়োজন ছিল লোহার।

দ্বিতীয়ত, ঢালাই করা এবং লোহা তৈরির যে-সব নতুন পদ্ধতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেটাই ব্রিটেনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভিত প্রতিষ্ঠা করে দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর ফলেই ব্রিটেন সমগ্র বিশ্বে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু যে শ্রম বাঁচিয়ে বৃহদায়তন শিল্প গড়া সম্ভব হয়েছিল, তা-ই নয়, নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণের সূচনাও হয় সেই সময়েই। সেটাই ছিল আধুনিক শিল্পের প্রথম লক্ষণ। যন্ত্র এবং যন্ত্র তৈরির যন্ত্র নির্মাণে ধারাবাহিকভাবে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল, সেটাকেই ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয়ত, উন্নয়নে লৌহশিল্পের এতটা গুরুত্বের অন্যতম কারণ এটা পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই 'উৎপাদকের পণ্য' বা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত। সুতরাং লোহার দাম কমার অর্থ ছিল আরও একগুচ্ছ পণ্যের দাম কমা। তা ছাড়া আগে লোহার বেশি দামের কারণে যে সব পণ্যে কম কম টেকসই সামগ্রী ব্যবহৃত হত, ধীরে ধীরে সেগুলিতেও লোহার ব্যবহার শুরু হল। যেমন, বস্ত্রশিল্পের যন্ত্র তৈরিতে কাঠের বদলে শুরু হল লোহার ব্যবহার। জাহাজ, গাড়ি তৈরির ক্ষেত্রেও দেখা গেল একই চিত্র। তবে লৌহশিল্প তার উৎপাদন সত্যিই কতটা বাড়াতে পারে, সেই পরীক্ষায় এই শিল্প উত্তীর্ণ হয়েছিল রেলপথ তৈরির সূচনা পর্বের সঙ্গে সঙ্গে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে রেলপথ নির্মাণ সীমিত ছিল খনি বা লৌহশিল্প সংলগ্ন অঞ্চলে। রেলপথ তৈরি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছয় ১৮৪৭ সালে। সে সময়ে প্রায় ৬৫০০ মাইল রেলপথ নির্মীয়মান ছিল। ১৮৫০-এর দশকেই কিন্তু বেশির ভাগ রেলপথ নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে যায়। এর থেকেই বোঝা যায় কত দ্রুতগতিতে ব্রিটেন নির্মিত হয়েছিল রেলপথ। লৌহশিল্পের সম্প্রসারণ ছাড়া এটা সম্ভবই হত না। ব্রিটেনে রেলপথ নির্মাণ শেষ হওয়ার পর বিদেশে রেলপথ গড়ার জন্য লোহা সরবরাহ করা হয়েছিল।

এক কথায় ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবে লোহাশিল্প যে ভূমিকা পালন করেছিল, তা অনস্বীকার্য। লোহা এমনই এক সামগ্রী যা এককভাবে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে। একমাত্র কয়লা ছাড়া এ ধরনের সামগ্রীর নজির নেই বললেই চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পোন্নয়নের সূচনা হয়তো ঘটেছিল বস্ত্রশিল্পে অষ্টাদশ শতকের উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ওই শিল্পোন্নয়নের প্রবাহকে ধরে রেখেছিল বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার এবং লৌহশিল্পের কারিগরি অগ্রগতি। এগুলিও ঘটেছিল অষ্টাদশ শতকেরই শেষ তিনটি দশকে।

১.৫ জন বিপ্লব

ব্রিটেনে একটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের সূচনা যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে হয়েছিল, অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদরা সাধারণভাবে সে ব্যাপারে একমত। জাতীয় উৎপাদন, মাথাপিছু আয়, জনসংখ্যা—সবই ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল। এটাকেই সার্বিক শিল্পোন্নয়ন তথা ব্রিটেনের আর্থিক উন্নয়নের সূচনা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে।

এখানে বলা প্রয়োজন, এখনকার শিল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দুনিয়ার সঙ্গে তদানীন্তন ব্রিটেনের বড় যে ফারাকটি ছিল, তা হল, জনসংখ্যা ও উৎপাদন দুটিরই ক্রমাগত বৃদ্ধি ছিল উন্নয়নের সূচক। কারণ, জনসংখ্যা তখন এতটাই কম ছিল এবং মৃত্যুহার এত বেশি ছিল যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি তথা জন বিপ্লব প্রয়োজন হয়েছিল কৃষি এবং শিল্পে শ্রম সরবরাহের জন্যই।

১.৫.১ জনসংখ্যার সময়ানুক্রমিক হিসাব

প্রথম যে হিসাবটি আমাদের হাতের কাছে রয়েছে, সেটি দিয়েছেন গ্রেগরি কিং। ১৬৯৫ সালে গৃহ-কর সংক্রান্ত নথিপত্র থেকে তিনি হিসাব করেন, ইংল্যান্ড এবং ওয়েল্‌স-এর মোট জনসংখ্যা ৫৫ লক্ষ। পরে অবশ্য গ্লাস আর একটি হিসাবে জানান যে, তা ছিল ৫২ লক্ষ।

দ্বিতীয়ত, ১৮০১ সালের প্রথম সরকারি জনগণনা থেকে আমরা জানতে পারি, ইংল্যান্ড এবং ওয়েল্‌স-এর জনসংখ্যা ৯১ লক্ষ ৬০ হাজার।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা হিসাব করার মূল উৎস ছিল গির্জা বা প্যারিশ-এর রেজিস্ট্রার। অফিসিয়াল চার্চ অব ইংল্যান্ড ওইসব নথি রাখত। ষোড়শ শতাব্দীতে পাশ হওয়া একটি আইন অনুসারে গির্জাগুলি জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর তথ্য রাখতে বাধ্য ছিল। ১৬১০ সালের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ গির্জাই ওই ধরনের রেজিস্ট্রার রাখতে শুরু করে দেয়।

প্রথম সরকারি জনগণনার সময়ে রিকম্যান (Rickman) জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য পাঠানোর জন্য গির্জাগুলিকে অনুরোধ জানান। ১৭০০, ১৭১০, ১৭২০ এইভাবে প্রতি দশ বছর অন্তর প্রাপ্ত প্যারিশ রেজিস্ট্রার-এর তথ্য থেকে তিনি অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ড এবং ওয়েল্‌স-এর জনসংখ্যার হিসাব করেন। প্যারিশ রেজিস্ট্রার অ্যাবস্ট্রাক্ট বা পি আর এ (Parish Registrar Abstract)-এ তা প্রকাশও করা হয়।

এই ধরনের তথ্য পুরোপুরি প্রামাণ্য না হলেও গবেষকরা এটি ধরে নিয়েই কাজ করেছেন। আসলে গির্জার প্রতি বিশ্বাসী নন, এমন ব্যক্তিদের জন্ম, মৃত্যু বিবাহের তথ্য এতে ধরা পড়েনি। তাই জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের প্রকৃত অঙ্ককে পি আর এ-তে প্রাপ্ত তথ্যের একটি অনুপাত হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে তথ্য হয়ে পড়েছে অনুমান-নির্ভর।

১.৫.২ জনসংখ্যার হিসাব থেকে প্রাপ্ত তথ্য

জনসংখ্যার তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছিল বড়জোর ঢিমেতালে। দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু উল্লেখযোগ্য হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সূচনা হয়। সেই কারণে ১৭৫০ সালকেই সাধারণত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি দিকচিহ্ন হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। বিভিন্ন গবেষকের হিসাব অনুযায়ী এই বছরে ইংল্যান্ড এবং ওয়েল্‌স-এর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬১ কোটি ৪০ লক্ষ কিংবা ৬৫ কোটি ৫২ লক্ষে। কিছু কিছু অনুমানের তফাত ছিল বলেই এই পার্থক্য ঘটেছিল। সকলেই কিন্তু ব্যবহার করেন পি আর এ-র তথ্য।

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসাবটি পি আর এ-র উপরই নির্ভর করে দাখিল করেন ব্রাউনলি (Brownlee)। তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল :

বছর	ইংল্যান্ড ও ওয়েল্‌স-এর জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
১৬৯৫	—
১৭০১	৫.৮৩
১৭১১	৫.৯৮
১৭২১	৬.০০
১৭৩১	৫.৯৫
১৭৪১	৫.৯৩
১৭৫১	৬.১৪
১৭৮১	৭.৫৩
১৮০১	৯.১৬

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে মাত্র বছরে ০.০৫ শতাংশ ছিল, তা উপরের পরিসংখ্যান থেকেই জানা যাচ্ছে। দ্বিতীয় ভাগে তা বেড়ে হয় ০.৭৩ শতাংশ। রিকম্যান-এর দেওয়া ক্রমের উপর ভিত্তি করে ব্রাউনলি বলেছেন, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বৃদ্ধির হার ছিল নামমাত্র, মাঝামাঝি সময়ে হয় বৃদ্ধির সূচনা এবং শেষভাগে ঘটতে থাকে দ্রুত বৃদ্ধি।

জনসংখ্যার ইতিহাস নিয়ে গবেষণার নিযুক্ত কেমব্রিজ গ্রুপ (Cambridge group) হিসাব করে দেখেছিলেন, পি আর এ-র জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৬ ভাগের এক ভাগ। তবে ১০০টি প্যারিশ রেজিস্ট্রার থেকে তথ্য নিয়ে তাঁরা যে হিসাব দিয়েছেন, তার ভিত্তিতেও ইংল্যান্ড এবং ওয়েল্‌স-এর জনসংখ্যার আর একটি হিসাব দিয়েছিল লি (Lee)।

বছর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
১৬৯৫	৫.১৮
১৭০১	৫.২৪
১৭১১	৫.৫১
১৭২১	৫.৬৬
১৭৩১	৫.৫৯
১৭৪১	৫.৯৪
১৭৫১	৬.২০
১৭৮১	৭.৫৭
১৮০১	৯.১৬

মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতকের সেই একই ছবি কিন্তু আমরা লি-র হিসাব থেকেও পাচ্ছি। বৃদ্ধির হার প্রায় একই রকম ০.৭১ শতাংশ।

১.৫.৩ পেশা অনুযায়ী জনসংখ্যার বৃদ্ধি

অধ্যাপক ডিন এবং কোল Deane and Cole) রিকম্যান-এর দেওয়া তথ্য থেকে দেখিয়েছেন কৃষিপ্রধান, মিশ্র এবং শিল্প-প্রধান কাউন্টিগুলির জনসংখ্যার বিবর্তন।

	কাউন্টি	(লক্ষ)		মোট
বছর	কৃষি-প্রধান	মিশ্র	শিল্প-প্রধান	ইংল্যান্ড ও ওয়েলস
১৭০১	১.৯৫	১.৯২	১.৯৫	৫.৮৩
১৭৫১	১.৯৬	১.৯৩	২.২৫	৬.১৪
১৭৮১	২.৩৩	২.৩৩	২.৮৭	৭.৫৩
১৮০১	২.৬১	২.৭৯	৩.৭৬	৯.১৬
১৮৩১	৩.৬৯	৪.০৪	৬.৩২	১৪.০৫

এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় তিনটি পেশা নিযুক্ত জনসংখ্যা ছিল প্রায় সমান-সমান। আবার প্রায় প্রতিটি পেশাতেই নিযুক্ত ছিলেন মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিন্তু তা বদলে গিয়েছিল। কমতে শুরু করেছিল কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সামান্য, তখন কৃষিনির্ভর কাউন্টিগুলিতেও জনসংখ্যা তেমন বাড়েনি। পরে জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে, তবে মোট জনসংখ্যায় তাদের অনুপাত কমেছে।

১.৫.৪ মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়া

১৯২০ সালের গ্রিফিথ (Griffith) বুয়ার (Buer) এবং জর্জ (George) এর সমীক্ষা অনুসারে মৃত্যুহার কমার পিছনে কয়েকটি কারণ পাওয়া যায়। সেগুলি হল :

(ক) জিন বিক্রি নিষিদ্ধ করতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ হয় একটি আইন। স্বাস্থ্যের উপর এর ভাল প্রভাবের কারণে মৃত্যুহার কমে যেতে পারে।

(খ) ভাল মানের খাদ্যের প্রচলন।

(গ) ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শহরগুলির স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল।

(ঘ) ওষুধের ক্ষেত্রেও এসেছিল ব্যাপক উন্নতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শুধু যে ওষুধপত্রের প্রচলন হয়েছিল তা-ই নয়, হাসপাতাল ও প্রতিষেধক ব্যবস্থারও প্রচলন ঘটে।

বিশেষজ্ঞরা এ কথাও জানিয়েছেন যে, মোটা শস্যের বদলে গম থেকে তৈরি রুটির প্রচলন স্বাস্থ্যোন্নতি এবং পরিণামে মৃত্যুহার কমাতে সাহায্য করেছিল। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও তাঁদের মতে এর জন্য দায়ী।

তবে আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌দের মতে এই সব ব্যাখ্যা পুরোপরি গ্রহণযোগ্য নয়। পানীয় হিসাবে জিন শহরাঞ্চলেই প্রচলিত ছিল। অথচ আইনটি পাশ হওয়ার সময়ে জনসংখ্যার সিংহাভাগই গ্রামে বসবাস করত। শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কিছুটা উন্নতি ঘটলেও নিকাশি, জল সরবরাহ, আবাসন ইত্যাদি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছিল নিতান্তই ভগ্নদশায়। গমের রুটিও মৃত্যুহার কমাতে পেরেছিল কি না, সে ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষণীয় উন্নতিও ১৮১৫ সালের আগে চোখে পড়েনি।

অন্য দিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসবিদ্ ম্যাক কিওন (Makewon) এবং ব্রাউন (Brown) বলেছেন, অ্যানেস্থেসিয়া (Anaesthesia) এবং অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic) আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত শল্যচিকিৎসায় তেমন কোনও ফলই মেলেনি। হাসপাতালগুলির অবস্থাও ভাল ছিল না।

তবে একটা কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কার অবশ্যই মৃত্যুহার কমাতে সাহায্য করেছিল। কারণ এটি ছিল একটি মারণ রোগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে এই প্রতিষেধকের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়। গুটি বসন্তকে মারণ রোগ হিসাব ধরে নিলে এটা বলাই যায় যে টিকা প্রয়োগ মৃত্যুহার কমাতে সাহায্য করেছিল।

এই মৃত্যুহার কমার বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে বুঝতে হলে আমাদের সমগ্র ইউরোপ, বিশেষত পশ্চিম ইউরোপের প্রতি নজর দিতে হবে। হেলেনিয়ার-এর (Hellenier) একটি সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, অতীতেও জনস্ফীতি ঘটেছিল। কিন্তু ঠিক তার পরবর্তী স্তরেই ঘটেছিল সঙ্কোচন বা এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা। সেটা যে সবসময়ে উঁচু মৃত্যুহারের কারণেই ঘটেছিল তা নয়। বছরের এক একটি

সময়ে মৃত্যুহার পৌঁছে যেত শীর্ষে। ওই শীর্ষহার ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে মৃত্যুহার জনিত সমস্যার মূলে ছিল দুটি কারণ : (১) ম্যালথাসের (Malthus) তত্ত্ব অনুসারে জীবনধারণের সমস্যা এবং (২) মহামারী জনিত সঙ্কট।

এই দুটি সমস্যা আবার পরস্পর সম্পৃক্ত। কারণ, জীবনধারণের সমস্যা অর্থাৎ খাদ্যসঙ্কট মহামারীর কবলে পড়ার প্রবণতা বাড়িয়ে দিত। দেখা যাচ্ছে অষ্টাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের বেশির ভাগ অংশেই জীবনধারণের সমস্যা আর তত প্রকট হয়ে ওঠেনি। এই একই ঘটনা ব্রিটেনের পক্ষেও সত্যি। সপ্তদশ শতকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ব্রিটেন শস্য রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তরিত হয়েছিল। পাশাপাশি, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটেছিল, যার ফলে খাদ্যের অভাব এবং জীবনধারণের সমস্যা কার্যত আর ছিল না বললেই চলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই কেন এই পরিবর্তন ঘটল, তার উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের আবার সেই গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কারের প্রসঙ্গ টেনে আনতে হবে। এই রোগটি ছাড়াও ছিল প্লেগ, যা ইউরোপে ফিরে এসেছে নিয়মিত ব্যবধানে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওই রোগের বাহক কালো ইঁদুরের বদলে দেখা যেতে লাগল বড় কটা রঙের ইঁদুরদের। তারা কিন্তু প্লেগের বাহক ছিল না। এই কারণটিও মৃত্যুহার কমার জন্য দায়ী।

১.৫.৫ জন্মহার বৃদ্ধি

পি আর এ-এর তথ্যের সাহায্যে এটি বিশ্লেষণ করেছেন ব্রাউনলি, (Brownlee) গ্রিফিথ (Griffith) ওলিন, (Ohlin) ক্রস (Krouse) এবং ডিন ও কোল (Deane & Cole)। ব্রাউনলি এবং গ্রিফিথের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্মহার বেড়েছিল অনেকটাই। তারপর তা স্থিতিশীল থাকে দীর্ঘদিন, প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। ওলিন অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম চারটি দশক নিয়ে কাজ করে দেখিয়েছেন জন্মহার সে সময়ে বেড়েছিল। পঞ্চম দশকে এবং শেষ দুটি দশকেও তা কমেছিল। ১৭৮০ সাল থেকে গবেষণা চালিয়ে ক্রস বলেছেন শিল্পবিপ্লবের সময়েই ব্রিটেনে জনসংখ্যা বেড়েছিল। ডিন ও কোল-ও মোটামুটি একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁরা অবশ্য বলেছেন, শিল্পোন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বেড়েছিল স্বাভাবিকভাবে, অভিবাসনের কারণে নয়। তবে এই যুক্তি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, অভিবাসন সাধারণত প্রজননক্ষম বয়সেই ঘটে। তাই কোনও স্থানে জনসংখ্যা বাড়ার পিছনে সেটা একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবারভিত্তিক সমীক্ষা থেকেও ধরা পড়েছে যে, ১৭০০ থেকে ১৭৭৪ সালের মধ্যে ২৫ বছর বয়সের পর বাঁচার সম্ভাবনা তার পঁচাত্তর বছর আগেকার তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ১৭৫০ সালের পর থেকে শিশু মৃত্যুর হারও তার আগের পঞ্চাশ বছরের তুলনায় কমে যায়। এই সমীক্ষা চালিয়েছিলেন রিগলে (Wriggley)।

জন্মহার বাড়ার পিছনে ঐতিহাসিকরা একাধিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

পথমত ছিল কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন। এর ফলে অন্যত্র নিয়ে শ্রমিকের কাজ করার প্রবণতা বেড়েছিল। এর ফলে কমেছিল বেশি বয়সে বিবাহ করার প্রবণতা। আগে শ্রমিকরা অনেকে মিলে বাস করতেন এবং প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অনেক সময়েই বিবাহ করতেন না। কম বয়সে বিবাহ জন্মহার বাড়ার একটি কারণ।

দ্বিতীয়ত, কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে কৃষি শ্রমিকের অনুপাত বেড়েছিল, কমেছিল ক্ষুদ্র কৃষকের অনুপাত। এটাও কম বয়সে বিবাহ করা এবং সন্তান উৎপাদন বাড়ার কারণ।

তৃতীয়ত, স্বনিযুক্ত ব্যক্তিদের তুলনায় বেড়ে গিয়েছিল শ্রমিকের অনুপাত। এটাও দেরিতে বিবাহ কমে আসা এবং জন্মহার বাড়ার কারণ।

চতুর্থত, শিশু শ্রমিকের কাজের সুযোগ সে সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল শিল্পবিপ্লবের কারণেই। এটাও সত্বর বিবাহ করার প্রবণতা বাড়িয়েছিল।

পঞ্চমত, সাধারণভাবে পুষ্টিগত মান বৃদ্ধি পাওয়াটাও জন্মহার বাড়ার কারণ।

ষষ্ঠত, দারিদ্র্য আইন বা তথাকথিত 'পুওর ল' জন্মহার বাড়ার আর একটি কারণ। তথাকথিত স্পিনহ্যামল্যাণ্ড সিস্টেম বা Speenhamland System (১৭৯৫ থেকে ১৮৩৪) যে ভাবে কার্যকর হয়েছিল, সেটাও জন্মহার বাড়ার অন্যতম কারণ। দরিদ্রদের প্রদেয় ভাতা এই ব্যবস্থায় নির্ভর করত পরিবারের সদস্যসংখ্যার উপর। অ্যাডাম স্মিথের মতে এটা কম বয়সে বিবাহ এবং পরিবারের আকার বাড়ার কারণ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্কটি জটিল এবং দ্বিমুখী। এ কথা ঠিক যে, ১৭৪০ সাল থেকে উৎপাদন না বাড়লে দুর্ভিক্ষ কাটত না, জনসংখ্যাও বাড়ত না। একইসঙ্গে, জনসংখ্যা না বাড়লে শ্রমিকের অভাব হত, ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবই অনিশ্চিত হয়ে পড়ত। পাশাপাশি, জনস্ফীতির কারণেই পণ্যের চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল, বেড়েছিল শিল্প পণ্যের বাজার। অন্যদিকে শিল্পবিপ্লবের ফলেই জীবিকার সুযোগ বেড়েছিল, কমেছিল বিবাহের বয়স, যার পরিণামে বেড়ে যায় জনসংখ্যা। এভাবেই সক্রিয় ছিল দ্বিমুখী সম্পর্ক।

১.৬ কৃষি বিপ্লব

শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্রে কৃষির অগ্রগতি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত, সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন অধ্যাপক রস্টো। তিনি তাঁর অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্ব সংক্রান্ত তত্ত্বে বলেছেন, কৃষি উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন উন্নয়নের সূচনা বা 'টেক অফ'-এর অতি প্রয়োজনীয় শর্ত।

ব্রিটেনেও শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে কৃষি বিপ্লব। ওই বিপ্লবের চারটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, তা বৃহদায়তন এবং সুসংহত কৃষি ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। সেটাই মধ্যযুগীয় খোলা মাঠ

ব্যবস্থার (Open fields system) স্থান নিয়েছিল। সেগুলি ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন, যাতে ছিল সর্বসাধারণের পশুচারণের অধিকার। দ্বিতীয়ত, কৃষি বিপ্লবের ফলে চালু হয়েছিল সাধারণের ব্যবহারযোগ্য অথচ উর্বর চারণভূমিতে কৃষির প্রসার এবং সুনিবিড় পশুপালন। তৃতীয়ত, গ্রামীণ সমাজে এক বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল কৃষিবিপ্লব। স্বনির্ভর কৃষকরা সাধারণভাবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন কৃষি শ্রমিকে। তাঁদের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করতে শুরু করল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের উপর। শুধু আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে তাঁদের ভাগ্যের চাকা আবর্তিত হওয়ার দিনের অবসান ঘটাল কৃষিবিপ্লব। চতুর্থত, এই বিপ্লবের ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা বেড়েছিল উল্লেখযোগ্য হারে।

শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে কৃষিবিপ্লবের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যাবে মূলত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র রেখে—

১। উৎপাদনের নতুন কৌশল উদ্ভাবন,

২। গণ্ডিবাঁধন আন্দোলন বা Enclosure Movement এবং

৩। কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর।

১.৬.১ উৎপাদনের নতুন কৌশল

১। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটি উল্লেখ করা যায়, সেটি হল ১৭০০ সালে জেথ্রো টুল (Jethro Tool) আবিষ্কৃত বীজ বপনের যন্ত্র। ১৭৩০ সালে রথারহ্যামের (Rotherham) ত্রিকোণবিশিষ্ট লাঙ্গল পেটেন্ট পাওয়ার পর থেকেই এটির আরও বেশি প্রচলন ঘটে। এ ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবিষ্কৃত হয় আরও অনেক যন্ত্রপাতি। এমনকি শস্য ঝাড়াইয়ের একটি যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়, যা শ্রম বাঁচানোর উপযোগী হয়ে ওঠে।

২। পশুপালনের ক্ষেত্রেও এসেছিল বড় ধরনের পরিবর্তন। অনেক জোতদার এবং বড় ভাগচাষী নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের পশুপালনে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। লোভের আশা ছাড়া সেটা সামাজিক সম্মানের প্রতীকও হয়ে উঠেছিল।

৩। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি ছিল নতুন শস্য পর্যায় চালু করা। নতুন পশুখাদ্য চাষের মাধ্যমে তা শুরু হয়। ব্রিটেনে তিন-ফসলি অথবা দো-ফসলি চাষ ব্যবস্থা চালু ছিল। তিন-ফসলিতে জমির এক-তৃতীয়াংশ এবং দো-ফসলিতে অর্ধেক অংশ এক বছর খালি রাখতে হত তার উর্বরতা বজায় রাখার জন্য। পশুখাদ্য চাষ শুরু হওয়ার পর থেকে জমির আরও নিরিড় ব্যবহার সম্ভব হল। এই পদ্ধতির সূচনা হয় সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেই। উদাহরণ হিসাবে নরফক (Norfolk) শস্য পর্যায়ের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। এতে চাষ করা হত গম/শালগম/বার্লি/শুঁটিজাতীয় ত্রিপত্র তৃণ বিশেষ (Clover)। তাই জমি খেলে রাখার আর প্রয়োজন হত না। শস্যের পরেই চাষ করা হত শিকড় জাতীয় আনাজ বা পশুখাদ্য। ওই সব পশুখাদ্যই জমির উর্বরতা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম।

পাশাপাশি চারণভূমির উপর অত্যধিক চাপও পশুখাদ্য চাষ শুরু হওয়ার পর থেকে কমেছিল। ১৬৫০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে খাদ্যশস্যের তুলনায় পশুখাদ্যের দরও ছিল কৃষকদের কাছে আকর্ষণীয়। এটাও পশুখাদ্য চাষ এবং বাণিজ্যিক ভাবে পশুপালনে উৎসাহ দিয়েছিল। তবে পরে যখন খাদ্যশস্যের দাম তুলনায় বেড়ে গেল, তখনও এই মিশ্র চাষ ব্যবস্থা থেকে আর পিছনের দিকে হাঁটেননি কৃষকরা।

১.৬.২ গণ্ডিবাঁধন আন্দোলন (Enclosures)

সমগ্র ইউরোপেই জমির গণ্ডিবাঁধন আন্দোলন শুরু হয় সেই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে, স্থায়ী হয় ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত। সেগুলি ছিল বেসরকারি উদ্যোগে গণ্ডি দেওয়া। পার্লামেন্টের আইনের সাহায্যে জমি একত্রিত করার লক্ষ্যে গণ্ডিবাঁধন একটি আন্দোলনের রূপ নেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই।

গণ্ডিবাঁধনের কথা জানতে হলে তার পূর্বসূরী খোলা মাঠ ব্যবস্থার কথা আলোচনা করতে হবে। ওই ব্যবস্থায় কৃষকদের জমিগুলি ছিল ছড়ানো। তাঁরা বেসরকারি উদ্যোগ পতিদের মতোই জমি থেকে ফসল তুলতেন। তার পর জমিগুলি হয়ে যেত সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য। সেখানে তখন সকলে পশুচারণ করতে পারতেন। এই সব জমি ছাড়াও ছিল গ্রামের সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা (Village Common)। সেখানে পশুচারণ, মাছ ধরা, বন থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি করতে পারতেন। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থে এইসব এলাকা বজায় রাখাটা জরুরি ছিল।

গণ্ডিবাঁধনের লক্ষ্য ছিল কোনও মালিকের ছড়ানো কৃষি জমিগুলিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া। ষোড়শ শতাব্দীতেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। পশমের উচ্চ মূল্যের কারণে মেষ চারণের জন্যও জমি ঘিরে দেওয়া শুরু হয়েছিল। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে পার্লামেন্টের মাধ্যমে যে গণ্ডিবাঁধন আন্দোলন শুরু হল, তখন ষোড়শ শতকের ওই প্রক্রিয়াই চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল। পূর্ববর্তী পর্যায়ে সাধারণত বড় জমিদাররা বলপ্রয়োগ করে জমিতে গণ্ডি দিতেন। নতুন ব্যবস্থায় গণ্ডি দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে আর্জি জানাতে হত জমিদারকে। পার্লামেন্টই তখন সমীক্ষক এবং কমিশনার নিয়োগ করে কাজটি সম্পন্ন করেন।

এই ব্যবস্থার ফলে অবশ্য কিছু দরিদ্র ভূমিহীন মানুষের অধিকার খর্ব হয় বলে অভিযোগ এনেছেন ঐতিহাসিকরা। যাঁদের কোনও জমি ছিল না, অথচ যাঁরা ফসল উঠে যাওয়ার পর যা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন, তাঁরা আইন করে গণ্ডি বাঁধা হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হন। প্রথাগতভাবে (আইনগতভাবে নয়) তাঁরা যে অধিকার ভোগ করে আসছিলেন, নতুন ব্যবস্থায় তা নাকচ হয়ে যায়। সামান্য জমি যাঁদের ছিল, তাঁরা অনেকে ক্ষতিপূরণ পেলেও এঁরা তা পাননি বললেই চলে।

বহু শতাব্দী ধরে জমিতে ব্যক্তিগতভাবে গণ্ডি দেওয়ার প্রথা চালু হলেও অষ্টাদশ শতকে তা কার্যত জমিদারদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। কারণ, বলপ্রয়োগে সবাইকে খোলা মাঠ ছাড়তে বাধ্য করা আর সম্ভব হচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত শস্যের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় খোলা মাঠে এক চিলতে জমিও দখলকারীরা

ছাড়তে চাইছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাই পার্লামেন্টের মাধ্যমে গণ্ডিবাঁধন বেড়ে যায়।

ঐতিহাসিক অ্যাশটন বলেছেন, নতুন কৃষি প্রযুক্তি মূলত প্রয়োগ করা হচ্ছিল গণ্ডি দেওয়া জমিতেই। আসলে গণ্ডিবাঁধন কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অনেকটাই সাহায্য করেছিল, কারণ ছোট খোলা মাঠে নতুন কৃষি ব্যবস্থা অনেক সময়েই সফল হত না। নেপোলিয়নের যুদ্ধের আমলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সে সময়ে অনুর্বর এবং একেবারে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য জমিও গণ্ডির আওতায় নিয়ে আসার প্রবণতা দেখা দেয়। সেগুলি রূপান্তরিত হয় গম ক্ষেতে।

গণ্ডিবাঁধন সংক্রান্ত নথি থেকে দেখা যাচ্ছে ১৭৬১ থেকে ১৭৯২ পর্যন্ত এ ব্যাপারে ১২৯১টি বিল আনা হয় এবং এক হাজার একরের গুনীতকে গণ্ডি দেওয়া জমির পরিমাণ ৪৭৮.৩।

বছর	বিলের সংখ্যা	গণ্ডি দেওয়া জমি
১৭২৭-১৭৬০	২১২	৭৪.৫
১৭৬১-১৭৯২	১২৯১	৪৭৮.৩
১৭৯৩-১৮১৫	২১৬৯	১০১৩.৬

গণ্ডিবাঁধন আন্দোলনের ফলে বহু অনুর্বর জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব হয় এবং কৃষির নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করাও সহজ হয়। সেই কারণে দ্রুত বেড়ে চলা জনসংখ্যার মুখে খাদ্য তুলে দেওয়া, শিল্প শহরগুলিতে খাদ্য যোগানো—সবই সম্ভব হয়।

এ ছাড়া গণ্ডিবাঁধন আন্দোলন একটি শ্রমিকবাহিনী গড়ে দিতে সাহায্য করে। তাঁরা সস্তায় শ্রম দিতে সদাই প্রস্তুত ছিলেন। এঁরা ছাড়া শিল্পবিপ্লব কখনওই সফল হত না। তাঁরা কৃষক বা তথাকথিত ইয়মেন (Yeoman) শ্রেণী ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, গ্রাম ছেড়েও শহরের আকর্ষণে বেরিয়ে যান। কারণ গণ্ডিবাঁধন তাঁদের জমিচ্যুত করেছিল।

১.৬.৩ কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর

কৃষিও যে শিল্প, নতুন উৎপাদন কৌশল রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবনাই ক্রমে দৃঢ় হতে শুরু করল। আসলে কৃষি বিপ্লব ও শিল্পের বিকাশ দুটিই সেই একই সার্বিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের অঙ্গ, যাকে আমরা শিল্পবিপ্লব বলে অভিহিত করতেই অভ্যস্ত। শিল্প ও কৃষিতে পরিবর্তনের ধরনগুলিও ছিল একই রকম। কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর এসেছিল যে ভাবে, তা হল : (১) কৃষকরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রির কথা সেই প্রথম ভাবতে শুরু করেন। তার আগে শুধুই পরিবার বা বড়জোর নিজের এলাকায় বিক্রির কথা তাঁরা ভাবতেন। (২) স্ব-নির্ভর কৃষকের জায়গায় আবির্ভাব হল ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের, যাঁরা বেতনের বিনিময়ে বীজ বোনা ও ফসল ওঠার সময়ে কাজ করতেন। (৩) চিরাচরিত প্রথার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষকরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে শুরু করেন।

এইসব রূপান্তরেই কিন্তু ইন্ধন জুগিয়েছিল শস্যের চড়া দর, যা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের বৈশিষ্ট্য। নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময়ে এই দর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছয় এবং ওয়টারলু-র (Waterloo) যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে তার শেষ হয়।

১.৬.৪ শিল্পায়নে কৃষিবিপ্লবের অবদান

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, প্রাক্-শিল্পায়ন পর্বে কৃষিতে আয় বাড়লে জনসংখ্যার সিংহভাগেরই আয় বাড়ে। আবার, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এলে দাম কমে। ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের কাঁচামালের দামও কমে যায়, শ্রমিকদের খাদ্যের খরচও কমে। ব্রিটেনের কৃষিবিপ্লবের অবদানকেও ৬ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন :

১। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া। বিশেষ করে শিল্প-শহরগুলির বাসিন্দাদের পর্যাপ্ত খাদ্যের সংস্থান কৃষি উন্নয়নের ফলে সম্ভব হয়েছিল।

২। ১৭১৫ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে পরস্পর ভাল ফলন হওয়ায় ব্রিটিশ শিল্পের উৎপাদনের খরচ কমেছিল। কারণ বেশিরভাগ শিল্পই কৃষিজাত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল ছিল। এর ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের হাতে এসেছিল উদ্বৃত্ত আয়, যা তাঁরা অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার পরও ব্যয় করতে পারতেন (বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করার কারণে) শিল্পপণ্যের উপর। উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে বস্ত্রশিল্পকে। কৃষির উন্নয়নের ফলেই এই শিল্পে কাঁচামাল যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। তাই ১৭৪০-এর দশক থেকে ব্রিটেনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পের প্রসারের যে সূচনা হয়েছিল, তা সম্ভবত ছিল কৃষি উন্নয়নেরই প্রতিফলন।

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শহরের প্রসার এবং শিল্পোন্নয়নের ফলে বেড়েছিল শস্য মূল্য। তার ফলেই কৃষির আওতায় এসেছিল অনেক বেশি জমি। কৃষিতে প্রয়োগ করা হয়েছিল নতুন নতুন প্রযুক্তি। এইভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে যে পরিমাণ তুলো, লৌহ আকর এবং পশম ব্রিটেনকে আমদানি করতে হয়েছিল, তা খাদ্য আমদানি করতেই খরচ হয়ে যেত। মনে রাখতে হবে ১৭৫১ থেকে ১৮২১ সালের মধ্যে ইংল্যান্ড ও ওয়েল্‌স-এর জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছিল। অর্থাৎ, যে ক্রয় ক্ষমতা কৃষিবিপ্লব তৈরি করে দিয়েছিল, তা না ঘটলে বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হলে তা চলে যেত অন্য দেশের হাতে। অন্যদিকে কৃষি ক্ষেত্রে আয় বাড়ায় দেশের মধ্যেই শিল্পপণ্যের চাহিদা বেড়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভর করে শিল্পের প্রসার ঘটানো কিন্তু সে সময়ে সম্ভব ছিল না বললেই চলে। কারণ ব্রিটেনের প্রথম শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশিই চলছিল আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সেভেন ইয়ার্স ওয়ার (Seven Years War) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের যুদ্ধ।

৪। শিল্পের প্রসারের জন্য মূলধনের সিংহভাগও যোগান দিয়েছিল কৃষি। যেমন, প্রথম দিকে বেশিরভাগ লোহা কারখানাই তৈরি করেছিলেন জমিদাররা। স্থানীয় পরিবহন ব্যবস্থা (সড়ক, নদী বা খালপথে) গড়ায় বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থও উৎসাহ দিয়েছিলেন কৃষকরা। বহু কৃষকই নিজেদের জমির সাপেক্ষে মূলধন সংগ্রহ

করে তা লগ্নি করেন শিল্পে। বিশিষ্ট লৌহ শিল্পপতি জন উইলকিনসন (John Wilkinson)। আবার তাঁর মুনাফার একাংশ কৃষির উন্নতির জন্য লগ্নি করেছিলেন। ১৭৯৮ সালে তিনিই বসিয়েছিলেন বাষ্পচালিত ঝাড়াই মেশিন।

৫। রাজকোষে কর রাজস্বের যোগানও মূলত এসেছিল কৃষি থেকে। জমির উপর করই অষ্টাদশ শতকে সরকারের রাজস্বের মূল উৎস ছিল। ১৮০৩/১৮০৪ থেকে ১৮১৪/১৮১৫ সালে শিল্প-বাণিজ্যে কর বেড়েছিল ১০ শতাংশেরও কম। অন্যদিকে কৃষি ও জমি থেকে কর আদায় বেড়েছিল ৬০ শতাংশ।

৬। উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের শিল্পে নিয়োগ সম্ভব করেছিল কৃষি বিপ্লব। গণ্ডিবাঁধন, কৃষির নতুন উৎপাদন কৌশল, সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য জমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তর ইত্যাদির কারণে উদ্বৃত্ত হয়েছিলেন বেশ কিছু কৃষক। শিল্পেই তাঁরা নিজেদের নতুন বৃত্তি খুঁজে নিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যেতে পারে ১৬৫০ থেকে ১৭৫০-এর মধ্যে কৃষিতে যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে, সেটাই ১৭৪০-এর দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম পর্বের সূচনা করেছিল।

১.৭ পরিবহণ বিপ্লব

সাধারণত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাতেই পরিবহণ ক্ষেত্রের উন্নতি ঘটে থাকে। কিন্তু পরিবহণ ক্ষেত্রে ব্রিটেনে যে উন্নয়ন ঘটেছিল তাতে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। বেসরকারি উদ্যোগই পরিবহণ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি ঘটিয়েছিল। সরকারের ভূমিকা ছিল নিয়ন্ত্রকের, কিন্তু উদ্যোক্তার নয়।

ফেনস্টাইনের (Feinstein) হিসাব অনুসারে ১৭৬১ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত স্থির দামে (১৮৫১-১৮৬০ সালের দাম ধরে) মোট স্থায়ী মূলধন সৃষ্টিতে পরিবহণ ক্ষেত্রের অবদান ছিল ২৩ শতাংশ। ১৭৯১-১৮২০ পর্যন্ত ২০ শতাংশ, ১৮২১ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত ২০ শতাংশ এবং ১৮৪১ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত ৩৫ শতাংশ। শেষ দুটি পর্যায়ে মূলত রেলপথ নির্মাণের কারণেই মূলধন সৃষ্টি ঘটেছিল। প্রথম দুটি পর্যায়ে মূলত ঘটেছিল সড়ক ও খালপথ নির্মাণ। মোটামুটি এইসময়ে মোট মূলধন সৃষ্টির ২০ শতাংশই এসেছিল পরিবহণ ক্ষেত্র থেকে।

১.৭.১ সড়ক উন্নয়ন

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ডে সড়কের অবস্থা ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক। সাধারণ পথচারী বা ব্যবসায়ীদের জন্য তা তেমন সমস্যার সৃষ্টি না করলেও ভারী যানবাহন যে রাস্তা দিয়ে চলত, সেগুলির অবস্থা ছিল দুঃখজনক। রাস্তার অবস্থার উন্নতি করার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোনও আইনও আনা হয়নি। রাস্তাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কোনও দায় ব্যবহারকারীদের ছিল না। সব দায়িত্বই ছিল স্থানীয় গির্জা বা প্যারিশ-এর। এর জন্য তারা নিজ নিজ এলাকা থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করতে পারত। খরচ বহন করতে হত ওই সড়ক সংলগ্ন বসবাসকারীদের।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে গঠিত হয় 'টানপাইক ট্রাস্ট' (Turnpike Trust)। সেগুলির সদস্যদের উপরই সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা বাজার থেকে টাকা তুলতে পারতেন। নির্মিত রাস্তা থেকে টোল আদায় করে ঋণের উপর সুদ মেটানোর অধিকার তাঁদের দেওয়া হয়েছিল। ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে টোল আদায়ের জন্য টার্নপাইক ট্রাস্ট-এর তরফে নির্মাণ করা হত টোল গেট। প্রশাসন চালানোর জন্য অফিসার নিয়োগের অধিকার ট্রাস্টের ছিল, অন্যথায় তাঁরা সেই দায়িত্ব অপরকে লিজ দিতেও পারতেন। সাবেকি গির্জার প্রশাসন ব্যবস্থার তুলনায় টার্নপাইক ট্রাস্টগুলি ছিল যথেষ্ট দক্ষ। স্থানীয় যে সব ব্যবহারকারীকে প্রায়ই টোল গেট পেরোতে হত, তাঁদের জন্য ছিল ভর্তুকির ব্যবস্থা।

১.৭.২ খাল নির্মাণ

বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী পরিবারের তরফে নির্মাণ করা হয় খাল। মূলধন তাঁরা নিজেরাই যোগাতেন, বা আত্মীয়-বন্ধুর কাছ থেকে ঋণ নিতেন। তবে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলিই ছিল খাল পথ নির্মাণের মূল উদ্যোক্তা। সরকারই নিজস্ব আইন বলে ওই সব সংস্থা গঠন করে খাল নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশাসন চালাতেন। জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলি জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করতে পারতেন, বণ্ড ছেড়েও তহবিল সংগ্রহ করতে পারতেন। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা মূলধনী বাজারের বিস্তারেও সাহায্য করেছিল। শেয়ারহোল্ডারদের বেশির ভাগই ছিলেন স্থানীয় মানুষ। পরের দিকে অবশ্য ১৭৮০-র দশকে খাল নির্মাণ বেড়ে যাওয়ায় সকলেই লগ্নিতে উৎসাহ পেয়েছিলেন। খাল নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল কয়লা পরিবহণ।

১.৭.৩ রেলপথ নির্মাণ

রেলপথ নির্মাণ শুরু হওয়ার আগেই সেই লক্ষ্যে গড়া হয় বিভিন্ন কমিটি। তাঁরা সমীক্ষা করে দেখেন এবং পার্লামেন্টে আইন পাশ করাতে উদ্যোগী হন। টার্নপাইক স্ট্রাস্ট এবং খাল নির্মাণ সংস্থাগুলির তুলনাতেও আরও বেশি মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিল রেল কোম্পানিগুলি। ক্ল্যাপহ্যাম (Clapham) এবং রিগলে (Wrigley) দেখিয়েছেন, রেলপথ নির্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্যও ছিল আরও বেশি পরিমাণ কয়লা পরিবহণ।

আসলে কৃষিপণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণ যেমন উপযোগী, খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে তা নয়। কারণ কৃষির ফলন একটি নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে হয়। অন্যদিকে খনিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে নানা বিন্দুতে। সেই কারণেই রেল সংযোগ গড়াটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল এইসব খনিজ দ্রব্য পরিবহণের জন্য। কারণ, সড়ক পরিবহণ এক্ষেত্রে ছিল অনুপযোগী। তুলনায় খাল পরিবহণ ছিল কার্যকর, রেল পরিবহণই সবচেয়ে সুবিধাজনক। খাল এবং রেলপথগুলির কোনটি কতটা লাভজনক তাও নির্ভর করত তাদের কয়লা পরিবহণের পরিমাণের উপর। রেলের শেয়ার নিয়ে ফাটকা কারবারেও সে সময়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন অনেকে।

১.৭.৪ পরিবহণ বিপ্লবের অবদান

টার্নপাইক ট্রাস্ট, খাল সংস্থা, রেল সংস্থা-এসবই কিন্তু নতুন উদ্ভাবন ছিল। সেগুলি ছিল একে অপরের পরিপূরক এবং একই সঙ্গে পরস্পরের প্রতিযোগী। যেমন, পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে সড়ক এবং রেলপথ ছিল একে অপরের পরিপূরক। কিন্তু যাত্রী পরিবহণে এই দুটি মাধ্যম ছিল প্রতিযোগী। রেল এবং খাল সংস্থাগুলির মধ্যেও ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা।

পরিবহণ ব্যবস্থায় এইসব উদ্ভাবনের ফলে বাজার ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। পাশাপাশি পরিবহণ ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটলে সহজেই তার সুফল ভোগ করতে পেরেছিল অন্যান্য ক্ষেত্রে। যেমন, কিছু কিছু উপাদানের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল উল্লেখযোগ্য হারে। লৌহ শিল্পের বিকাশ রেলপথ নির্মাণের হাত ধরেই ঘটেছিল।

বিশেষ করে রেলপথ নির্মাণের ফলে 'সামাজিক সঞ্চয়' বেড়ে গিয়েছিল বলে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা পরিমাপ করে দেখিয়েছেন। সামাজিক সঞ্চয়কে ধরা হয়েছে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হিসাবে। একটি হিসাবে ১৮৬৫ সালে রেলপথের সুফল ধরে জাতীয় আয় দেখানো হয়েছে। যদি ১৮৬৫ সালে ব্রিটেনে রেলপথ না থাকত, তাহলে পরিস্থিতি যা হত, তার সঙ্গে এরপর তুলনা টানা হয়েছে। যাত্রী এবং পণ্য পরিবহণ দুটি ক্ষেত্রেই এই হিসাব করা হয়েছে। রেলপথ না থাকলে বেশিরভাগ যাত্রীই যে সড়ক পরিবহণকে বেছে নিতেন, এটা ধরে নিয়ে হিসাব করা হয়েছে।

(ক) ১৮৪০ সালে কোচ ভাড়া করে যাত্রা করলে খরচ পড়ত মাইল প্রতি ৪ পেন্স।

(খ) কোচ ছাড়া সর্বসাধারণের সঙ্গে যাত্রা করলে তা ছিল ২.৫ পেন্স। (ক)-কে প্রথম শ্রেণীর রেলযাত্রার সমতুল ধরলে দেখা যাচ্ছে ১৮৬৫ সালে সামাজিক সঞ্চয় দাঁড়াচ্ছে জাতীয় আয়ের ১.৬ শতাংশ।

এবার আসা যাক পণ্য পরিবহণের প্রসঙ্গে। খালপথের সঙ্গে রেলপথের তুলনা করে এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, সামাজিক সঞ্চয় ছিল জাতীয় আয়ের ৩ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে। ১৮৭০ সালকে ধরে হিসাব করলে রেলের অবদান দাঁড়ায় জাতীয় আয়ের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। এই অঙ্কেও সম্ভবত রেলের অবদান পুরোপুরি ধরা পড়েনি। কারণ লোহাশিল্পের বিকাশ, স্টক এক্সচেঞ্জের প্রসার ইত্যাদিতে রেল নির্মাণের যে ভূমিকা ছিল, এই হিসাবে তা ধরা পড়েনি। মনে রাখা প্রয়োজন এই পরিবহণ বিপ্লবে বেসরকারি পুঁজিই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

১.৮ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পবিপ্লব

১. শিল্পবিপ্লব শব্দগুচ্ছটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, এটিকে ব্যাপক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সূচক হিসাবে ধরা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লবকে আমরা বিভিন্ন আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি। যেমন, বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, বিভিন্ন রাসায়নিক, বিদ্যুৎ, পরবর্তীকালে বিমান পরিবহণ ইত্যাদি।

এই সমস্ত আবিষ্কার উৎপাদনের খরচ বাঁচাতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু প্রথম আবিষ্কার যে সবসময় ব্যয়সঙ্কোচ সম্ভবপর করে তা নয়। পরবর্তী পর্যায়ে অসংখ্য সাধারণ কর্মী, উৎপাদকের চিন্তা-ভাবনার ফসল হিসাবে আসে উদ্ভাবন। তাঁদের নাম ইতিহাসে লেখা থাকে না। কিন্তু নিজেদের কাজের সুবিধা করতে গিয়েই তাঁরা এমন সব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন, যা আবিষ্কারকে ছড়িয়ে দিয়ে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করতে সাহায্য করে। প্রতিযোগিতার বাজারে একটি সংস্থার ব্যয় সাশ্রয় অন্য সংস্থাকেও তা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর জন্য নতুন করে যন্ত্রপাতি বসানোরও প্রয়োজন হয় না। পুরনো যন্ত্রকে একটু পরিবর্তন করে নিলেই চলে। তাই নতুন করে স্থায়ী মূলধনে বিনিয়োগ করতে হয় না। এইভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল ব্রিটেনের প্রথম শিল্পবিপ্লব।

২। শিল্পবিপ্লবের আর একটি সংজ্ঞা হল সর্বপ্রথম হস্তচালিত বা পশুর সাহায্যে চালিত ব্যবস্থার বদলে যন্ত্র বা মেশিন-এর ব্যবহার। এর পরিণতিতেই বহু হস্তশিল্প রূপান্তরিত হয় আধুনিক কারখানায়, সূচনা ঘটে আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার। এই অর্থে বহু দেশেই শিল্পবিপ্লব আজও চলছে।

৩। শিল্পবিপ্লবের তৃতীয় সংজ্ঞাটি আসছে দ্বিতীয়টি থেকে। কারখানা ব্যবস্থার প্রসারের ফলে নতুন প্রথায় বাড়ে মূলধনের ব্যবহার। মূলধনের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের সীমিত ক্ষমতা থেকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্তি দেয় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। কাজে আসে নিয়মানুবর্তিতা। সূচনা হয় নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট কর্মী নিয়োগ অর্থাৎ বিশেষায়ণ প্রথার। পাশাপাশি, চিরাচরিত ভাবে পারিবারিক ভিত্তিতে উৎপাদনের জায়গা নেয় কারখানা ব্যবস্থা। উৎপাদন ব্যবস্থায় এত সব পরিবর্তনকে তাই অনায়াসেই বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

১.৯ সারাংশ

১৭৫০ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেনের যে রূপান্তর ঘটেছিল, সেটাই সে দেশে শিল্পায়নের সূচনা করে। কৃষির তুলনায় বেড়ে যায় উৎপাদন শিল্পের গুরুত্ব, যা এককথায় প্রথম শিল্পবিপ্লব হিসাবে পরিচিত। কারণ অন্য রাষ্ট্রগুলির আগে তা ব্রিটেনেই ঘটেছিল। বস্ত্র বয়নের সুতো কাটার নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, রেল ইঞ্জিন, ছাপাখানা ইত্যাদির আবিষ্কার এই বিপ্লবের সূচনা করেছিল। বিপ্লবের নেতৃত্ব তুলে নিয়েছিল সুতিবস্ত্র শিল্প। ছোট ছোট পারিবারিক উদ্যোগগুলি নতুন যন্ত্রপাতি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল বলেই এই শিল্পের এত উন্নতি ঘটেছিল অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডে। তবে সুতিবস্ত্র শিল্পকে অনেকটাই নির্ভর করতে হয়েছিল আমদানি করা কাঁচামাল, তুলোর উপর। লৌহ শিল্প ব্রিটেন থেকেই কাঁচামাল আহরণ করেছিল। এই শিল্প সুতিবস্ত্র শিল্পের মতো শ্রম-নিবিড় ছিল না। আগাগোড়াই ছিল কারখানাভিত্তিক ও মূলধন নির্ভর।

শিল্পে ধারাবাহিক পরিবর্তনের হাত ধরেই আসে ব্রিটেনে জন বিপ্লব। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে শুরু করে, যা শিল্পে শ্রমের যোগান দিতে সাহায্য করেছিল। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে কৃষিবিপ্লব, যা কৃষিতে

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সূচনা করেছিল। তারই হাত ধরে আসে গণ্ডিবাঁধন আন্দোলন। কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা কাজ পান কারখানায়। অর্থনীতিতে সঙ্কুচিত হতে থাকে কৃষি নির্ভরতার অনুপাত।

অন্যদিকে পরিবহণ বিপ্লব সড়ক, খাল ও শেষ পর্বে রেলপথ নির্মাণ সম্ভব করে তোলে। পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নই বাজার ব্যবস্থার প্রসার ঘটায়। লৌহ শিল্পে কাঁচামালের যোগান আসত রেলপথেই।

এক কথায় ব্রিটেনের প্রথম শিল্পবিপ্লব প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের সীমিত ক্ষমতাকে ব্যাপকতা দিয়েছিল। এত পরিবর্তন একসঙ্গে এসেছিল বলেই তাকে বৈপ্লবিক বলে চিহ্নিত।

১.১০ অনুশীলনী

১। শিল্পবিপ্লবের সূচনা কীভাবে হয়েছিল? কেমন ছিল পরিবর্তনগুলির ধরন?
২। শিল্পবিপ্লবের সময়কাল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত ব্যাখ্যা করুন।
৩। প্রাক্-শিল্পবিপ্লব আমলে কেমন ছিল ব্রিটেনের পরিস্থিতি?
৪। শিল্পবিপ্লব সর্বপ্রথম ব্রিটেনেই ঘটল কেন?
৫। সুতিবস্ত্র শিল্পে আবিষ্কারের সূচনা কী ভাবে হয়? এই শিল্পের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনগুলি বিবৃত করুন।
৬। লৌহ শিল্পের সঙ্গে সুতিবস্ত্র শিল্পের মূল পার্থক্য কী? এই শিল্পে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন কীভাবে এসেছিল?
৭। ব্রিটেনের অর্থনীতি এবং শিল্পবিপ্লবে লৌহ শিল্পের অবদান ব্যাখ্যা করুন।
৮। ব্রিটেনে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কীভাবে ঘটেছিল তা পরিসংখ্যান দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।
৯। ব্রিটেনে মৃত্যুহার কমা ও জন্মহার বৃদ্ধির কারণ কী কী ছিল?
১০। শিল্পবিপ্লবের প্রাক্কালে কৃষিতে কী কী প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আসে?
১১। গণ্ডিবাঁধন আন্দোলন কী?
১২। কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর ও শিল্পবিপ্লবে তার অবদান ব্যাখ্যা করুন।
১৩। ব্রিটেনে পরিবহণ বিপ্লবের ধরন বুঝিয়ে বলুন।

১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। P. Deane, The First Industrial Revolution, Cambridge University Press, First Indian Edition. (1994)
২। E. Hobsbowm, Industry and Empire. (1968)
৩। R. Hartwell (ed), The Causes of the Industrial Revolution in England (1967).
৪। হরশঙ্কর ভট্টাচার্য, ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব ও তারপর, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

একক ২ ☐ মূলধনের প্রবাহ

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ আর্থিক বিপ্লব

২.২.১ ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের কর্মকাণ্ড

২.৩ ব্রিটেনে মূলধন প্রবাহের ধরন

২.৩.১ মূলধন প্রবাহের পরিসংখ্যান

২.৩.২ মূলধন প্রবাহে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদান

২.৩.৩ মূলধনের উৎস

২.৩.৪ শিল্প বিকাশে ব্যাঙ্কের ভূমিকা

২.৪ সারাংশ

২.৫ অনুশীলনী

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন—

- শিল্পবিপ্লবের আমলে অর্থাৎ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে কীভাবে মূলধনের প্রবাহ (Capital formation) বেড়েছিল।
- এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে ব্রিটেনের আর্থিক বিপ্লব এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রচলন। তাই এই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করা হবে এই এককে।

২.১ প্রস্তাবনা

ব্রিটেনে আর্থিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৬৮৮ সাল নাগাদ)। তা চলেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত (১৭৫০ সাল)। আর্থিক বিপ্লব বলতে বোঝায় সরকারি ঋণ গ্রহণের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন এবং তা ব্যবস্থাপনার নতুন পদ্ধতি। এর অঙ্গ হিসাবেই জন্ম নেয় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড। দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক হিসাবে ক্রমে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। আর্থিক বিপ্লবের পরিণতিতেই ব্রিটেনে বাড়ে মূলধনের প্রবাহ। রস্টো তাঁর উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের তত্ত্বে ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ সালকে চিহ্নিত করে বলেছেন, এই সময়েই মূলধনের প্রবাহ বেড়েছিল সবচেয়ে বেশি হারে। এটিকেই তিনি প্রাক্-উন্নয়ন বা 'টেক অফ' পর্ব বলে অভিহিত করেছেন।

২.২ আর্থিক বিপ্লব

সরকারের ঋণ গ্রহণের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল ব্রিটেনের আর্থিক বিপ্লব। এরই পাশাপাশি ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠা শিল্পে মূলধন যোগাতে সাহায্য করেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের রাজকোষের আয়ের মূল উৎস ছিল কর রাজস্ব এবং ভাড়া খাতে আসা অর্থ। এছাড়া ছিল আমদানি শুল্ক। তবে আয়ের তুলনায় বেশি ব্যয় করাটাই ছিল রীতি। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাই রাজকোষের ঘাটতি পুরণ করতে ধার করাটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত ঋণদাতারা থাকলেও ঋণ দেওয়ার কোনও প্রতিষ্ঠান সে সময়ে ছিল না, ঋণের বাজারও গড়ে ওঠেনি। তাই চড়া সুদে ধার করতে হচ্ছিল সরকারকে। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুবিধাও তাঁরা পাচ্ছিলেন না।

অন্যদিকে আয় বাড়নোর জন্য সরকার নানাভাবে কর বসানোও শুরু করেন। পেটেন্ট প্রদান করে আয় বাড়ানোর প্রথাও চলতে থাকে। তবে এ নিয়ে রাজপরিবার ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধ বাঁধে। শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ এবং ১৬৮৮ সালে রাজসিংহাসনে বৈপ্লবিক রদবদলের পর (যা Glorious Revolution বলে পরিচিত) ওই সব সামন্ততান্ত্রিক প্রথা বাতিল হয়ে যায়। ওই Glorious Revolution-এর মাধ্যমেই সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিবর্তে সরকারকে উৎপাদন শুল্ক আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এইসব পরিবর্তনও রাজকোষ ঘাটতি মেটাতে সক্ষম হয়নি। কারণ, উৎপাদন বা আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধের খরচ মেটানো সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। সেই কারণেই ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৬৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা ব্রিটেনে তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। পরবর্তী পর্যায়ে যে আর্থিক বিপ্লব ঘটে যায়, তাকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

১। ১৬৯৩ থেকে ১৬৯৭ :

এই পর্বেই ১৬৯৪ সালে ১২ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন নিয়ে গঠিত হয় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড। সরকারের জন্য অর্থের সংস্থান করাই ছিল এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। শীর্ষ একটি ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ততদিনে অনুভূত হয়েছিল। এই সময়েই স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের মধ্যে বিভাজন রেখাও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'টনটিন' নামে এক ধরনের জীবনবিমাও চালু হয় এই সময়ে।

২। ১৬৯৭ থেকে ১৭১৩ :

এই সময়টি ছিল যুদ্ধ বিগ্রহের। বিভিন ধরনের ঋণপত্র ছাড়তে শুরু করে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড। ১৭০০ সালে এই ব্যাঙ্ক আমদানি করা সোনা মজুত করতে শুরু করে এবং তার সাপেক্ষে ঋণ দিতে থাকে।

৩। ১৭১৩ থেকে ১৭৩৯ :

ঋণ যে পরিশোধ করতেই হয়, এই ধারণাটি এ সময়েই গড়ে ওঠে। তার আগে মনে করা হত একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সংশ্লিষ্ট ঋণের আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। জাতীয় ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে এই সময়ে গড়া হয় 'সিংকিং ফাণ্ড' (Sinking Fund)। নতুন ঋণ পরিশোধ করার জন্য এই তহবিল ব্যবহার করা হত। সুতরাং নতুন নতুন কর বসানোর প্রয়োজনীয়তাও কমে আসে।

৪। ১৭৩৯ থেকে ১৭৪৮ :

এই সময়টিও ছিল যুদ্ধ বিগ্রহের। সরকারের তরফ থেকে এই সময়ে মূলত শেয়ার বিলি করেই ঋণ নেওয়া শুরু হয়েছিল। সুদের হারও ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের পরিচালনার গুণে ১৬৯০-এর দশকের ১৪ শতাংশ থেকে নেমে এসেছিল ৩ শতাংশে। শেয়ারগুলি পুনঃক্রয়ের জন্য কোনও নির্দিষ্ট তারিখ বেঁধে দেওয়া হত না। তাই এগুলি দীর্ঘ মেয়াদে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। জাতীয় ঋণের অঙ্কও পৌঁছে গিয়েছিল ৭ কোটি পাউণ্ডে।

৫। ১৭৪৯ থেকে ১৭৫৬ :

সরকারি ঋণ নেওয়ার পদ্ধতি আমূল বদলে গিয়েছিল এই পর্বে। এই সময়েই ঋণপত্রগুলি রূপান্তরিত হয়েছিল দীর্ঘমেয়াদী শেয়ারে। সুদের ভাগ কমে দাঁড়িয়েছিল মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ। সমগ্র অষ্টাদশ শতকেই তা ছিল রাজস্বের অর্ধেক থেকে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে। এখান থেকেই দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সূত্রপাত হয়।

২.২.১ ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের কর্মকাণ্ড

প্রকৃতপক্ষে আর্থিক বিপ্লব এবং ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের কর্মকাণ্ড ব্রিটেনে মূলধনী বাজারের বিকাশ সম্ভবপর করে তোলে। ফলে শেয়ার, বিল ইত্যাদি কাগজ-নির্ভর সম্পদের আবির্ভাব ঘটে। সেগুলি নতুন

সঞ্চয়কারীরা কিনতে যথেষ্ট আগ্রহী হয়েছিলেন। ঋণদাতারা অর্থ সংগ্রহ করতে চাইলেই সঞ্চয়কারীরা সেগুলি কিনতেন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সংযোগও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। পাশাপাশি, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড এবং মফঃস্বলের অন্য ব্যাঙ্কগুলিও আমানত সংগ্রহ শুরু করে দেয়, যা বেসরকারি ক্ষেত্রকে ঋণ দেওয়ার পুঁজি হিসাবে কাজ করে। আমানতকারীরা তাঁদের জমা রাখা স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রতিদিনই কিছু কিছু করে তুলে নিতেন। সেই চাহিদা মিটিয়ে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড নোট বিলি করতে শুরু করে। সূত্রপাত হয় নির্দিষ্ট অঙ্কের কাগুজে নোটের।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থিক বিপ্লবের মূল কথা হল নানা ধরনের ঋণপত্র কেনাবেচার সূত্রপাত। ব্রিটেনের বিভিন্ন বাণিজ্য কোম্পানি (যেমন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি), বিমা সংস্থা ইত্যাদি সেগুলিতে নিরাপদে বিনিয়োগ করতে পারতেন, আবার তা তুলে নিতেও পারতেন। মূলধনী বাজারের এই বিকাশের ফলেই ক্রমে বিশ্বের অর্থনৈতিক রাজধানী হিসাবে হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টারডামকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় লণ্ডন। ১৭৫০-এর দশকে দেশে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড, যদিও অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার তখনও তার হাতে আসেনি।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাউণ্ড কার্যত যুক্ত ছিল রূপোর যোগানের সঙ্গে। সেই কারণেই তার নাম হয় পাউণ্ড স্টার্লিং (Pound Sterling)। এলিজাবেথের আমল থেকে এটাই ছিল প্রথা। কিন্তু পরের দিকে ইউরোপের বেশিরভাগ স্থানে এবং পশ্চিম এশিয়ায় রূপোর ঘাটতি দেখা দেয়। কারণ ইংল্যাণ্ডের টাকশালের দরের তুলনায় বাজার দর ছিল বেশি। তাই ব্যবসায়ীরা রূপো বিক্রি করে দিচ্ছিলেন ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায়। বিনিময়ে আনছিলেন স্বর্ণ। অবধারিত ভাবেই ১৭৬০-এর দশকের মধ্যে রূপোর মুদ্রার প্রচলন বাজারে আর ছিল না বললেই চলে। পরিবর্তে মুদ্রা ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে এল স্বর্ণ। ইংল্যাণ্ড চলে এল কার্যত 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' (Gold Standard)-এ। ১৭৭০-এর দশকে স্বর্ণকে কিছুটা স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে ২৫ পাউণ্ডের বেশি লেনদেনে রূপোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮১৬ সালে স্বর্ণকে পুরোপুরি বৈধ মুদ্রার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে চেক-ও সর্বপ্রথম চালু হয় ব্রিটেনে। উপরন্তু ব্যাঙ্ক নোট তো প্রথম থেকেই বিলি করছিল ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড। অন্য বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি নোট বিলি করলেও ১৭৭০-এর দশকের মধ্যেই তা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

এবার শিল্পবিপ্লবের আমলে অর্থের যোগানের প্রসঙ্গে আসা যাক। মুদ্রার যোগান মূলত নির্ভর করত ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের কাছে থাকা স্বর্ণভাণ্ডারের উপর। এছাড়া বিশ্ব বাজারে সোনার চাহিদা ও যোগান এবং ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্যের উপরও তা নির্ভরশীল ছিল। রপ্তানি যদি আমদানির তুলনায় বেশি হত, তাহলে দেশে সোনা আসত। অন্যদিকে আমদানি বেশি হলে সোনা পাঠিয়ে দিতে হত বিদেশে, কারণ আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম ছিল স্বর্ণই। ব্যাঙ্ক কত স্বর্ণ মুদ্রা বাজারে ছাড়তে পারবে, তা নির্ভর করত বিশ্ব বাজারে সোনার দামের উপর। এটাই স্থির করে দিত পাউণ্ড স্টার্লিং-এর স্বর্ণমূল্য।

ব্যাঙ্ক নোটের যোগানও নির্ভর করত স্বর্ণের পরিমাণের উপর। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম তিনটি দশক পর্যন্ত শুধু যে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডই বাজারে নোট ছেড়েছিল, তা নয়। অন্তত সমপরিমাণ নোট ছেড়েছিল মফস্‌সলের ব্যাঙ্কগুলি। ১৭৯০-এর দশক পর্যন্ত ১০ পাউণ্ডের কম মূল্যের কোনও নোট বিলি করেনি ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড। স্থানীয় ভিত্তিতে কম মূল্যের নোট (যেমন ১ পাউণ্ড) বিলি করত অন্য ব্যাঙ্কগুলি এবং ব্যবসায়ীরা সেগুলি সুবিধাজনক বলে ব্যবহারও করতেন। ব্যবসায়ী এবং সরকারকে ঋণ প্রদানই ছিল ব্যাঙ্কগুলির লাভের মূল উৎস। এতগুলি ব্যাঙ্ক সব মিলিয়ে কত নোটের যোগান দিয়েছিল, তার সঠিক হিসাব দেওয়া কঠিন। তবে ব্যাঙ্কগুলি তাদের মোট আমানতের চেয়ে বেশি অর্থ কখনই ঋণ দিতে পারত না। সমস্ত ব্যাঙ্ক নোট-ই স্বর্ণমুদ্রায় প্রয়োজনে রূপান্তর করা যাবে এই প্রতিশ্রুতি তাকে দিতে হত। কারণ আমানতকারীরা অর্থ তুলে নেওয়ার সময়ে অনেক সময়েই তা স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্তর করে নিতে চাইতেন। সুতরাং নোটের যোগানও পরোক্ষভাবে নির্ভর করত স্বর্ণভাণ্ডারের উপর। এই ব্যবস্থা ১৭৯৭ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। ওই সময়ে ফরাসী বিপ্লব সংক্রান্ত যুদ্ধের প্রভাবে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে দেখা দেয় ঘাটতি। তখনই স্বর্ণে আমানতকারীদের পাওনা মেটানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। সুতরাং অর্থের যোগান স্বর্ণের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারণ করার দায় থেকেও সাময়িকভাবে মুক্ত হয় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড। লাভজনক প্রকল্প দেখলেই ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের ঋণ দেওয়াও সহজতর হল।

তখনও চলছিল নেপোলিয়নের যুদ্ধ। ১৮১৫ সালে ওয়াটারলু-তে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পরও চলতে থাকে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, বাণিজ্যে মন্দা। তার আরও ছ'বছর পরে ১৮২১ সালে সোনার বাজার দর এবং টাকশালের দরের মধ্যে আবার সমতা ফিরে আসে। ওই বছরই সোনায় অর্থপ্রদান আবার শুরু হয়, সরকারিভাবে Gold Standard-এ আবার নিয়ে আসা হয় ব্রিটেনকে। ওই সময়ে ব্রিটেনের অর্থ ব্যবস্থার ছিল তিনটি দিক (১) মূল স্তম্ভ ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড, যেটি সরকারের ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রের স্বর্ণভাণ্ডারের রক্ষক হিসাবে কাজ করত। (২) লণ্ডনে প্রায় ৬০টি বেসরকারি ব্যাঙ্ক, যেগুলি যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে কাজ করলেও নোট বিলি করত না। (৩) মফস্‌সলের ৮০০-র মতো বেসরকারি ব্যাঙ্ক, যেগুলি নোট বিলিও করত।

এই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলি অনেকক্ষেত্রেই দক্ষতার নজির রাখলেও এ কথা ঠিক যে সকলে সমান সৎ ছিল না। নোট ইস্যুকারী এতগুলি ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের ছিল না। তাই তাদের যথেচ্ছ ঋণদান, সম্ভাবনাহীন প্রকল্প এবং দক্ষিণ আমেরিকার খনন প্রকল্পে ঋণদানের ফলে এবং ফাটকা কারবারের জেরে ১৮২৫ সালে দেখা দেয় আর্থিক সঙ্কট। এমন অনেক রপ্তানি প্রকল্পেও ছোট ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়েছিল, যার অর্থ কোনওদিনই দেশে এসে পৌঁছয়নি। ফলে মফস্‌সলের অনেক ব্যাঙ্কই দেউলিয়া হয়ে গেল, বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, স্বর্ণের ঘাটতির ফলে Gold Standard থেকে কার্যত বেরিয়ে আসে ব্রিটেন। এই বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয় সরকার। একের পর এক জারি হয় আইন।

ব্যাঙ্ক আইন, ১৮২৬ (Bank Act, 1826) : সর্বপ্রথম জারি হয় এই আইন। এর আগে পর্যন্ত কোনও ব্যাঙ্ককেই ৬টির বেশি অংশীদার রাখতে দেওয়া হত না। ফলে তাদের সম্পদও হয়ে পড়ত সীমিত। ১৮২৬ সালের আইনে এই নিয়ম আংশিকভাবে শিথিল করা হয়। লণ্ডন শহর থেকে ৬৫ মাইল দূরত্বের বাইরে যে সব ব্যাঙ্ক অবস্থিত ছিল, সেগুলিকে ৬টির বেশি অংশীদার রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। জয়েন্ট স্টক সংস্থার ধাচে তাদের ব্যাঙ্ক গড়তে বলা হয়। লণ্ডন এবং সংলগ্ন অঞ্চলে একরকম একচেটিয়া আধিপত্য দেওয়া হয় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডকে।

ব্যাঙ্ক আইন, ১৮৩৩ (Bank Act, 1833) : প্রথমত এই আইনে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের নোটকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়। এর ফলে অন্য ব্যাঙ্কগুলিরও সুবিধাই হয়েছিল। তারা প্রয়োজনে সরাসরি ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে নোট নিতে পারত, আলাদা করে অনুরোধ পাঠাতে হত না। দ্বিতীয়ত, নির্ধারিত হারের তুলনায় বাড়তি সুদ নেওয়ার অনুমতি পায় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড। সুদের ঊর্ধ্বসীমা ছিল ৫ শতাংশ। তবে মনে করলে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড তার চেয়ে বেশি সুদ দাবি করতে পারত।

ব্যাঙ্ক চার্টার আইন, ১৮৪৪ (Bank Charter Act, 1844) : এই আইনে নোট বিলির উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। প্রথমত নতুন কোনও ব্যাঙ্ককে যে নোট বিলি করতে দেওয়া হবে না,তা জানিয়ে দেওয়া হয়। অন্য ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রেও বেঁধে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ সীমা। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পযন্ত মূল্যের নোট বিলির জন্য কোনও স্বর্ণ মজুত রাখতে হবে না। বাদবাকি নোট ছাড়া হবে স্বর্ণের ভিত্তিতে। 'পিল' (Peel) এই আইনের প্রবক্তা বলে এটিকে পিলের আইন বলা হয়। তবে অর্থের যোগান বাড়ানোর প্রয়োজনে এই সীমা মাঝে মাঝেই শিথিল করা হত।

এই সময়ে দুটি শিবির ছিল, যাদের বলা হয় 'ব্যাঙ্কিং স্কুল' (Banking School) এবং 'কারেন্সি স্কুল' (Currancy School)। ব্যাঙ্কিং স্কুলের ধারণা ছিল, শিল্পের প্রয়োজনে যথেচ্ছ ঋণ দিলেও ভয়ের কোনও কারণ নেই। যেহেতু ওই ঋণ নিয়ে প্রকৃত লগ্নি হচ্ছে, তাই আশঙ্কার কারণ তাঁদের মতে ছিল না। এই জন্যই ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের নোট বিলি নিয়ন্ত্রণে কোনও কড়া আইন আনার ব্যাপারে তাঁদের সায় ছিল না। কারেন্সি স্কুল অবশ্য এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের মতে, মুদ্রা এবং নোট সমেত অর্থের পুরো যোগানই স্বর্ণ ভিত্তিক হওয়া উচিত।

ব্যাঙ্ক চার্টার আইন ১৮৪৪-এ আপাতদৃষ্টিতে কারেন্সি স্কুলই কিছুটা বিজয়ী হয় বলে ফিলিস ডিন-এর ধারণা। এই আইনে ব্যাঙ্কের আমানত এবং ঋণ প্রদানের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়নি। কিন্তু এগুলি যে অর্থের যোগানের উপর শেষ পর্যন্ত প্রভাব ফেলবে আইনের প্রবক্তারা তা হয়তো অনুধাবন করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই এগুলি নিয়ন্ত্রণের ভার হাতে তুলে নিয়ে শীর্ষ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব পালন করতে শুরু করে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড।

উপসংহারে বলা যেতে পারে আলোচ্য সময়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললেও, একথা ঠিক যে উন্নয়নমুখী অর্থনীতিতে ব্যাঙ্কগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারেও ব্যাঙ্কের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৮৩০ এবং ১৮৪০-এর দশকে দেশের লগ্নিযোগ্য তহবিল রেলপথ নির্মাণে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমও ছিল ব্যাঙ্ক। পরবর্তী পর্যায়ে বিদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে লগ্নির তহবিল যোগান দিয়েছিল ব্যাঙ্ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিনটি ত্রৈমাসিক জুড়ে তারা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে সাহায্য করেছিল বলেই বেড়েছিল ব্রিটেনের মূলধনের প্রবাহ।

২.৩ ব্রিটেনে মূলধন প্রবাহের ধরন

শ্রম ছাড়া উৎপাদনের যে উপাদানটি ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের পক্ষে অপরিহার্য ছিল, তা হল মূলধন। একটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান যে প্রাক্ শিল্পায়ন পর্বের তুলনায় বেড়ে যায়, তার মূলে রয়েছে একটি কারণ : সেখানে সমপরিমাণ কাজ করে অনেক বেশি পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করা সম্ভব হয়। আর, এটা যে সম্ভব হয়, তার কারণ, তাঁর হাতে প্রচুর পরিমাণ মূলধন থাকে, যার ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। কর্মীদের হাতে থাকে অনেক বেশি যন্ত্রপাতি, যাত্রা করার জন্য থাকে অনেক বেশি মাইল সড়ক, রেলপথ বা জলপথ। দৈনন্দিন খরচ বাঁচিয়ে লগ্নির অভ্যাস গড়ে তোলা থেকেই উদ্ভব হয় এই মূলধনের।

অধ্যাপক ডব্লিউ এ লুইস (W. A Lewis) তার প্রবন্ধ 'ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট উইথ আনলিমিটেড সাপ্লাইস্ অব লেবার্ক-এ মূলধনের প্রবাহের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্কের একটি তত্ত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোনও একটি দেশ যখন তার সঞ্চয়ের হারকে জাতীয় আয়ের ৫ থেকে ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ থেকে ১২ শতাংশ নিয়ে যেতে সক্ষম হয় তখনই সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা হয়। অধ্যাপক রস্টো-ও তাঁর স্টেজেস অব ইকনমিক গ্রোথ'-এ বলেছেন, সঞ্চয়ের হারের এই বৃদ্ধি না হলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। রস্টো ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ পর্যন্ত সময়কে শিল্পায়নের সূচনা পর্ব বা 'টেক-অফ পিরিয়ড' বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ, ওই সময়েই উল্লিখিত হারে মূলধনের প্রবাহ ঘটেছিল।

২.৩.১ মূলধন প্রবাহের পরিসংখ্যান

পরিসংখ্যানের সাহায্যে মূলধনের প্রবাহের যথার্থ সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ করেন হাভাকুক (Habakuk) এবং ফিলিস ডিন। পরবর্তীকালে তা করেন ডিন এবং ডব্লিউ এ কোল। এই সমীক্ষা থেকে জানা গেছে :

১। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গ্রেগরি কিং-এর দেওয়া হিসাব অনুসারে দেশের বিনিয়োগের অঙ্ক ছিল জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে যুদ্ধ ও খারাপ কৃষি ফলনের কারণের বিনিয়োগের অঙ্ক স্থিতিশীল ছিল না। পুরো শতাব্দী ধরলে গড় বিনিয়োগের প্রবাহ ছিল ৩ শতাংশ।

২। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মূলধন প্রবাহের হার তেমন বাড়েনি। মোটামুটিভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর হারই বজায় ছিল।

৩। ১৭৫০ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১৭৭০-এর দশক পর্যন্ত মূলধনের প্রবাহ কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ থেকে ৭ শতাংশ।

৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুটি দশকে যথেষ্ট বেড়েছিল মূলধনের প্রবাহ, তবে তা শতাব্দী শেষেও ছিল ৮ শতাংশের নীচে।

৫। নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময়ে বিনিয়োগের এই হার সম্ভবত বজায় রাখা যায়নি। তাই ১৮২০-র দশকে তা ১০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ১৮৩০-এর দশক থেকে বেশির ভাগ বছরেই মূলধনের প্রবাহ ১০ শতাংশে পৌঁছেছিল।

এককথায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে মূলধন প্রবাহের গড় হার ছিল অত্যন্ত কম (৩ শতাংশ)। অষ্টাদশ শতকের শেষ দু'দশকে তা বেড়েছিল। তবে গড় হার ১০ শতাংশে পৌঁছয়নি। সুতরাং ১৭৮০-৮২ সালের মধ্যেই ব্রিটেন 'টেক-অফ' (take-off) পর্বে পৌঁছে গিয়েছিল বলে রস্টো, যে দাবি করেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়, যদি আমরা ধরি যে, এই পর্বে পৌঁছনোর পূর্বশর্ত হয় ১০ শতাংশ হারে মূলধন বৃদ্ধি।

পরবর্তীকালে ব্রিটেনে মূলধনের প্রবাহ হিসাব করে দেখিয়েছেন এস পোলার্ড (S. Pollard) এবং সি এইচ ফেনস্টাইন (C. H. Feinstein)।

পোলার্ড-এর হিসাবটি নীচে দেওয়া হল—

বছর	১৭৭০	১৭৯০-১৭৯৩	১৮১৫	১৮৩০-১৮৩৫
মূলধন সৃষ্টি	৬.৫%	৯%	৮%	১১%

সুতরাং পোলার্ড-এর মতে ডিন এবং কোল-এর হিসাবের তুলনায় মূলধন সৃষ্টি হয়েছিল বেশি হারে। তবে এই পরিসংখ্যান থেকেও বলা যাবে না যে, রস্টো-র হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূলধন সৃষ্টি স্বল্প সময়ে ব্যাপক হারে ঘটেছিল।

আরও অনেকগুলি বছর নিয়ে সমীক্ষা করেছেন ফেনস্টাইন ঃ

বছর	মূলধন সৃষ্টি (%)
১৭৬১-১৭৭০	৮
১৭৭১-১৭৮০	১০
১৭৮১-১৭৯০	১৩
১৭৯১-১৮০০	১৪

বছর	মূলধন সৃষ্টি (%)
১৮০১-১৮১০	১০
১৮১১-১৮২০	১৪
১৮২১-১৮৩০	১৪
১৮৩১-১৮৪০	১৩
১৮৪১-১৮৫০	১৩
১৮৫১-১৮৬০	১৩

ফেনস্টাইন-এর হিসাবে অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছনোর আগেই মূলধন সৃষ্টির হার অনেক উঁচু স্তরে উঠেছিল। তবে এগুলি মোট (gross) মূলধনের প্রবাহ ধরে হিসাব করা হয় এবং বিদেশী লগ্নিও এর অন্তর্গত। ১৭৮৩ থেকে ১৮০২—এই দু' দশকেই মূলত ব্রিটেনে মূলধনের প্রবাহ এসেছিল। লুইস রস্টো-র এই তত্ত্বকে পুরোপুরি না হলেও অবশ্য আংশিকভাবে সমর্থন করছে ফেনস্টাইন-এর পরিসংখ্যান।

২.৩.২ মূলধন প্রবাহে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদান

ফেনস্টাইনের দেওয়া পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই কৃষি, পরিবহণ এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের অবদান হিসাব করা হয়েছে। মোট স্থির বিনিয়োগে শতাংশের হিসাব এখানে দাখিল করেছেন ফেনস্টাইন।

বছর	কৃষি	পরিবহণ	শিল্প-বাণিজ্য
১৭৬১-১৭৯০	৩৩	২৩	২৩
১৭৯১-১৮২০	২৫	২০	২০
১৮২১-১৮৪০	১৩	২০	২০
১৮৪১-১৮৬০	১২	৩৫	৩৫

পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষির অবদান কমেছে। মোট বিনিয়োগে তার অংশ এক-তৃতীয়াংশ ১/৩ থেকে কমে হয়েছে এক-অষ্টমাংশ ১/৮। অন্যদিকে, শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রের অবদান এক-চতুর্থাংশের (১/৪) কম থেকে বেড়ে এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) ছাড়িয়ে যায়।

ক্র্যাফ্টস (Crafts)-এর সমীক্ষার ভিত্তিতেই এইসব হিসাব দাখিল করেছেন ফেনস্টাইন। তিনি জানিয়েছেন, এই সময়ে শ্রমিক উৎপাদনশীলতা যে হারে বেড়েছে, তার ২৫ শতাংশই মূলধনের প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে। এই সময়ে স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছিল উৎপাদন/মূলধনের অনুপাত। ফেনস্টাইন তাঁর

হিসাবে আরও দেখিয়েছেন যে, মূলধন/উৎপাদনের অনুপাত এই সময়ে কমেছিল। ১৭৬০ সালের ৭.৪ শতাংশ থেকে কমে তা ১৮৬০ সালে দাঁড়ায় ৪.৩।

এর পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ। ডিন-এর মতে, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মূলধন মজুত করার সুযোগ বেড়েছিল। তাই বারবার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কেনার খরচ কমে যায়। তাই খাল, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণে যথেষ্ট মূলধনী ব্যয় থাকলেও সামগ্রিকভাবে উৎপাদনে মূলধনের অনুপাত কমেছিল। দ্বিতীয়ত, এখানে উন্নত প্রযুক্তির অবদানও গণ্য করতে হবে। শিল্পবিপ্লবের আমলে আসা নতুন যন্ত্রপাতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করেছিল। তৃতীয়ত, শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে যন্ত্রপাতির দাম ছিল সস্তা। তাছাড়া ব্যয়সঙ্কোচের অনেক পথও তখন খোলা ছিল। যেমন, সুতোকল তৈরির জন্য অনেক সময়েই প্রচুর ব্যয় করে কারখানা ভবন নির্মাণের প্রয়োজন ছিল না। পরিত্যক্ত বাড়ি, খামার-এ সবই প্রাথমিক পর্যায়ে কারখানায় রূপান্তরিত করা হয়। তাই বিনিয়োগের পরিমাণ খুব বেশি বাড়েনি।

এইসব কারণই মূলধন/উৎপাদন অনুপাতকে কমিয়ে দিয়েছিল।

২.৩.৩ মূলধনের উৎস

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ঋণপত্র লেনদেনের জন্য লণ্ডনে গড়ে উঠেছিল সংগঠিত বাজার। সেগুলিতে মূলত সরকারি ঋণপত্র ও বড় বড় সংস্থার ঋণপত্র লেনদেন হত। বিশেষ করে পরিবহণ ক্ষেত্রে লগ্নির জন্য মূলধনী বাজারের এই উন্নয়ন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সড়ক নির্মাণের জন্য গঠিত টার্নপাইক ট্রাস্ট এবং খাল তৈরির সংস্থাগুলি স্থানীয় ভিত্তিতে অর্থসংগ্রহ করত। তাই স্থানীয় বা আঞ্চলিক মূলধনী বাজারগুলি এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে। শুধু তাই নয় রেল সংযোগ গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত কৃষিতে লগ্নির ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক মূলধনী বাজারগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই সময়েই বন্ধকী বাজার গড়ে ওঠে। সেখান থেকেই জমির মালিকরা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ঋণ নিতেন। ফলে জমি বিক্রি করতে আর তাঁরা বাধ্য হতেন না। এই ভাবেই গ্রামীণ বা আঞ্চলিক সঞ্চয় কৃষিতে লগ্নির পথ প্রশস্ত করেছিল।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূলধনী বাজার তেমন সংগঠিত ছিল না। বিভিন্ন আঞ্চলিক বাজারের মধ্যে তাই অর্থের লেনদেন ছিল সীমিত। তবে শিল্পবিপ্লবের জন্য তহবিল যোগানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল ওই বিচ্ছিন্ন বাজারগুলিও।

শিল্পের বিকাশে অবশ্য নিজস্ব সঞ্চয় থেকেই অর্থের যোগান দিয়েছিলেন উদ্যোগীরা। মুনাফা নিয়মিত পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে তাঁরা বিনিয়োগের অঙ্ক বাড়িয়েছিলেন। সুতোকল বা অন্য শিল্পের উপর গবেষণায় এই তথ্যই ধরা পড়েছে।

তবে প্রয়োজন যতই বাড়তে লাগল, মূলধন বিনিয়োগের অঙ্কও বাড়তে শুরু করল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা ব্যাঙ্কের ভূমিকা খতিয়ে দেখব।

২.৩.৪ শিল্প বিকাশে ব্যাঙ্কের ভূমিকা

ব্রিটেনের ব্যাঙ্কগুলি মূলত শিল্পে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়েছিল। কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে অবশ্য তারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণও দেয়।

শিল্পবিপ্লবই স্থায়ী মূলধন এবং কার্যকরী মূলধনের আপেক্ষিক গুরুত্ব বদলে দিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে স্থায়ী মূলধনের গুরুত্ব তুলনায় বেশি বাড়তে লাগল। শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক পর্বেও এই ধরনের মূলধনের গুরুত্ব বেড়েছিল। তবে তখনও কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনই ছিল প্রধান। সুতরাং সম্প্রসারণে আগ্রহী সংস্থা মাত্রেই স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হত।

প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য ঋণ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ গড়ত। এই বাণিজ্য ঋণ প্রদানের অর্থ যোগাতে ব্যাঙ্কগুলি সদাই প্রস্তুত ছিল। এই তহবিল মূলত ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকেই এসেছিল। এই দিক থেকে মূলধন সরবরাহে বড় ভূমিকা পালন করেছিল ব্রিটেনের ব্যাঙ্কগুলি।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, মূলধনের প্রবাহ না এলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোও সম্ভব হত না। কারণ, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এসেছিল নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে। মূলধন ছাড়া সেগুলি ক্রয় করা যেত না, যন্ত্র উৎপাদন, শিল্পের বিকাশও ঘটত না। তাই মূলধনকে শিল্প বিকাশের একটি আবশ্যক উপাদান হিসাবেই গণ্য করতে হবে।

২.৪ সারাংশ

আর্থিক বিপ্লবের পরিণতিতেই (১৬৮৮-১৭৫০) ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড (১৬৯৪), গড়ে ওঠে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। এর জেরেই বাড়ে মূলধনের প্রবাহ। অধ্যাপক রস্টো দেখিয়েছিলেন, ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ সালের মধ্যেই ব্রিটেনে মূলধনের প্রবাহ বেড়েছিল সবচেয়ে বেশি হারে। এটিকেই তিনি 'টেক অফ' পর্ব বলে অভিহিত করেন। সরকারের ঋণ গ্রহণের পথ করে দিয়েছিল আর্থিক বিপ্লব, শিল্পেও যোগান দিয়েছিল মূলধন। আর্থিক বিপ্লব এবং ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের কর্মকাণ্ড ব্রিটেনে মূলধনী বাজারের বিকাশ সম্ভবপর করে তোলে। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড এবং অন্য ব্যাঙ্কগুলি কাগজের নোট ইস্যু করতেও শুরু করে। ঋণপত্রের ইস্যুও শুরু হয়, বিভিন্ন বাণিজ্য কোম্পানি, বিমা সংস্থা যেগুলিতে নিরাপদে বিনিয়োগ করতে পারতেন। ১৮২১ সাল থেকে সরকারিভাবে Gold Standard-এ আসে ব্রিটেন। ১৮২৫ সালে আর্থিক সঙ্কটের জেরে আনা হয় ব্যাঙ্ক আইন, ১৮২৬; এতে লণ্ডন ও সংলগ্ন অঞ্চলে একচেটিয়া আধিপত্য পায় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড, ১৮৩৩ সালের আইনে বৈধতা পায় এই ব্যাঙ্কের নোট। ১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্ক চার্টার আইনে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত মূল্যের নোট ইস্যুর জন্য ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড স্বর্ণ মজুত রাখার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল।

১৭৮৩ থেকে ১৮০২-এর মধ্যেই যে ব্রিটেনে মূলত মূলধনের প্রবাহ এসেছিল, পরিসংখ্যান দিয়ে তা দেখিয়েছেন ফেনস্টাইন। এটাই যন্ত্রপাতি কিনে শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সম্ভব করে।

২.৫ অনুশীলনী

১। ব্রিটেনে আর্থিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের কর্মকাণ্ড সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

২। ব্রিটেনে Gold Standard-এর প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয়েছিল?

৩। সংক্ষিপ্ত বিবৃতি লিখুন : Gold Standard, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক আইন।

৪। ব্রিটেনে মূলধনের প্রবাহ সম্পর্কে লুইস ও রস্টো-র মতামত কী ছিল? পরিসংখ্যানের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করুন।

৫। মূলধনের প্রবাহে কৃষির অবদান কীভাবে পরিবর্তিত হয়? মূলধন/উৎপাদন অনুপাত শিল্পবিপ্লবের আমলে কেন কমেছিল?

৬। সংক্ষিপ্ত বিবৃতি লিখুন : শিল্পবিপ্লবে মূলধনের উৎস, শিল্প বিকাশে ব্যাঙ্কের ভূমিকা।

১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। P. Deane, The First Industrial Revolution, Cambridge University Press, First Indian Edition. 1994.

২। P. Deane and W. A. Cole, British Economic Growth 1688-1959 (1962).

৩। হরশঙ্কর ভট্টাচার্য, ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব ও তারপর, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

একক ৩ ❐ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদার অর্থনৈতিক নীতি

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ ব্রিটেনে বাণিজ্য বিপ্লব

- ৩.২.১ বাণিজ্যের নীতি কাঠামো
- ৩.২.২ বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান
- ৩.২.৩ শিল্পবিপ্লবে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবদান

৩.৩. ব্রিটেনের উন্নয়নে উদার অর্থনৈতিক নীতি ও সরকারের ভূমিকা

- ৩.৩.১ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌দের চিন্তাধারা

৩.৪ ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদার অর্থনৈতিক নীতির বিবর্তন

- ৩.৪.১ নৌ-আইন
- ৩.৪.২ পুরনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা
- ৩.৪.৩ সাধারণ শুল্ক ব্যবস্থা
- ৩.৪.৪ শস্য আইন বিলোপ
- ৩.৪.৫ অন্যান্য আইন বিলোপ

৩.৫ উদারনীতি বনাম লেজে ফেয়ার

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে—

- অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদার বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নীতির দিকে কীভাবে ধাপে ধাপে এগিয়েছিল ব্রিটেন।
- এক সময় বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে সুরক্ষিত রাখতে যে সব আইনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত, পরে ইংরেজ শিল্পপতি, কৃষকরা বুঝতে পেরেছিলেন, সেগুলি পরিত্যাগ করা প্রয়োজন।

- সরকারের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। তবে বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির যেহেতু এখানে বড় গুরুত্ব রয়েছে, তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই ক্ষেত্রটির অবদান (অর্থাৎ তথাকথিত বাণিজ্য বিপ্লব) নিয়ে আমরা প্রথমেই আলোচনা সেরে নেব।

৩.১ প্রস্তাবনা

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে দেশের কৃষি ও শিল্পকে সুরক্ষিত রাখার একটি প্রচেষ্টা প্রাক্ শিল্পায়ন পর্বের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। উদ্ভাবন এবং সফল শিল্পায়ন ওই সব বিধিনিষেধ তুলে স্থিতাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার মানসিকতা তৈরি করে। তুলনায় কম নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা দেয়। কারণ নিয়ন্ত্রণ উঠে গেলে বিশ্বের বাজারে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সুযোগ সামনে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই ইংরেজ শিল্পোদ্যোগীরা এই উপলব্ধিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এরই জেরে ১৭৮৬ সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্যের কিছু কিছু শুল্ক কমানো হয়। রাজনীতিক এবং সরকারি আমলারাও অ্যাডাম স্মিথ-এর অবাধ বাণিজ্যের তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর 'লেজে ফেয়ার' (Laissez-faire) বা 'Leave-alone'-এর তত্ত্বই সচেতনভাবে রূপায়িত হয়েছিল কি না, তা নিয়ে কিছু বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তবে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith), জেরেমি বেন্থাম (J. Bentham), ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo), জেমস মিল (James Mill), এন সিনিয়র (N. Senior), জে এস মিলের (J. S. Mill) মতো ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্দের চিন্তাধারা এই সময়েই বিকশিত হয়েছিল। নির্দিষ্ট প্রশ্নে নানা মুনির নানা মত থাকলেও এটা বলা যেতে পারে যে, সাধারণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করার পক্ষে তাঁরা মত দিয়েছিলেন।

৩.২ ব্রিটেনে বাণিজ্য বিপ্লব

যে সরকারি নীতি কাঠামোর মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পাদিত হত, তা দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করব। এর দুটি ভাগ রয়েছে—নীতি কাঠামো তৈরিতে বাণিজ্য প্রসারের অবদান এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্য বৃদ্ধির অবদান।

৩.২.১ বাণিজ্যের নীতি কাঠামো

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ যে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থা ব্রিটেনে বহাল ছিল, তাকে বণিকী পুঁজিবাদ বা 'Mercantilism' বলা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা চালু ছিল প্রায় দেড়শো বছর।

বণিকী পুঁজিবাদের মূল তত্ত্ব হল বাণিজ্যের ভারসাম্য। এই ভারসাম্য অনুকূলে রেখে রাষ্ট্রের সম্পদ বাড়ানোই ছিল এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের মূল লক্ষ্য। সম্পদ বলতে সোনা-রূপোর মতো মূল্যবান ধাতুর উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, রপ্তানি বাড়ানোর উপরই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, বাণিজ্য

ভারসাম্য অনুকূলে রাখার এটাই একমাত্র পথ। বিশ্বের যে সব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য হচ্ছে, সার্বিকভাবে তাদের সকলের সঙ্গে উদ্বৃত্ত রপ্তানি বজায় রাখাই ছিল এই ব্যবস্থার লক্ষ্য। স্বাভাবিকভাবেই এর জন্য আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মূলত শিল্প পণ্য আমদানির উপরই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কারণ সেগুলি দেশজ শিল্প পণ্যের প্রতিযোগী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। পাশাপাশি এইসব পণ্য তৈরির কাঁচামাল রপ্তানিও নিষিদ্ধ ছিল। অন্যদিকে, শিল্প পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ দেওয়া হত।

সম্পদ সংগ্রহের জন্য অনেক সময়েই আগ্রাসী বাণিজ্য নীতি, এমনকী লুঠতরাজকেও সমর্থন করা হত।

বাণিজ্যের প্রসারের জন্য প্রথম সরকারি আইন হল ১৬৫১ সালের নৌ আইন বা 'Navigation Act'। সপ্তদশ শীর্ষ স্থানটি দখল করে হল্যাণ্ড। রাজধানী আমস্টারডামে (Amsterdam) তখন থেকেই আর্থিক লেনদেনের পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল। হল্যাণ্ডের একাধিপত্য খর্ব করাই ছিল এই আইনের লক্ষ্য। আইনটির প্রথম শর্তই ছিল : ব্রিটেনে ইউরোপীয় পণ্য আমদানি করা হবে সেই দেশ থেকে, যেখানে সেটি তৈরি হয়েছে। কিংবা, প্রথমবার রপ্তানি করা হয়েছে যে দেশে, সেখান থেকেও সেটি আমদানি করা চলতে পারে। কিন্তু হল্যাণ্ডের মাধ্যমে আমদানি করা হবে না। দ্বিতীয় শর্ত হল: ব্রিটিশ জাহাজে কিংবা যে দেশে পণ্যটি তৈরি (বা যে দেশ থেকে রপ্তানি) হয়েছে, সেখানকার জাহাজে করে ব্রিটেন পণ্য আমদানি করবে। তৃতীয়ত, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে ব্রিটিশ জাহাজ। চতুর্থত, কয়েক ধরনের মাছ শুধু ব্রিটিশ জাহাজেই আমদানি করা যাবে।

এই নৌ আইন ১৬৬০ সালে সংশোধিত হয়। প্রথম নৌ আইনটিতে এটা নির্ণয় করার উপায় ছিল না যে, জাহাজটি ব্রিটেনেরই মালিকানাধীন। ১৬৬০ সালে স্থির করা হয়, যে-সব জাহাজ অন্য দেশে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু ব্রিটিশ বণিকদের মালিকানাধীন ছিল, সেগুলি নথিভুক্ত করতে হবে। একটি জাহাজকে ব্রিটিশ বলে গণ্য করতে হলে তার চালক এবং যাত্রীদের ব্রিটিশ হতে হত। তবে হল্যাণ্ডের জাহাজে ব্রিটেনে ইউরোপীয় পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করার ধারাটি নতুন আইনে সংশোধন করা হয়। বলা হল, শুধু কাঠ, ফলের মতো নির্দিষ্ট পণ্যের জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। তবে বলা বাহুল্য, ইউরোপ থেকে ব্রিটেনের পণ্য আমদানির অর্ধেকই ছিল এই সব সামগ্রী। উপনিবেশগুলি থেকে আমদানির জন্যও একই নিয়ম চালু হয়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা হয় ১৬৬০ সালে। সেটি হল : কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্য উপনিবেশগুলি অন্য কোনও রাষ্ট্রে রপ্তানি করতে পারবে না। সর্বপ্রথম সেগুলি রপ্তানি করতে হবে ব্রিটেনে, তারপর সেখান থেকে পুনরায় রপ্তানি করা যেতে পারে ভিন্ন রাষ্ট্রে।

একইভাবে ১৬৬৩ সালে পাশ হয় প্রাধান্য আইন বা 'Staple Act'। এই আইনে কিছু ইউরোপীয় পণ্য শুধু ব্রিটেনের মাধ্যমেই আমদানি করতে হত। উপনিবেশগুলিকে ওই সব পণ্য শুধু ব্রিটেনের মাধ্যমেই কিনতে হত। সরাসরি ইউরোপ থেকে তারা কিনতে পারত না।

সপ্তদশ শতকের শেষ থেকেই ব্রিটেনে বাড়তে থাকে আমদানি শুল্ক। তবে উপনিবেশ থেকে কিছু পণ্য আমদানিতে শুল্ক কম রাখা হত। চিনি ইত্যাদি আমদানি করে ব্রিটেনের প্লান্টেশন (Plantation) শিল্পে লগ্নি বাড়াতে উৎসাহ দিতেই এই সুবিধা চালু করা হয়। এছাড়া, উপনিবেশগুলিতে বিশেষ বিশেষ শিল্প পণ্য উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

সাধারণভাবে এই নীতিকাঠামোর মধ্যেই ব্রিটেনে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পন্ন হত।

৩.২.২ বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান

পরিসংখ্যানের কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ডিন এবং কোল দেখিয়েছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটেছিল দুটি পর্যায়ে। এটা অবশ্য চিরাচরিত ধারণার ঠিক বিপরীত। চিরাচরিত ধারণাটি হল, গোড়ার দিকে বাণিজ্য বেড়েছিল ঢিমে তালে, পরে শতাব্দীর শেষ দুটি দশকে তা আচমকাই বেড়ে গিয়েছিল।

ডিন এবং কোলের মতে বাণিজ্য বৃদ্ধির পথটি আদৌ এত মসৃণ ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহের কারণে বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছিল বলেই তাঁরা বৃদ্ধির দুটি পর্যায় চিহ্নিত করেছেন। ১৭০০ থেকে ১৭৪৫ সালের মধ্যে রপ্তানি (বিলাসদ্রব্য সমেত) বেড়েছিল বছরে ০.৫ শতাংশ হারে। ১৭৪৫ থেকে ১৭৬০ সালের মধ্যে তা ছিল বছরে ৩.৯ শতাংশ। যুদ্ধ চলার কারণে ১৭৬০-এর দশকের শেষ ভাগ থেকে ৭০-এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কমে যায়। মন্দার কারণে বাণিজ্য বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়ায় বছরে ২.৮ শতাংশ।

এরপর ১৭৭৯ থেকে ১৮০২-এর মধ্যে আবার তা বেড়ে পৌঁছয় ৪.৯ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকগুলিতেই বৃদ্ধির হার ছিল অনেক বেশি।

বাণিজ্যের ধরন এবং কোন কোন দেশের সঙ্গে তা বেড়েছিল বা কমেছিল, সে প্রসঙ্গে এবার আসছি। কোনও দেশ তার রপ্তানি পণ্য ব্রিটেনে পাঠানোর পর সেখান থেকে তা প্রায়শই পুনরায় রপ্তানি করা হত। বস্তুত অষ্টাদশ শতক জুড়ে এ ধরনের রপ্তানিই বেড়েছিল সবচেয়ে দ্রুত হারে।

অন্যদিকে ১৭০০/১৭০১-এর সঙ্গে ১৭৯৭/১৭৯৮ সালের তুলনা করলে দেখা যাবে, বাণিজ্যে ইউরোপের গুরুত্ব কমেছিল। রপ্তানি পণ্য পাঠানো এবং আমদানি (যা পুনরায় রপ্তানি না করে ব্রিটেনেই ব্যবহৃত হত) দুটি ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে ইউরোপের গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। আলোচ্য সময়ে ইউরোপ থেকে আমদানির পরিমাণ মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ৬২ শতাংশ থেকে কমে হয় ২৯ শতাংশ।

পাশাপাশি, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ (West Indies) এবং ইস্ট ইণ্ডিজ (East Indies), আফ্রিকা (Africa) ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আমদানি বাড়তে শুরু করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্ষেত্রে আমদানি ১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় ২৫ শতাংশ। ইস্ট ইণ্ডিজ, আফ্রিকার ক্ষেত্রে ১৪ শতাংশ থেকে তা পৌঁছয় ২৬ শতাংশে। রপ্তানির ক্ষেত্রেও আলোচ্য সময়ে ইউরোপের অংশ ৮২ শতাংশ থেকে কমে হয় ২১ শতাংশ। উত্তর আমেরিকা (North America) (১৩টি উপনিবেশ) এবং কানাডার (Canada) অংশ ৬ শতাংশ থেকে

বেড়ে দাঁড়ায় ৩২ শতাংশ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে রপ্তানি ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় ২৫ শতাংশ। পুনরায় রপ্তানির ক্ষেত্রে অবশ্য ইউরোপের প্রাধান্য বজায় ছিল।

রপ্তানি পণ্যেও এসেছিল পরিবর্তন, অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়েই ব্রিটেন মূলত শিল্পজাত পণ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি করেছিল। তবে শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটেন ছিল অন্যতম শস্য রপ্তানিকারী দেশ। দ্বিতীয় ভাগে অবশ্য তাকে শস্য আমদানি করতে হয়। চিরাচরিতভাবে ব্রিটেন পশম বস্ত্র রপ্তানি করত। তা ছিল মোট রপ্তানি আয়ের ৭০ শতাংশ। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়েই তা কমতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সুতিবস্ত্র শিল্পই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং রপ্তানিতেও তার প্রাধান্য বাড়ে।

৩.২.৩ শিল্পবিপ্লবে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবদান

১। ব্রিটিশ শিল্পের জন্য বাজার বাড়ানো :

একটি বদ্ধ অর্থনীতির পক্ষে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা যথেষ্ট বাড়ানো সম্ভব হয় না। বিদেশে শিল্প পণ্যের চাহিদা বাড়লে বিশেষায়নও সম্ভব হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য শুধু যে বিদেশে বাজার বাড়াতে সাহায্য করে তা-ই নয় বাণিজ্যের ফলে রপ্তানিকারীদের হাতে যে অর্থ আসে, তা দেশের মধ্যে চাহিদা বাড়াতেও সাহায্য করে। ব্রিটেনের অর্থনীতিতে দ্রুত যে কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছিল, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে কৃষিক্ষেত্রের গুরুত্ব কমে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়া—তা বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়া কখনওই সম্ভব হত না।

২। কাঁচামালের যোগান :

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ করে দেয়, যার ফলে কাঁচামালের যোগান বাড়ে। কম দামে আমদানির ফলে শিল্প পণ্যের উৎপাদনের খরচও কম রাখা সম্ভব হয়েছিল। ওই সময়ে সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারণ ঘটে যে দুটি শিল্পের অর্থাৎ সুতিবস্ত্র ও লৌহ শিল্প কাঁচামালের জন্য আমদানির উপরই নির্ভরশীল ছিল। উপনিবেশগুলি থেকে কৃষি পণ্য ও কাঁচামাল কেনার ফলে সেখানকার ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৩। ব্রিটিশ পণ্যের বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি :

ব্রিটেনের আমদানির ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিও ব্রিটেনের শিল্প পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পেয়েছিল।

৪। লগ্নিযোগ্য তহবিল বৃদ্ধি :

রপ্তানি, আমদানি এবং পুনরায় রপ্তানি বাণিজ্য বাড়ার ফলে যে উদ্বৃত্ত আয় হাতে এসেছিল, তা ব্যবহৃত হয় শিল্পে লগ্নির জন্য।

৫। বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠা :

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার বেশ কিছু বাণিজ্যকেন্দ্র ও আর্থিক সংস্থা গড়ে ওঠার পথ সুগম করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রটি হল লণ্ডন। ব্যাঙ্ক, বিমা সংস্থা ইত্যাদি গড়ে ওঠে এই বাণিজ্যের হাত ধরেই। সেগুলিই সর্বত্র তহবিল যোগানোর বন্দোবস্ত করে।

৬। শহর ও আনুষঙ্গিক পরিকাঠামোর বিকাশ :

শহরায়ন শিল্পবিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শহরায়নের ফলেই কৃষি ও শিল্প পণ্যের আদান-প্রদান বাড়ে। লণ্ডন, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহ্যাম, গ্লাসগো-র মতো শহর গড়ে ওঠার ফলেই বাড়ে পরিবহণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। অন্যদিকে, শহরগুলির বিকাশও ছিল মূলত বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল।

৩.৩ ব্রিটেনের উন্নয়নে উদার অর্থনৈতিক নীতি ও সরকারের ভূমিকা

চিরাচরিত ধারণা হল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে Laissez-faire নীতি দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। এর সাধারণ অর্থ হল সর্বস্তরে সরকারি হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা যে সমস্ত সুপারিশ সরকারের কাছে এই সময়ে পেশ করেছিলেন, তার থেকেই এই নীতির সূত্রপাত।

তবে এ ব্যাপারে অধ্যাপক ই জে হব্‌স্‌বম (E. J. Hobsbawm) এবং অধ্যাপিকা ফিলিস ডিন (Phyllis Deane) ভিন্ন মত পোষণ করেন। হব্‌স্‌বম-এর মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই মোটামুটিভাবে ব্রিটেন লেজে ফেয়ার নীতি গ্রহণ করে ফেলেছিল। অন্যদিকে ডিন বলেছেন, এই নীতি ১৮২০-র দশক থেকেই সাফল্য পায়নি। বরং নিয়ন্ত্রণের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেছিল সরকার। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হলে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌দের চিন্তাধারা আমাদের সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করতে হবে।

৩.৩.১ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌দের চিন্তাধারা

অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, ডেভিড রিকার্ডো, জেম্‌স রিকার্ডো, জেমস্ মিল, এন সিনিয়র, জে এস মিল—এই শীর্ষস্থানীয় ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা কিন্তু লেজে ফেয়ার শব্দটি সকলে ব্যবহার করেননি। তবে ওই বিশেষ শব্দগুচ্ছটি কেউ ব্যবহার করলেন কি না, সেটা বড় কথা নয়। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব, সরকারি হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনার দিকে তাঁরা কতটা উৎসাহী ছিলেন। বিভিন্ন আইন, যেমন সুদ গ্রহণ আইন (Usury Law), শস্য আইন (Corn Law), দারিদ্র্য আইন (Poor Law) ইত্যাদি নিয়ে এইসব চিন্তাবিদ্‌রা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের সবাইকেই ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌দের শিবিরে রাখা হয়। দেখা গিয়েছে, বিরোধ সত্ত্বেও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনার দিকে তাঁদের একটি প্রবণতা ছিল।

অ্যাডাম স্মিথ সাধারণভাবে ছিলেন সরকারি হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনার পক্ষে। এই সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, অ্যাডাম স্মিথ-ই সেগুলিকে 'মার্কেন্টাইলিজম' (বণিকী পুঁজিবাদ) আখ্যা দিয়েছিলেন। এই আইনে নিষেধাজ্ঞা ছিল শিল্পজাত পণ্য আমদানির উপর, উৎসাহ দেওয়া হত শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিকে। তবে ওই সব পণ্য যদি কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হত, তাহলে সেগুলি রপ্তানি করতে দেওয়া হত না। এছাড়া বাণিজ্য কোম্পানিগুলিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হত, যা তাদের একচেটিয়া আধিপত্য দিয়েছিল। অ্যাডাম স্মিথ এইসব নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে বলেছিলেন,

কিছু বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্যই এগুলি আরোপ করা হয়েছে। সাধারণভাবে এগুলি কল্যাণকর নয়। স্মিথ ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ওয়েল্‌থ অব নেশন্‌স' (Wealth of Nations)-এ একটি অদৃশ্য হাত (Invisible Hand)-এর কথা বলেছেন, যা অর্থনীতিতে সামঞ্জস্য আনে। তিনি আসলে একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন, যা ক্ষুদ্র ব্যক্তি-স্বার্থের উপরে উঠতে রাষ্ট্রকে সাহায্য করবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় সরকারি হস্তক্ষেপকে স্মিথ অধিকার ভঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তবে প্রতিরক্ষার কারণে নৌ আইনকে তিনি কিছুটা সমর্থন করেন। অবশ্য তিনি বলেছিলেন, এই আইন সমৃদ্ধির পথ সুগম করবে না। আবার, জনস্বার্থে সরকারকে কিছু বন্দোবস্ত করে দিতে ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় বলে স্মিথ মত পোষণ করেন।

এবার ডেভিড রিকার্ডো-র প্রসঙ্গে আসা যাক। তিনি ছিলেন লেজে ফেয়ার-এর কট্টর সমর্থক। শস্য আইন এবং দারিদ্র্য আইনের তিনি বিরোধিতা করেন।

ম্যালথাস তাঁর জনসংখ্যার তত্ত্বের ভিত্তিতেই দারিদ্র্য আইনের বিরোধিতা করেন। তবে শস্য আইন সমর্থন করে তিনি কিছুটা যুগের বিরোধিতা করেন। মোটামুটিভাবে তিনিও ছিলেন লেজে ফেয়ার-এর সমর্থক।

সিনিয়র (Senior), ম্যাককুলখের (McCulloch) মতো ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা অবশ্য এই মতবাদ পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেননি। আসলে শস্য আইন, দারিদ্র্য আইন, কারখানা আইন, শিক্ষা, নিকাশি ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন নিয়ে তাঁরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। সেই কারণেই তাঁরা পুরোপুরি সরকারি হস্তক্ষেপের বিপক্ষে মত দিতে পারেননি। সিনিয়র একসময়ে বলেছিলেন, যদি সর্বসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হয়, তাহলে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে। শহরাঞ্চলে নিকাশি ব্যবস্থা গড়ার ব্যাপারে তিনি সরকারের ভূমিকা সমর্থন করেন। দারিদ্র্য আইনেরও তিনি বিরোধিতা করেন। দারিদ্র্য এবং শস্য আইন, দুটিরই বিরোধিতা করেন ম্যাককুলখ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা সরকারি হস্তক্ষেপ সুপারিশ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হস্তক্ষেপ সরানোর প্রতি একটি পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালে অ্যাডাম স্মিথের পরামর্শ নিয়েছিলেন মন্ত্রীরা। বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি পর্ষদও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যাঙ্ক এবং মুদ্রা ব্যবস্থায় ডেভিড রিকার্ডোর অবদানও অনস্বীকার্য। ১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্ক চার্টার আইনের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। বহু সরকারি কমিশন এবং উপদেষ্টা কমিটিতেই ছিলেন ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা। তাই সরকারি নীতিকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাঁরা প্রভাবিত করেন। জেরেমি বেন্থাম ছিলেন একজন উপযোগিতাবাদী (Utilitarian)। তাঁদের ধারণা, যাতে বেশি সংখ্যক মানুষের জন্য যত বেশি কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব হয়, সেই ব্যবস্থাই সমর্থনযোগ্য। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং লেজে ফেয়ার ব্যবস্থারও তিনি সমর্থক ছিলেন বলে শোনা যায়। তবে, কালক্রমে তাঁর মত কিছুটা পরিবর্তিত হয় বলে ঐতিহাসিকরা জানিয়েছেন। তাঁর মধ্যে কিছুটা সংহতিবাদ (Collectivism)-এর প্রভাবও পড়েছিল, অর্থাৎ তাঁরা চাইতেন উৎপাদনের যন্ত্র ও সেগুলি বর্ণনের নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণের হাতেই থাক।

জন স্টুয়ার্ট মিল-ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না থাকার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে যে সব ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন, তার একটি তালিকাও তিনি দিয়েছেন। যেমন, শিক্ষা ব্যবস্থা, কারখানায় কাজের শর্ত স্থির করা, জয়েন্ট স্টক সংস্থার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। যাইহোক, লেজে ফেয়ার প্রথাই যে সাধারণভাবে মেনে চলা উচিত, এই ধারণা থেকে তিনি সরে আসেননি।

৩.৪ ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদার অর্থনৈতিক নীতির বিবর্তন

বণিকী পুঁজিবাদের আমলে একের পর এক নিয়ন্ত্রণের প্রাচীর তৈরি করেছিল ব্রিটিশ সরকার। বিশেষ করে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় শস্য বাণিজ্যের উপর। এর ফলেই শুরু হয় শস্য আইন (Corn Law) বাতিল করার প্রয়াস।

প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিল্পোৎপাদনে সারা বিশ্বে শীর্ষ স্থানটি দখল করে ফেলেছিল ব্রিটেন। সেই কারণেই বাণিজ্য বিধিনিষেধ তোলার প্রতি তৎপরতা দেখা দেয়, শুরু হয় শুল্ক কমানো। ১৭৮০-র দশকে ফ্রান্সের সঙ্গে এক চুক্তিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে শুল্ক কমানো হয়। অবাধ বাণিজ্যের জন্য আন্দোলন আরও আগেই শুরু হয়। কিন্তু নেপোলিয়নের যুদ্ধের কারণে তাতে ভাটা পড়ে। কারণ, সে সময়ে যুদ্ধের খরচ মেটাতে রাজস্বের প্রয়োজন বেড়ে যায়। তাই ১৮২০ নাগাদ শুল্ক বাড়তেই থাকে।

এর পর থেকেই, অর্থাৎ ১৮২০-র দশক (নেপোলিয়ন পরাজিত হন ১৮১৫ সালে ওয়াটারলু-তে) থেকেই ধাপে ধাপে অবাধ বাণিজ্যের দিকে এগোতে থাকে ব্রিটেন। ১৮৫০ সালের মধ্যে তা প্রায় সম্পূর্ণ হয়।

এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে যুগের কয়েকজন প্রথম সারির রাজনীতিকের নাম। প্রথমেই নাম করা যায় হাসকিসন (Huskisson)-এর। তিনি ছিলেন একসময় বাণিজ্য পরিষদের প্রেসিডেন্ট। এর পর আসেন পিল (Peel)। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, কোষাগারের দায়িত্বেও ছিলেন। এর পরই নাম করতে হয় গ্ল্যাডস্টোন (Gladstone)-এর। হাসকিসনের কর্মকাণ্ড শেষ হয় ১৮২৫ সালে। পিলের ১৮৪৬-এ এবং গ্ল্যাডস্টোনের ১৮৬০ সালের মধ্যে।

যেসব ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ উঠেছিল, সেগুলি এবার পরপর আলোচনা করব।

৩.৪.১ নৌ আইন

এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্য ১৮২৫ সাল থেকেই শুধু ব্রিটিশ জাহাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। কিংবা এইসব অঞ্চলে স্বাধীন দেশের জাহাজ ব্যবহার করা যেত। ইউরোপীয় জাহাজকে তখনও বাণিজ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি।

উপনিবেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যে ব্রিটেনের জাহাজ কিংবা সেখানকার জাহাজ ব্যবহৃত হত। এ ছাড়া, অন্য দেশগুলি ব্রিটিশ উপনিবেশে তাদের পণ্য নিজেদের জাহাজে করে পাঠাতে পারত। তবে কয়েকটি মাত্র স্থান দিয়েই এই আমদানি করতে পারত উপনিবেশগুলি। শর্ত ছিল উপনিবেশগুলি তাদের পণ্য আগাম পাঠিয়ে দেবে ব্রিটেনকে। এইসব নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল ১৮২৫ সাল পর্যন্ত। তবে ধীরে ধীরে এই সব নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয়।

১৮৪৯ সালে উঠে যায় ব্রিটিশ জাহাজে বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন। পাশাপাশি উপনিবেশে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধও তুলে নেওয়া হয়। ব্রিটেনের উপকূল বাণিজ্যও বিদেশী জাহাজের জন্য খুলে দেওয়া হয় ১৮৫৩ সালে। নৌ আইনে বিদেশী জাহাজের উপর শুল্ক ধার্য না-করা হলেও তাদের জন্য ছিল আলাদা কর ব্যবস্থা। সবই ছিল জাহাজি বাণিজ্যে ব্রিটেনের প্রাধান্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। পরপর চুক্তির মাধ্যমে এই সব বাড়তি শুল্ক প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। চুক্তি প্রথমে হয় আমেরিকার সঙ্গে, পরে হল্যাণ্ড ছাড়া তা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত হয়। আসলে ব্রিটিশ সরকার এই সব চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের রপ্তানি পণ্যেও শুল্ক কমিয়ে নিত এবং বাণিজ্য বাড়ানোর পথ প্রশস্ত করত। পরিণামে লাভবান হত ব্রিটেনই।

৩.৪.২ পুরনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা

প্রথমেই বলতে হয় ১৬৬৩ সালের 'প্রাধান্য আইন' (Staple Act)-এর কথা। এর ফলে উপনিবেশগুলিকে শুধুমাত্র ব্রিটেন থেকেই শিল্প সামগ্রী কেনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। হাসকিসন এই প্রথা বাতিল করেন। তা সত্ত্বেও ব্রিটেনের কিছুটা প্রাধান্য বজায় রাখা হয়। উপনিবেশগুলি যাতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্রিটেনকেই প্রাধান্য দেয়, তার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভিন্ন হারে শুল্ক বসিয়েছিল। উপনিবেশগুলির ব্রিটেন ছাড়া অন্য দেশ থেকে আমদানির জন্য শুল্কের হার ছিল চড়া। তবে ওই খাতে প্রাপ্ত রাজস্ব উপনিবেশগুলিই পেত। হাসকিসন এই ব্যবস্থা বজায় রাখলেও ১৮৪২ সালের আইনে তা বাতিল করা হয়। ১৮৪৬ সালে বাদবাকি পার্থক্যগুলিও রদ করা হয়।

ব্রিটেনের পক্ষ থেকেও উপনিবেশগুলির কিছু কিছু পণ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হত। যেমন, চিনি, কাঠ এবং শস্য, স্পিরিট ও মদ। নেপোলিয়নের যুদ্ধের আমলে বল্টিক অঞ্চল থেকে কাঠ আমদানির উপর চড়া শুল্ক বসানো হয়েছিল। অন্যদিকে কানাডার কাঠে শুল্ক কম রাখা হয়েছিল। ধীরে ধীরে এগুলি তুলে নেওয়া হয়। রাজস্বের প্রশ্ন জড়িত ছিল বলে প্রথম কানাডার কাঠে শুল্ক বাড়ানো হয় এবং বল্টিক অঞ্চলের কাঠে তা কমানো হয়। জাহাজ তৈরির জন্য সেরা মানের কাঠ বল্টিক অঞ্চল থেকেই আসত।

এবার শস্য আইনে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গে আসছি। ১৮১৪ এবং তার পূর্ববর্তী শস্য আইনগুলিতেও উপনিবেশ থেকে শস্য আমদানির উপর প্রাধান্য দেওয়া হত। চিনির ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রাধান্য পেত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উপনিবেশগুলি। পরবর্তীকালে অবশ্য ভারত এবং মরিশাস থেকে চিনি আমদানি শুরু হয়। তখন ওই সব অঞ্চলও শুল্কের সুবিধা পেতে শুরু করে। তবে দেখা গেছে বাণিজ্য পর্ষদের সভাপতি হিসাবে

হাসকিসন পুরনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার কিছু কিছু বিধিনিষেধ তুললেও বৈষম্যমূলক শুল্ক ব্যবস্থা সচেতন ভাবেই বজায় রাখা হয়েছিল। উপনিবেশ এবং শাসক দেশের মধ্যে এই শুল্ক কম রাখার ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন।

৩.৪.৩ সাধারণ শুল্ক ব্যবস্থা

শিল্পজাত পণ্যের উপর বৈষম্যমূলক আমদানি শুল্কই সর্বপ্রথম প্রত্যাহার করে নেন হাসকিসন। কারণ সেগুলি তখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। পরিবর্তে শিল্পজাত পণ্যে আমদানি শুল্কের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৩০ শতাংশে। তবে সব পণ্যে এই নিয়ম প্রযোজ্য হত না। যেমন, সুতিবস্ত্রে তা ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। পাশাপাশি সুতিবস্ত্র ও কিছু ধাতুজ সামগ্রী তৈরির কাঁচামালে আমদানি শুল্ক কম রাখা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এগুলির উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া।

রপ্তানির উপর অনেক বিধিনিষেধও তুলে নেন হাসকিসন। ১৮১৪ সালে শস্য আইনের আওতায় অবাধ শস্য রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়। পশম রপ্তানি নিষিদ্ধ করার নিয়মও বাতিল হয়। হস্তশিল্পীদের দেশান্তর গমনের উপর নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি রপ্তানির উপর দীর্ঘদিন ধরে যে নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল, ধীরে ধীরে আইন পাশ করে তা-ও তোলা হয়। বাণিজ্য পর্ষদের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে তা রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়।

হাসকিসনের পর এই উদার নীতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান পিল। ১৮৪৬ সালে শিল্পজাত পণ্যের আমদানি শুল্কের ঊর্ধ্বসীমা কমিয়ে আনা হয় ১০ শতাংশে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল রেশমজাত পণ্য। কাঠ এবং সাবান ইত্যাদি তৈরির চর্বি ছাড়া সব কাঁচামাল আমদানি অবাধ করা হয়। চিনি, মাখনে শুল্ক কমানো হয় এবং পশু আমদানির উপর থেকে তা তুলে নেওয়া হয়।

হাসকিসন এবং পিলের অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন গ্ল্যাডস্টোন। ফল এবং যাবতীয় ডেয়ারিজাত পণ্যে আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয় ১৮৫৩ সালে এবং প্রত্যাহার করা হয় ১৮৬০ সালে। সব শিল্পজাত পণ্যে আমদানি শুল্ক তুলে নেওয়া হয় ওই বছরই। শিল্পজাত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রথমে বিদেশী পণ্যের শুল্ক উপনিবেশ থেকে আসা পণ্যের শুল্কের স্তরে কমিয়ে আনা হত। রাজস্বের দিকটি মাথায় রেখে তা কিছুদিন সর্বনিম্ন স্তরে রাখা হত, শেষ পর্যন্ত একেবারেই বাতিল করা হত। কাঠের উপর শুল্ক প্রত্যাহার করা হয় ১৮৬৬ সালে, চিনিতে ১৮৭৪ সালে।

বলা যেতে পারে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমদানি-রপ্তানিতে বিধিনিষেধ ও শুল্ক প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ১৮৬০ সালের মধ্যে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন তার নিজের রপ্তানি পণ্যে শুল্ক কমিয়ে নিয়েছে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় আমূল বদলে গেল চিত্রটি। আসলে ব্রিটেনের উৎপাদকদের পক্ষে শুল্ক ইত্যাদি আরোপ করে সুরক্ষার বন্দোবস্ত করার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ ততদিনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে শিল্পবিপ্লব। বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ার মতো দক্ষতা অর্জন করেছে ব্রিটিশ পণ্য। তাই আমদানি শুল্কের স্থান ধীরে ধীরে গ্রহণ করে আয়কর, দূর হয় শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে রাজস্ব ঘাটতির সমস্যা।

৩.৪.৪ শস্য আইন বিলোপ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটাই ছিল সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়। কৃষিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য শস্য আইন তৈরি হয় অনেক আগেই। অভ্যন্তরীণ শস্য মূল্যের নিরিখেই স্থির হত চড়া, কম বা ন্যূনতম আমদানি শুল্ক। দাম কম হলে শুল্কের হারও চড়া হত।

১৮১৫ সালে এই পুরনো শস্য আইনে রদবদল ঘটানো হয়। একটি নির্দিষ্ট মূল্যের নীচে শস্য আমদানি এই বছরই পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। ওই দামের উপরে বিনা শুল্কে আমদানি করা যেত। এখানে গমের উদাহরণ দিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল :

১৮১৫ সালে প্রতি ত্রৈমাসিক দর

বিদেশি গম আমদানি ৮০ শিলিং কিংবা তার বেশি দামে। ৮০ শিলিং-এর কম দামে নিষিদ্ধ। উত্তর আমেরিকার গম ৬৯ শিলিং কিংবা তার বেশি দাম। ৬৭ শিলিং-এর কম দাম নিষিদ্ধ।

কৃষকদের ধারণা ছিল, কৃষির জন্য এই সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী হবে এবং এইভাবেই দেশের মধ্যে লাভজনক দর বজায় থাকবে। তবে বয়েড হিলটন (Boy Hilton) দেখিয়েছেন, রাজনীতিবিদ্ (বিশেষত মন্ত্রীরা) মনে করতেন কৃষি পণ্যের দর শস্য আইনের ফলে অপেক্ষাকৃত চড়া থাকলেও তা হবে সাময়িক। যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হলে দর কমে যাবে, কারণ তখন অর্থ ব্যবস্থার সংস্কারের ফলে সব পণ্যের দরই কমবে।

ওই সময়ে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল রাজনীতিবিদ্দের মনে, যদিও ১৮১৫ সালে কৃষি উৎপাদনে ঘাটতি ছিল না। দুর্ভিক্ষ ঘটলে ইউরোপ থেকে আমদানির উপর নির্ভর করা যাবে না বলেও তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কারণ, ইউরোপ ও ব্রিটেনের আবহাওয়া একই রকম। তাই প্রাকৃতিক কারণে ব্রিটেনে উৎপাদন কমলে ইউরোপও তার ব্যতিক্রম হবে না। আসলে, এই বিতর্কের মূল বক্তব্য ছিল, কোনও দেশ তার শস্য সরবরাহের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারে না। অবাধ বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করলে বিদেশী শস্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে ব্রিটেনের কৃষককে। ফলে পিছিয়ে পড়া কৃষকরা জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হবেন, পরিণামে বাড়বে উৎপাদনে ঘাটতি।

১৮১৯ থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যে কৃষি মূল্যের তীব্র ওঠা পড়ার জন্য বহু চাষী দুর্দশাতেও পড়েন। তাঁরা ত্রাণ ও অধিক সুরক্ষার দাবি তুলে বিভিন্ন সংগঠনও তৈরি করেন। ১৮২০, '২১ সালে যে দুটি কমিটি নিযুক্ত হয়, রিকার্ডো এবং হাসকিসন সেগুলির সদস্য ছিলেন। বাড়তি সুরক্ষার দাবি খারিজ করে দেয় দুটি কমিটি। হাসকিসনের যুক্তি ছিল, বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে কৃষি মূল্য কমেনি। কিছু স্থানে অদক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থার ফলেই ওই সব অঞ্চলের কৃষকদের ভুগতে হয়েছে। তাই বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে বাড়তি সুরক্ষা এক্ষেত্রে কোনও সুরক্ষা নয়। একমাত্র কৃষিতে মূলধনের যোগান বাড়িয়ে এবং কৃষির আওতায় থাকা জমির পরিমাণ কমিয়েই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

অন্যদিকে শস্য আইনের ফলে কৃষিপণ্যের দাম বেশি উপরে উঠে যায়। তখন গুদামগুলিতে মজুত শস্য বাজারে ছাড়ার দাবি ওঠে। সুরক্ষা কমিয়ে আমদানির অনুমতির পক্ষেও মতামত গড়ে ওঠে। ১৮২৭ সালে হাসকিসন একটি ক্রমহ্রাসমান আমদানি শুল্ক ব্যবস্থার প্রস্তাব দেন এবং পরের বছর সেটি গৃহীত হয়। ওই ব্যবস্থায় শস্যমূল্য বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব ছিল। যেমন :

১৮২৮ সালের প্রতি ত্রৈমাসিকের দর
(ক্রমহ্রাসমান শুল্ক ব্যবস্থা)

মূল্য		শুল্ক			
৫২	শিলিং	৩৪	শিলিং	৮	পেন্স
৬৬	,,	২০	,,	৮	,,
৬৯	,,	১৮	,,	৮	,,
৬৮	,,	১৬	,,	৮	,,
৬৯	,,	১৩	,,	৮	,,
৭০	,,	১০	,,	৮	,,
৭১	,,	৬	,,	৮	,,
৭২	,,	২	,,	৮	,,
৭৩	,,	১	পেনি		

কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে শস্য মজুত করে দাম বাড়ানোর প্রবণতা দেখা দেয়। শস্য বাজারে ফাটকা কারবারের ফলে মূল্যস্তর আরও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া সুরক্ষা কার্যকর থাকার সর্বোচ্চ মূল্য তখনও যথেষ্ট উঁচুতে বাঁধা ছিল। তখনও পর্যন্ত কৃষিতে স্বনির্ভরতাই ছিল ব্রিটেনের মূল লক্ষ্য। তাই কৃষির আয়তন কমিয়ে আমদানির উপর নির্ভরতা বাড়ানোর ধারণা তখনও আসেনি।

১৮৪২ সালে শুল্ক আরও কমিয়ে আর একটি ক্রমহ্রাসমান আমদানি শুল্ক ব্যবস্থা চালু করেন পিল। এরপর ১৮৪৬ সালে বাতিল হয় শস্য আইন।

শস্য আইন বিলোপের প্রেক্ষাপট

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝির আগেই মোট জাতীয় আয়ে কৃষির অনুপাত কমতে শুরু করে। তবে কৃষির মোট আয়তন তখনও বেড়েই চলছিল। ১৭৫০ সাল নাগাদ ওই অনুপাত অর্ধেকের নীচে নেমে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তা এক তৃতীয়াংশে নেমে যায়, ১৮১৫ সালে এক পঞ্চমাংশে। তারপর থেকে, আরও দ্রুত বাড়তে থাকে অর্থনীতিতে শিল্পের তুলনামূলক গুরুত্ব, কমতে থাকে কৃষির অনুপাত। খাদ্য আমদানির পরিমাণও ক্রমেই বাড়তে শুরু করে।

শস্য আইন বাতিল করার পক্ষে ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডোর মতো ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা। তাঁদের মতে শস্য মূল্য উঁচুতে বেঁধে রাখার ফলে সাধারণ ক্রেতাকে চড়া দামে তা কিনতে হচ্ছে। শিল্প উৎপাদকদের অভিযোগ ছিল, শস্য আইন বলবৎ থাকার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিচ্ছে, ফলে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে। কৃষিপণ্যের চড়া দামের ফলে খাদ্য ছাড়া অন্য পণ্যের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ছিল না। রিকার্ডো তাই যুক্তি দেখিয়েছিলেন, জমিদার ছাড়া শস্য আইন কোনও পক্ষের মঙ্গল করছে না, সুতরাং তিনি তা বাতিল করার পক্ষে সওয়াল করেন।

১৮২১ থেকে ১৮৪১ সালের মধ্যে শহরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে কৃষিপণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। এ ছাড়া ১৮৩০-এর দশকের শেষের দিকে খারাপ ফলনের জেরে শস্য আইন বাতিলের দাবি আরও জোরদার হয়। ১৮৩৮ সালে গঠিত হয় শস্য আইন বিরোধী লিগ। ১৮৪৬ সালে শস্য আইন বাতিল হওয়ার ঠিক আগেই আয়ারল্যাণ্ডে দেখা দেয় ব্রিটেনের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। মূলত আলুর ফলন মার খেয়েছিল এবং সমগ্র ইউরোপেই দেখা দেয় অজন্মা, সেটাই এই আইন বাতিলের অব্যবহিত কারণ হয়ে দাঁড়ায় যেহেতু আমদানির প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায় বহুগুণ। পিল সে সময়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং এই আইন বাতিল করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তবে এ ব্যাপারে জনমত গঠন করে আগে থেকেই জমি প্রস্তুত করে রেখেছিল লিগ। এটি ছিল মূলত মধ্যবিত্তদের সংগঠন। তাঁরা আন্দোলন করেন সুপরিকল্পিতভাবে, দাস-প্রথা বিরোধী আন্দোলনের ধাঁচে। এমনকী শস্য আইন চালু রাখাকে ধর্মীয় অপরাধ বলেও অভিহিত করা হয়। কারণ, এতে সস্তায় রুটি যোগানোর পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ আনা হয়। ১৮৪১ সালের নির্বাচনেও লিগ হয়ে ওঠে একটি বড় রাজনৈতিক শক্তি। নতুন লেজে ফেয়ার অর্থনীতির প্রবক্তাদের সঙ্গে পেয়েছিল লিগ। ১৮৪৫ সালে আলুর অজন্মা, গমের দাম ৪৫ শিলিং থেকে ৫৯ শিলিং-এর মধ্যে ওঠা-পড়া করা ইত্যাদি কারণে পিল ১৮৪৬ সালে শস্য আইন বাতিলের সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। শুধু বহাল থাকে গমের উপর প্রতি ত্রৈমাসিকে ১ শিলিং করে নথিভুক্তি কর।

শস্য আইন বাতিলের প্রভাব

শস্য আইন বাতিল হওয়ার পর ব্রিটেনের কৃষিতে কোনও বিপর্যয় দেখা দেয়নি। বরং ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝের দশকগুলি কৃষির স্বর্ণযুগ হিসাবেই পরিচিত। প্রথমদিকে শস্যের দাম কিছুটা পড়লেও পরে রাশিয়ার যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে আমদানি কমে যায়, দাম বাড়ে, কৃষির সমৃদ্ধিও বেড়ে চলে। এরপর আমেরিকায় রেলপথ নির্মাণ, সেখানে কৃষির প্রসার ইত্যাদি কারণে আমদানি বেড়ে যায়। ১৮৭৩ সালের পর থেকে ব্রিটেনে কৃষি আয়তন দ্রুত কমতে থাকে। ১৮৮৫-'৮৬ সালে ব্রিটেনে শস্যের চাহিদার ৬৪ শতাংশই মেটাত আমদানি। প্রকৃতপক্ষে পরিবহণের খরচ কমা এবং আমেরিকা থেকে সরবরাহ বৃদ্ধির প্রভাবেই কৃষি পণ্যের দাম কমতে থাকে।

পাশাপাশি ব্রিটেনের কৃষিও নানা কারিগরি পরিবর্তন ও উন্নত কৃষি ব্যবস্থার কারণে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। কৃষির আয়তন কমলেও তা লাভজনক ছিল। এটাই ছিল শস্য বাতিল হওয়ার পরিণতি।

শস্য আইন যে শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়েছিল, তার মূলে ছিল ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য গড়ার আকাঙ্ক্ষা। বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ততদিনে আর সাবেকি উপনিবেশ প্রথার প্রতি আকর্ষণ ছিল না তাদের। শুল্কর মাধ্যমে সুরক্ষা, নৌ আইন বা যুদ্ধের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারেও তাদের আগ্রহ ছিল না। তাদের একমাত্র আগ্রহ ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার এবং তার হাতিয়ার ছিল শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে ব্রিটেনের আত্মপ্রকাশ। সেই কারণেই অবাধ বাণিজ্য তাদের প্রয়োজন ছিল, কারণ সেটাই ছিল তাদের আধিপত্যের নিদর্শন। শিল্পপতিদের চাপ না থাকলে এবং নির্বাচনে তাঁদের ক্ষমতা না বাড়লে পিল-এর পক্ষেও অবাধ বাণিজ্য চালু করা সম্ভব হত না।

৩.৪.৫ অন্যান্য আইন বিলোপ

বহুক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ উঠতে শুরু করলেও বাজারের উপর বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণ তখনও বলবৎ ছিল। যেমন 'অ্যাসাইজ অব ব্রেড' (Assige of Bread) আইনে সরকারি অফিসাররা রুটির দাম বেঁধে দিতে পারতেন। রুটি প্রস্তুতকারক কতটা লাভ রাখতে পারবেন, সেটাও তাঁরা স্থির করে দিতেন। ভেজাল প্রতিরোধের চেষ্টাও এই আইনে করা হত।

আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। যেমন ১৭৬৫ সালের আইনে ইয়র্কশায়ারে তৈরি কাপড়ের মান নিয়ন্ত্রণ করা হত। আইরিশ লিনেন ও জুতোর উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রিত হত।

শ্রমের বাজারও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল না। শ্রম আইনে (Labour Laws) মজুরি বেঁধে দেওয়া হত এবং তা আড়াইশো বছর ধরে চলে আসছিল। কর্মীদের সম্মিলিত আন্দোলন ঠেকাতেও ছিল আইন। মজুরি যিনি স্থির করতেন, সেই 'জাস্টিস অব পিস'-এর (Justice of Peace) বিরুদ্ধে তাঁরা মুখ খুলতে পারতেন না। নিয়োগ সংক্রান্ত আইনও বলবৎ ছিল। বেশ কয়েক বছর শিক্ষানবিশির পর কর্মীকে নিয়োগ করা হত। শিক্ষানবিশির বয়সও নির্ধারিত ছিল। এর ফলে ইচ্ছামতো যে কোনও সময়ে কেউ পেশা বদল করতে পারতেন না।

'বসবাস আইন' বা 'সেট্‌লমেন্ট' (Settlement Law) এর ফলে অন্য কোনও গির্জা অর্থাৎ প্যারিশ এলাকায় কেউ বাস করতে এলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁর মূল গির্জা এলাকায় ফেরত পাঠাতে পারতেন। ফলে শহরে গিয়ে বসবাসও ঠেকানো যেত।

দরিদ্রদের দেখাশুনার ক্ষেত্রে 'দারিদ্র্য আইন' বা 'পুওর ল' (Poor Law) অনুযায়ী চলত গির্জাগুলি। এর জন্য তাদের নিজস্ব তহবিল ছিল।

মূলধনী বাজারের উপরও ছিল নিয়ন্ত্রণ। এই ব্যবস্থায় বেসরকারি ঋণ গ্রহীতাদের জন্য সুদের হার ছিল সর্বোচ্চ। সরকারি ঋণ গ্রহীতাদের এই চড়া সুদ দিতে হত না। লণ্ডন স্টক মার্কেটে অতিরিক্ত ফাটকা কারবারের জন্য সঙ্কট দেখা দিলে ১৭২০ সালে পাশ হয় 'বাব্‌ল অ্যাক্ট' (Bubble Act)। এর ফলে পার্লামেন্টের বিনা অনুমতিতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলি ফাটকা কারবারে নামতে পারত না।

উদার আর্থিক নীতি প্রণয়নের ফলে এই সমস্ত আইনই ক্রমে বিলোপ করা হয়। অ্যাসাইজ অব ব্রেড আইন ঊনবিশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তুলে নেওয়া হয় লণ্ডনে, পরে প্রদেশগুলিতেও তা উঠে যায়। বেতনও কর্মীদের শিক্ষানবিশি সংক্রান্ত আইন তুলে নেওয়া হয় ১৮১৩/১৪ সালে। সেট্‌লমেন্ট আইনও সংশোধিত হয় ১৭৯৫ সালে। ফলে কাউকে ফেরত পাঠানোর আগে প্রমাণ করতে হত যে তিনি নিজের গির্জা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র এসে বসবাস করছেন।

শ্রম আইন সরল করতে ১৭৯৯/১৮০০ সালে পাশ হয় 'কম্বিনেশন আইন' (Combination Laws)। শ্রমিকদের সম্মিলিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ এতে তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু এই আইনের সাহায্যেই তাঁদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়ন গড়া থেকে বিরত করা হত। কাজের সময় কমানো নিয়েও তাঁরা সরব হতে পারতেন না। বাব্‌ল অ্যাক্ট তুলে নেওয়া হয় ১৮২৫ সালে।

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত একে একে বহু আইনও তুলে নেওয়া হয়। আরও কয়েকটি বিষয়, মূলত সরকারি নীতি নিয়ে এখানে আলোচনা করব।

কারখানা আইন (Factory Legeslation)

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কারখানা আইনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন শিশু ও মহিলাদের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চালু করা। ১৮১৯ সালে চালু হয় প্রথম কারখানা আইন। এতে ৯ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। ১৬ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে দৈনিক কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয় ১২ ঘণ্টায়। তবে নজরদারির ব্যবস্থা জোরদার না হওয়ায় এটি তেমনভাবে বলবৎ করা যায়নি। ১৮৩৩ সালের কারখানা আইন [যেটি অ্যালথ্রপস আইন (Althrops Act) নামে পরিচিত]-এ সর্বপ্রথম নজরদারি ব্যবস্থা চালু করা হয়। এইসব আইনে ক্রমে মহিলাদের কাজের সময় কমিয়ে আনা হয়। শিশুদের কাজের বয়সেও আনা হয় পরিবর্তন।

দারিদ্র্য আইন

এই আইনে দরিদ্র, অক্ষমদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছিল এলাকার গির্জার উপর। সেই জন্য গির্জাগুলি তহবিল সংগ্রহ করত। গির্জা কর্তৃপক্ষই দরিদ্রদের কাজে যোগ দিতে বাধ্য করতেন। এর পর ১৭২২ সালে পাশ হয় ওয়ার্কহাউস আইন (Workhouse Act)। নতুন আইনে কোনও দরিদ্র ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট কর্মশালায় কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সে তা মান্য না করলে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হত।

১৭৮২ সালে আসে গিলবার্ট আইন (Gilbert's Act)। তাতে সক্ষম দরিদ্রদের কর্মশালার বাইরে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হত। অক্ষমদের কর্মশালাতেই রাখা হত। ১৭৯৫ সালে দারিদ্র্য আইন আরও সরল করে চালু হয় 'স্পিনহ্যামল্যান্ড সিস্টেম' (Speenhamland System)। রুটির দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তখনই এই ধারণা স্বীকৃত হয় যে সকলের অন্ন সংস্থান করাটা সমাজের দায়িত্ব। যদি কেউ নিজের জীবন ধারণের উপযুক্ত আয় করতে না পারে, তাহলে গির্জা কর্তৃপক্ষকেই তাঁকে অর্থ যোগাতে হবে। এমনকী, যাঁরা চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন, অথচ আয় কম ছিল, তাঁদেরও সাহায্য করা হত। এই সাহায্যের অঙ্ক নির্ধারিত হত রুটির দাম এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে।

এই ব্যবস্থা যথেচ্ছ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ইন্ধন জুগিয়েছিল বলে এর সমালোচনা করেছিলেন রিকার্ডো, ম্যালথাস। যেহেতু সাহায্যের পরিমাণ পরিবারের সদস্য সংখ্যার উপর নির্ভর করত, সেই কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছিল। দারিদ্র্য আইন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখার জন্য সেই কারণেই নিযুক্ত হয় একটি কমিশন। শেষ পর্যন্ত ১৮৩৪ সালে পুরনো আইনের স্থান নেয় নতুন দারিদ্র্য আইন। এই আইনে স্থানীয় গির্জা কর্তৃপক্ষকে দারিদ্র্য আইন কর্তৃপক্ষ ও কমিশনারদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবে অর্থসাহায্য দিতে হত। এই আইনে কর্মশালায় কাজ করার বিষয়টি আবার সাহায্য পাওয়ার মাপকাঠি হিসাবে প্রবর্তন করা হয়। উপরন্তু, দারিদ্র্য আইনে গরিব বলে যাঁরা সাহায্য পাচ্ছিলেন, তাঁরা আরও সাহায্য পাওয়ার জন্য ততটা যোগ্য বিবেচিত হতেন না। সবচেয়ে কম মজুরির শ্রমিক সে তুলনায় বেশি যোগ্য বিবেচিত হতেন।

দেখা গেছে নতুন আইনে সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়। সে দিক দিয়ে বিচার করলে এটা 'লেজে ফেয়ার' বা উদার অর্থনৈতিক নীতির জয়ই সূচিত করেছিল। কারণ, অপরিমিত সাহায্যের ব্যবস্থা পুরনো আইনে থাকার ফলে কাজ না করে দারিদ্র্য ভাতার উপর নির্ভর করে অলস জীবন যাপনের প্রবণতা বাড়ছিল। নতুন আইনে সাহায্যের পরিমাণ কমার ফলে শ্রমের স্বাভাবিক প্রবাহের উপর কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই শিথিল হয়। তবে ত্রাণ বন্টনের উপর যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিশনের নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা হয়, সে দিক দিয়ে দেখলে এটি তথাকথিত 'লেজে ফেয়ার' নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

রেল ব্যবস্থা (Railwages)

ব্রিটেনে বেসরকারি উদ্যোগেই নির্মিত হয় রেলপথ। কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত হত পার্লামেন্টের আইনের মাধ্যমে। যদি নির্মাতার জমি অধিগ্রহণের অধিকার পেতেন, তবেই তাঁরা নির্মাণ শুরু করতে পারতেন। ১৮৪০ এবং '৪২ সালে বাণিজ্য পর্ষদের একটি রেলওয়ে বিভাগ গড়া হয়। তাতে তিনজন অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রেল কোম্পানিগুলির কাজ পর্যবেক্ষণ করার জন্য। আইন না মানলে প্রকল্প বাতিলের অধিকার তাঁদের ছিল। বিভিন্ন বেসরকারি রেল কোম্পানির মধ্যে পরিবহণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে যে বিরোধ সৃষ্টি হত, তা তাঁর নিষ্পত্তি করতেন। বিভিন্ন রেল কোম্পানিকে সংযুক্তিকরণের এরপর দেখা যায়। উদ্দেশ্য ছিল রেল ব্যবস্থার উন্নয়ন। তবে সংযুক্তিতে সরকার কখনও অনুমতি দিতেন, আবার কখনও দিতেন না। সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রেল ব্যবস্থার উন্নয়নে কিছু কিছু আইন জারি ছিল। কিন্তু পরিচালনায় কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্রিটেনে ছিল না, যেমনটি ছিল অন্যান্য দেশে।

৩.৫ উদারনীতি বনাম লেজে ফেয়ার

ফিলিস ডিনের মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যা প্রবণতা দেখা গেছে, তাতে লেজে ফেয়ার নীতিকে বিজয়ী হিসাবে গণ্য করা যায় না। তিনি বলেছেন, অনেক আইন বাতিল করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেগুলি তেমন কার্যকর ছিল না বলেই বিলোপ করা হয়। তাছাড়া শিল্পায়ন, শহরায়ণ অন্য ভাবে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাও বাড়িয়ে দেয় ১৮৩০-এর দশক থেকে। তাঁর মতে বণিকী পুঁজিবাদে রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ, চড়া আমদানি শুল্ক ব্যবস্থা-সবই লঙ্ঘিত হত চোরা-পথে বাণিজ্যের মাধ্যমে। শিক্ষানবীশি সংক্রান্ত আইনও নতুন নতুন সৃষ্টি হওয়া পেশার জন্য প্রযোজ্য ছিল না। আসলে ডিনের মতে আইনগুলি রূপায়ণের জন্য যথেষ্ট নজরদারি ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ছিল না। তাই সেগুলি লেজে ফেয়ার নীতি অনুসরণ করে বাতিল করা হয়েছিল এমন বলা যায় না। তিনি স্বাস্থ্য, নিকাশি ব্যবস্থা, কারখানা ও খনি সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন সরকারি হস্তক্ষেপ ১৮৩০-এর দশকে কতটা প্রকট হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে হব্‌স্‌বম-এর মতো অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা বলেছেন, প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিচার করে বলা যাবে না সরকারি হস্তক্ষেপ কমেছিল না বেড়েছিল। এর জন্য নীতিগুলির মূল উপাদান বিবেচনা করে দেখতে হবে। হব্‌স্‌বম-এর মতে লেজে ফেয়ার-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য কার্যত অসম্ভব। প্রশাসন মসৃণভাবে চালাতে হলে কিছু আইন জারি রাখতেই হবে। তাঁর মতে ১৮৫০-এর দশক পর্যন্ত যা ঘটেছে, তা পুঁজিবাদের প্রসারের পথে সরকারি বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার লক্ষ্যেই। বণিকী পুঁজিবাদ, নৌ-আইন, পুরনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সবই ছিল বিধিনিষেধের নিদর্শন। দারিদ্র্য আইন, শস্য-আইন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়েছিল। সুতরাং ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই সেগুলি বাতিল করা হয়।

স্কট জর্ডন (Scoth Gordon)-এর মতো ঐতিহাসিকের মতে, লেজে ফেয়ার-কে অবাধ বাণিজ্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কারণেই যত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন শস্য আইন বাতিল করার পক্ষে মূল যুক্তি ছিল অবাধ বাণিজ্য চালু করা। লেজে ফেয়ার নীতির প্রতি আনুগত্য নয়। কারণ লেজে ফেয়ার বলতে অর্থনীতির সার্বিক কর্মকাণ্ডে সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা বোঝায়। সেটা বাস্তবে সম্ভব নয়। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রাও যে সব সময়ে লেজে ফেয়ার-এর কথা বলেছেন তা নয়। তাঁরা উদারনীতি বা অবাধ বাণিজ্যকেই সমর্থন করেছেন।

তবে উদারনীতি যে লেজে ফেয়ার-এরই একটি দিক, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। অনেক ঐতিহাসিকই সেই কারণে দুটিকে সমার্থক করে দেখেছেন। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীকে লেজে ফেয়ার-এর যুগ বললেও ভুল হয় না। তবে সে যুগের জটিল অর্থে সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিছু সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয়ই ছিল।

৩.৬ সারাংশ

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাক্ শিল্পায়ণ পর্বের আইনগত কড়াকড়ির জাল থেকে অনেকটাই বেরিয়ে আসতে পেরেছিল ব্রিটেন। এর মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর থেকে বিধিনিষেধ তোলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতিক ও সরকারি আমলারা এ সময়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন অ্যাডাম স্মিথের Laissez-faire তত্ত্বের দ্বারা। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা সাধারণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করার পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন।

এই পর্বের উদারনীতিকে উপলব্ধি করতে হলে বুঝতে হবে সে সময়কার বাণিজ্য বিপ্লবকে। তদানীন্তন বাণিজ্যের নীতি ছিল বণিকী পুঁজিবাদ, যার মূল তত্ত্ব ছিল বাণিজ্যের ভারসাম্য। স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যবস্থার আমদানির উপর আরোপ করা হয় নিয়ন্ত্রণ। বৈদেশিক বাণিজ্যে হল্যাণ্ডের আধিপত্য খর্ব করতে ১৬৫১ সালে জারি হল নৌ-আইন। এর শর্ত ছিল ইউরোপীয় পণ্য হল্যাণ্ডের মাধ্যমে আমদানি করতে পারবে না ব্রিটেন। ব্রিটিশ জাহাজে আমদানিতেও একইসঙ্গে উৎসাহ দেওয়া শুরু হয়। হল্যাণ্ডের জাহাজে ইউরোপীয় পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করার ধারাটি সংশোধিত হয় ১৬৬০ সালে। কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য তখন তা প্রযোজ্য হয়। উপনিবেশগুলিকেও নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্য অন্য কোনও রাষ্ট্রে রপ্তানি করতে পারবে না। সর্বপ্রথম সেগুলি রপ্তানি করতে হবে ব্রিটেনে। পরে সেখান থেকে ব্রিটেন তা পুনরায় রপ্তানি করত ভিন রাষ্ট্রে। একইভাবে ১৬৬৩ সালের প্রাধান্য আইনে উপনিবেশগুলিকে কিছু ইউরোপীয় পণ্য শুধু ব্রিটেনের মাধ্যমেই কিনতে হত।

১৭৭৯ থেকে ১৮০২ সালের মধ্যেই ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির হার পৌঁছে যায় ৪.৯ শতাংশে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটেন মূলত শিল্পজাত পণ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি করেছিল। দ্বিতীয় ভাগে তাকে শস্য আমদানি করতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সুতিবস্ত্র রপ্তানির প্রাধান্য বাড়ে।

এককথায় ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবদান অনস্বীকার্য। তার অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছিল, অর্থাৎ কৃষির তুলনায় শিল্পের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়া, তা বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ছাড়া সম্ভব হত না।

বণিকী পুঁজিবাদের আমল থেকে বিধিনিষেধের যে প্রাচীর তৈরি শুরু হয় শিল্পোন্নয়ণের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি বাতিল করার প্রয়োজন দেখা দেয়। লক্ষ্য ছিল নিজস্ব পণ্যের বাজার বাড়ানো এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি। এরই জেরে প্রত্যাহৃত হয় নৌ-আইন (১৮৪৯), প্রাধান্য আইন (১৮৪৬), শস্য আইন (১৮৪৬)। আরও যেসব আইন বাতিল হয়, তার মধ্যে ছিল বসবাস আইন, দারিদ্র্য আইন, বাব্‌ল অ্যাক্ট। সরল হয় শ্রম আইন, কারখানা আইন।

এই পর্বে উদারনীতির যে জয় সূচিত হয়েছিল, সেটাকেই অনেকে লেজে ফেয়ার বলেছেন। তবে কিছু ঐতিহাসিকের মতে তা অবাধ বাণিজ্যেরই নামান্তর। অনেকেই দুটিকে সমার্থক বলে গণ্য করেছেন।

৩.৭ অনুশীলনী

১। ব্রিটেনে বণিকী পুঁজিবাদ ব্যবস্থার মূল তত্ত্ব কী ছিল? এ প্রসঙ্গে নৌ-আইনটি ব্যাখ্যা করুন।

২। পরিসংখ্যানের সাহায্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ব্যাখ্যা করুন।

৩। শিল্পবিপ্লবে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবদান কোথায় কোথায় ছিল?

৪। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌দের চিন্তায় উদারনীতি কীভাবে প্রকাশ পেয়েছিল?

৫। ব্রিটেনে উদারনীতির বিবর্তন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন : নৌ-আইন, পুরনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, সাধারণ শুল্ক ব্যবস্থা, দারিদ্র্য আইন, রেল ব্যবস্থা।

৭। শস্য আইন বিলোপের প্রক্রিয়া ও তার প্রেক্ষাপট বুঝিয়ে বলুন। এই আইন বাতিলের প্রভাব কেমন ছিল? অন্যান্য আইন বিলোপ সম্পর্কে বিবৃত করুন।

৮। ব্রিটেনে উদারনীতি ও লেজে ফেয়ার বিতর্ক সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। P. Deane, The First Industrial Revolution, Cambridge University Press, First Indian Edition, 1994.

২। হরশঙ্কর ভট্টাচার্য, ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব ও তারপর, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

৩। P. Deane and W. A. Cole, British Economic Growth 1688-1959 (1962).

৪। Hobsbown, Industry and Empire, An Economic History of Britain since 1750 (1968).

ই. ই. সি—৬

পর্যায়-২২

অর্থনীতির ঐচ্ছিক পাঠক্রম

(স্নাতক পাঠক্রম)

একক ১ □ জাপানের মেইজি শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ মেইজি শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১.৩ ঐতিহাসিক পটভূমিকা

১.৪ মেইজি শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পটভূমি হিসাবে তোকুগাওয়া শাসনকালের আলোচনা

১.৫ শোগুন-এর পতনের কারণ

১.৬ মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য

১.৭ মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে জাপান

১.৮ মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে জাপানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক—সাধারণ আলোচনা

১.৯ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতি

- ১.৯.১ ভূমিব্যবস্থা ও কৃষির অগ্রগতি
- ১.৯.২ বিভিন্ন শিল্প—বয়ন শিল্প, রেশম শিল্প, কার্পাস শিল্প, মসলিন শিল্প, পশম শিল্প, ধাতু শিল্প
- ১.৯.৩ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
- ১.৯.৪ জাহাজ শিল্প
- ১.৯.৫ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী শিল্প
- ১.৯.৬ কাগজ শিল্প
- ১.৯.৭ সিমেন্ট ও গ্লাস শিল্প
- ১.৯.৮ এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প
- ১.৯.৯ রেললাইন ও দূরভাষ

১.১০. অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রগতি—প্রকৃত মজুরীতে পরিবর্তন

- ১.১০.১ জীবিকার গঠনের পরিবর্তন
- ১.১০.২ বৈদেশিক বাণিজ্য
- ১.১০.৩ অর্থনৈতিক সংস্থা
- ১.১০.৪ রাজস্ব ব্যবস্থা
- ১.১০.৫ মূলধনের গঠন
- ১.১০.৬ মেইজি গঠন
- ১.১০.৭ চিন্তার বৈপ্লবিক সূত্রপাত

১.১১ সরকারের সক্রিয় ভূমিকা এবং এই সক্রিয় ভূমিকার অনেকাংশে অবসান

১.১২ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিফলন হিসাবে বিভিন্ন সারণী

১.১৩ মেইজি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

১.১৪ অনুশীলনী

১.০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করলে আপনি আধুনিক জাপান সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা দিতে পারবেন।
- আধুনিক জাপানের অগ্রগতি অন্যকে বোঝাতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাজনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি আলোচনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন শিল্পের অগ্রগতি বিবৃত করতে পারবেন।
- সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিফলন আলোচনা করতে পারবেন।
- আধুনিক জাপান সম্বন্ধে অন্যদের স্পষ্ট ধারণা দিতে পারবেন।

১.১ প্রস্তাবনা

আধুনিক জাপানের আর্থনীতিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয় মেইজি রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় (১৮৬৮) থেকে। কিন্তু তার আগেকার আড়াইশো বছর অর্থাৎ যে সময়টাকে আধুনিক পরিবর্তনকাল হিসেবে গণ্য করা হয় তার সংক্ষিপ্ত ধারণা না থাকলে মেইজি শাসনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

১৫৪৩ সালে যখন পর্তুগীজ বণিকরা একটি চৈনিক লঝঝড়ে জাহাজে জাপানের উপকূলে নামল। তাদের সঙ্গে এল আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। তার তিন দশকের মধ্যে জাপানী সামরিক প্রভুদের মধ্যে দীর্ঘকালীন বিবাদে আগ্নেয়াস্ত্রের বহুল ব্যবহার শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে একশো বছর এই সব সামরিক স্থানীয় প্রভু বা শাসক যাদের জাপানীভাষায় বলা হল ডাইমিও (daimiyo) তারাই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে সমস্ত ডাইমিওদের একটি কেন্দ্রীয় সামরিক কর্তৃত্ব (military command) এর আওতায় আনা হয় এবং এর ফলস্বরূপ একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয় যার কর্তৃত্বে ছিলেন একজন তোকুগাওয়া (Tokugawa) পরিবারভুক্ত শাসক যিনি শোগুন (Shogun) উপাধি ধারণ করেন যার অর্থ হল সর্বোচ্চ সামরিক কর্তা (Generalssimo)। রাজধানী স্থানান্তরিত হল কিয়োটো থেকে এডো (Edo)-তে যা পরবর্তীকালে টোকিও নামে খ্যাত হয়। বেশ কয়েক শতাব্দীর গৃহযুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হল, যা বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বজায় ছিল। (১৬০৩-১৮৬৮)।

(খ) প্রাক্ শিল্পোন্নয়নের যুগে চীন ও জাপান

প্রাক্-শিল্পোন্নয়ন যুগের ইংল্যাণ্ড ও চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সাংগঠনিক বিষয়ে অনেক পার্থক্য ছিল। কিন্তু শিল্পোন্নয়নের আগে চীন ও জাপানের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না।

চীন ও জাপান দুটি দেশেই কৃষিতে জলসেচের ব্যবস্থা ভালই ছিল। কৃষি জমির আয়তন দুটি দেশেই ছোট ছিল। কৃষি জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ ছিল খুব বেশি। দুটি দেশেই কৃষির গড় উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় প্রায় একরকমই ছিল। দুটি দেশেই শিল্পোন্নয়নের আগে প্রায় দু'শতাব্দী ধরে বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল।

তবুও ১৮৬৮ সালে মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপান আধুনিকতায় চীনের থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল।

শিল্পোন্নয়নে চীন অন্যান্য অনেক দেশ যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এদের থেকে অনেক পিছিয়ে থাকার জন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন চীনে কম্যুউনিজমের প্রবর্তন হোল, তখন চীন ঐ দেশগুলির তুলনায় অনুন্নতই ছিল।

১.২ মেইজি শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাপানই হচ্ছে এশিয়ার একমাত্র দেশ যে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন এক স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে করতে সমর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এক অভূতপূর্ব গতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটিয়ে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত শক্তির শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল সর্বাপেক্ষা কর্মদক্ষ এবং সর্বাপেক্ষা আলোকপ্রাপ্ত (enlightened) পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণির দ্বারা বিপ্লব (Elite Revolution বা Revolution from Above)। চীন বা রাশিয়ার মত এই বিপ্লব সমাজের নীচু স্তর (Revolution from below) থেকে আসেনি।

১.৩ মেইজি শাসনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

অতি প্রাচীনকালে জাপানের অধিবাসী ছিল আইনু (Ainu) নামে এক জাতি। আমাদের পরিচিত জাপানের পূর্বপুরুষরা আসে এদের অনেক পরে। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কোরিয়ার অনেক অধিবাসী জাপানে এসে বসবাস শুরু করলে জাপানের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটে। পঞ্চম শতাব্দীতে জাপান চৈনিক অক্ষর (Chinese Script) গৃহীত হয়। পরবর্ত্তী চারটি শতাব্দী ধরে জাপানে হেইয়ান (Heian) রাজত্ব চলে। এই সময়ে সম্রাট সম্রাজ্ঞীরা যথেষ্ট বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিল ফুজিওয়ারা বংশীয় (House of Fujiwara) সামন্ততন্ত্র। জাপানের ক্ষমতাশালী সামন্ততন্ত্র এই সময় থেকেই আঞ্চলিকভাবে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং কোনও কোনও সামন্ত পরিবার কেন্দ্রে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সামন্ততন্ত্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল স্থানীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রভুর হাতে যাদের নাম ছিল ডাইমিও। রাজসভার সবচেয়ে শক্তিশালী পরিবার।

এই ফুজিওয়ারা জাপানে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করলেও দ্বাদশ শতাব্দীতে এদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। তখন প্রকৃত শাসন ক্ষমতা যায় সামরিক বাহিনীর হাতে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে জাপানে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তোকুগাওয়া বংশদ্ভুত আইয়েসু (Tokugawa Ieyasu) সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক সেনাধ্যক্ষ শোগুন (Shogun) উপাধি গ্রহণ করে এবং এরাই বাস্তবিকপক্ষে জাপানের শাসনভার পরিচালনা করে। প্রথম শোগুনের রাজত্ব বাকুফু (Bakufu) শুরু হয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। চলে ১৩৩৩ পর্যন্ত। নানা গৃহবিবাদ ও শাসকের অন্তর্দ্বন্দ্বে ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন এবং অরাজক অবস্থার অবসান হয় ১৬০৩ সালে যখন তোকুগাওয়া (Tokugawa) পরিবার শোগুনের সমস্ত ক্ষমতা দখল করে জাপানের অধিকাংশ অঞ্চল করায়ত্ত করেন। এই তোকুগাওয়া রাজত্ব

২৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে। তোকুগাওয়া রাজত্বকালে জাপান একটি বদ্ধ অর্থনৈতিক (Closed Economy) ব্যবস্থায় পরিণত হয়। খ্রীষ্টান ধর্মে নিষিদ্ধ হয়, জাপানীদের বিদেশে যাওয়া বন্ধ হয় এবং জাপানে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বের কাছে তার প্রবেশপথ বন্ধ রাখে।

১.৪ মেইজি শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পটভূমি হিসাবে তোকুগাওয়া শাসনকালের আলোচনা

তোকুগাওয়া শাসনে জাপানে জাতীয় সরকারের (Bakufu) কাজে সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল শোগুন-এর হাতে। এর পরেই ছিল ডায়মিয়ো (Daimyo) বা সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতরা এবং সামুরাই (Samurai) বা সামরিক শাসকবর্গ।

জমি প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের (Feudal aristocrats) হাতেই ছিল। এদের শাসন করত ডায়মিয়ো। এই ডায়মিয়োকে কঠোর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল শোগুন। শোগুন ও ডায়মিয়োর আয়ের প্রধান উৎস ছিল কৃষিজ উৎপাদন এবং কৃষি-কর।

বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের কারিগররা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ, বিক্রয় এবং মূল্য প্রভৃতির ব্যাপারে প্রধানত ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ (Guild) দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো। এই সময় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় লৌহ, খনিজ, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্পের কাজ শুরু হয়। এই সময় জাপান বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হলেও, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ যথেষ্ট ছিল।

১.৫ শোগুনের পতনের কারণ

এখন আমরা আলোচনা করব কোন কোন কারণে শোগুনের পতন ঘটেছিল।

জাপানের সব সম্প্রদায় (Claus) এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসকেরা তোকুগাওয়ার শোগুনের সমর্থক ছিল না। সাতসুমা (Satsuma), চোশু (Choshu) এবং অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়ই শোগুনের পতন ঘটিয়েছিল।

তোকুগাওয়ার দীর্ঘ শাসনকালে জাপানে শান্তি বজায় থাকার জন্য সামুরাইরা নিষ্ক্রিয় পরগাছায় পরিণত হয়েছিল। এদের ভার বহন করা সমাজের একটি বড় দায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শোগুনের পতনের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

এই সময়ে জাপানে বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটছিল এবং অর্থের বর্দ্ধিত চাহিদা পূরণ করার জন্যে জাপানে একটি অর্থের বাজার গড়ে উঠেছিল। কাগজের টাকার (Paper Notes) প্রচলনের ব্যবস্থা এই সময়েই হয়েছিল। এর ফলে জাপানের অর্থনীতিতে অনেক সুবিধা ঘটলেও সাধারণ মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতার অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দেশের সাধারণ লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে যেতে শুরু করেছিল।

তোকুগাওয়ার সময়ে শোগুন-এর শাসনের শেষ কয়েকটি বছরে জাপানে বেশ কয়েকটি পরিবর্ত্তন ও সংস্কার-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কয়েকটি দেশ জাপানের স্বেচ্ছাকৃত বিচ্ছিন্নতা দূর করে তার বন্দরগুলিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করার চেষ্টা করছিল। কমোডর পেরি (Commodore Perry) আমেরিকার পক্ষে জাপানের সঙ্গে একটি চুক্তি করে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে জাপানের দুটি বন্দরকে আমেরিকার বাণিজ্যের জন্যে উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। ১৮৫৮ সাল থেকে অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রকেও নানারকম সুবিধা দেওয়া হয়। এ ছাড়া পশ্চিমী ধাঁচে শিল্প গঠন করা শুরু হয়েছিল। এই আধুনিকীকরণের প্রয়াসের জন্য শোগুন জাপানীদের কাছে তার সম্মান হারিয়েছিল। সাতসুমা, চোশু প্রভৃতি শক্তরা কিয়োটো (Kyoto) এবং ওসাকার (Osaka) ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শোগুন-এর উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল।

১.৬. মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই জাপানে প্রাচীন ইতিহাসের পুনরুত্থান ঘটেছিল। এর ফলে সম্রাটই সব ক্ষমতার উৎস ও ধারক হয়ে ওঠেন। জাপানের অধিবাসীদের ধারণা হয়েছিল শোগুন সম্রাটের কাছ থেকে দেশ শাসনের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। এই মনোভাব তোকুগাওয়া শাসনের বিরুদ্ধে গিয়েছিল।

১৮৬৭-র শেষে বৃদ্ধ শোগুনের মৃত্যু হয়। এর ফলে গৃহযুদ্ধ ছাড়াই ক্ষমতা স্থানান্তরিত করার সুযোগ আসে। শোগুনের উত্তরাধিকারী ছিল নাবালক। সেইজন্য শেষ শোগুন যুবক সম্রাট মেইজির (Meiji) হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করেন। মেইজি সম্রাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই বিশেষ সময়ে কিছুটা পশ্চিমী দেশগুলির প্রভাব পড়েছিল ঠিকই, তবে তোকুগাওয়ার শাসনে জাপানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাফল্যই মেইজি শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি ছিল। এই মেইজি শাসনের কার্যকাল ছিল ১৮৬৮ থেকে ১৯১২। ১৮৬৮ সালে সম্রাট মুতসুহিতো (Mutsuhito) তাঁর শাসনকালকে "আলোকপ্রাপ্তের শাসন" (Rule of Enlightened) বা মেইজি আখ্যা দেন। সেইজন্য ১৮৬৮-১৯১২ পর্যন্ত সময়টিকে বলা হয় মেইজির পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

কিন্তু এটি মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা অথবা মেইজি বিপ্লব কিনা,—এ সম্বন্ধে বিতর্ক রয়েছে। অনেকের মতে তোকুগাওয়া থেকে মেইজি শাসন ক্ষমতার এই হস্তান্তর তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিক ঘটনাই ছিল—কাজেই একে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া যায় না।

মার্কস্‌বাদীদের মধ্যে দুটি বিরুদ্ধ মত দেখা যায়। শ্রমজীবী-কৃষকদের মতে এটি সংরক্ষণশীলদের বিপ্লব (Bourgeois Revolution) ছিল। অপর মতটি হল মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা কোন ধনতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, কারণ এটি রাজতন্ত্রের দ্বারা দেশ শাসনের সূচনা করেছিল।

১.৭. মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপান

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরেই পশ্চিমী চারটি দল (যারা শোগুন-এর পতন ঘটিয়েছিল) অলিগার্কি (Oligarchy) গঠন করে দেশ শাসন করলেও শীঘ্রই এই দলের মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ

শুরু হল। অবশ্য মধ্যপন্থীরাই শেষে জয়ী হলেন এবং সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। এর পরের দুই দশক ধরে জাপান তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আধুনিকীকরণে সচেষ্ট ছিল। জাপান এই সময়ে কোনো বড় ধরনের সামরিক অভ্যুত্থানে নিজেকে লিপ্ত করেনি।

জাপানের সম্রাট মূল ক্ষমতার অধিকারী হলেও প্রকৃত নেতৃত্ব এসেছিল পুরাতন জাপানের অভিজাতশ্রেণীর নীচের স্তর থেকে। সামুরাই (Samurai) সম্প্রদায় থেকে প্রধানত নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে একদিকে যেমন জাপানের নতুন নেতৃত্ব চিরাচরিত সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়নি, তেমনি এই নতুন নেতৃত্ব জাপানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে উৎসাহ ও সংকল্পের কার্পণ্য করেনি।

১.৮. মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে জাপানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক—সাধারণ আলোচনা

সামন্ততান্ত্রিক জাপানে ডায়মিয়ো (Daimyo) অর্থনীতির বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে স্বাধীনতা উপভোগ করত। মেইজি শাসনকালে এর অবসান হল। একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। জাপান কয়েকটি রাজ্যে (Prefectures) বিভক্ত হল। প্রত্যেকের আইনের কাছে সমান অধিকার স্বীকৃত হল। এটা (Eta) এবং হিনিন (Hinin)—এই দুই চিরাচরিত সমাজচ্যুত গোষ্ঠী (Traditional outcasts)—সাধারণ মানুষের পরিচিতি পেল। ১৮৭৮-এ জাপানের বিভিন্ন আইনসভা একটি আইনের দ্বারা স্বীকৃত হল। এইভাবেই জাপানে সাংবিধানিক সরকারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৮৮১-তে সম্রাটের একটি যুগান্তকারী ঘোষণায় বলা হল—আগামী ১৮৯০-এর মধ্যে জাপান প্রতিনিধিমূলক আইনসভা দ্বারা শাসিত হবে।

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে জাপানে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে—কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, যোগাযোগ, জনহিতকর কাজ, এমন কি বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই সরকারের ভূমিকা শুধুমাত্র পরোক্ষ উৎসাহদাতা হিসাবেই ছিল না, বরং প্রত্যক্ষ সংগঠকের কাজে নিযুক্ত ছিল। এমনকি, নতুন কৃৎকৌশলের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকার সক্রিয় ছিল। এখন আমরা মেইজি শাসনকালে জাপানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এ সম্বন্ধে সরকারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো।

১.৯. অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতি

১.৯.১ ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষির অগ্রগতি

তোকুগাওয়া শাসনের ভূমিব্যবস্থার মত মেইজি শাসনকালে জাপানের ভূমি ব্যবস্থা ইয়োরোপের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন ছিল। জাপানে এই সময়ে মালিকের জমি যুগ্ম (Joint) ও বাধ্যতামূলকভাবে চাষ করার প্রথা ছিল না। এছাড়া জাপানের সাধারণ কৃষকদের ক্ষেত্রে—সর্ব্বজনীন আইনের জটিলতা ছিল না। অর্থ এই নয় যে, জাপানে ঐ সময়ে কৃষকরা তাদের কৃষিকার্যের ব্যাপারে নিজেদের মত অনুযায়ী চলতে পারত।

জাপানি কৃষককে কেন্দ্রীয় শাসক এবং কৃষক যে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত, তাদের নিয়ম মেনে চলতে হত। এ সত্ত্বেও লক্‌উড্‌ (Lockwood) এর মতে, ইউরোপীয় দেশগুলির কৃষিতে কর্মরত ক্রীতদাসের মত জাপানী কৃষকদের অবস্থা ছিল না। মেইজি শাসনকালে সরকার কৃষকদের আরও অনেক সুবিধা দিয়ে এই সামাজিক অবস্থা আরও জোরদার করেছিলেন। কৃষকরা তাদের নিজেদের চাষ করা জমির মালিক হয়েছিলেন। মেইজি শাসনকালে কৃষকরা কি ধরনের শস্য উৎপাদন করবেন, জমি বিক্রয় করে শহরে চলে আসবেন কিনা—এ সব বিষয়েই তাঁদের সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা ছিল।

মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে ডায়মিয়ো (daimyo) ক্ষমতাচ্যুত হলে সরকার কর্তৃক তাদের অবসর ভাতা (Pension) ধার্য করা হল। যারা আগে সামন্ততান্ত্রিক মালিকদের কর দিত, তারা নতুন ব্যবস্থায় জমির মালিক হয়েছিল। তাই মেইজি শাসনকালে বিভিন্ন শ্রেণির জমির মালিকের সৃষ্টি হল। অবশ্য বেশির ভাগ জমির মালিকদের জমির পরিমাণ সামান্যই ছিল। জমির এই মালিকরা কৃষিতে নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগে এবং স্থানীয় শিল্পোন্নয়নে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরে এই সমস্ত কাজ সরকার দ্বারা নিয়োজিত কর্মীদের বা সমবায় সংগঠনের দ্বারাই সাধিত হত।

কৃষিতে উন্নয়নের নেতৃত্ব প্রধানত সামুরাই-এর একটি বিশেষ শ্রেণি এবং সরকারের দিক থেকেই এসেছিল। এর কারণ আলোচনা করলে দেখা যায়, দেশের অর্থনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে সামুরাই-এর এক সামান্য অংশকেই কৃষিকাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। তাই অন্যরা, শিল্প ও বাণিজ্যে নিজেদের নিযুক্ত করায় উদ্যোগী হয়েছিল। যেমন মেইজি যুগে, তেমনি পরে, জাপানে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি ব্যবস্থাই ক্রমশ উৎকর্ষ লাভের পথে সচেষ্ট হয়েছিল। অবশ্য হোক্কাইডোর (Hokkaido) নতুন উপনিবেশে (Colony) কৃষিক্ষেত্রগুলি তুলনামূলকভাবে আয়তনে বড় ছিল।

সরকার কৃষির উন্নয়নের জন্য বিশেষ কারীগরি সংস্থা গঠন করেছিল—এর কাজ ছিল কৃষিতে কীটনাশক, উন্নত বীজ এবং সার প্রয়োগ করা। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, জাপানের মত ছোট আয়তনের দেশের পক্ষে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক (extensive) চাষ সম্ভব ছিল না। তাই এখানে নিবিড় (intensive) চাষ প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। এই পদ্ধতি মেনে জাপান বিদেশ থেকে আমদানী করা খাদ্যশস্যের পরিমাণ সীমিত রেখেছিল।

১.৯.২. বিভিন্ন শিল্প

বয়নশিল্প-রেশম শিল্প ঃ বয়ন শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে রেশম শিল্পে কৃষি, পারিবারিক, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং আধুনিক রপ্তানী ক্ষেত্র পরস্পর নির্ভরশীলতার সঙ্গে কাজ করতো। এই কারণে এবং আরও একটি কারণে রেশম শিল্পের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল—ইউরোপে। ওই সময়ে ইউরোপে রেশম কীটের একটি মারাত্মক রোগের জন্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর ফলে জাপানের রেশম ও রেশম-জাত দ্রব্যের রপ্তানি ইউরোপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের এই সংকট কেটে যাবার পরও জাপানি শিল্প

ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। মেইজি শাসনে ১৮৭০-এ ফ্রান্স ও ইতালির অনুকরণে রেশম বস্ত্রের কারখানা তৈরি হল। উৎপাদনের কৃৎকৌশল অনেক উন্নত হল। এই শিল্পের প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হল—এটা বিশেষ ভাবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ছিল। এই রেশম শিল্পে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের অতি নিপুণভাবে সংযুক্তি ঘটেছিল (Vertical integration)। এর উন্নয়নে উৎসাহ এবং অর্থের যোগান দিতেন জাপানের ধনী ব্যবসায়ীরা।

কার্পাস শিল্প ঃ অপরদিকে কার্পাস শিল্পের ক্ষেত্রে সুতো আমদানীর পরিমাণ খুবই বেশি ছিল। কারণ দেশীয় সুতোর থেকে ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টারের তৈরি সুতোর দাম অনেক কম ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে পশ্চিমী কৃৎকৌশলে তৈরি প্রথম সুতো কল স্থাপিত হয় এবং সরকার দেশের কার্পাস উৎপাদনকে রক্ষা করতে কার্পাস আমদানির উপর আমদানি শুল্ক বসায়। ১৮৯৬ সালে এই শুল্ক তুলে নেওয়া হয়। এর ফলে কার্পাস আমদানি আবার বৃদ্ধি পায়।

রেশম শিল্প এবং কার্পাস শিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি সাদৃশ্য ছিল—অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে চিরাচরিত পদ্ধতিতে এবং বহির্বিশ্বে রপ্তানীর জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হত।

মস্‌লিন শিল্প ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কয়েকটি মস্‌লিন তৈরির মিল স্থাপিত হয় এবং এর ফলে মস্‌লিন আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়।

পশম শিল্প ঃ অন্যদিকে পশম শিল্প কৃষকদের গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়নি। এখানে কেবলমাত্র উচ্চ মানসম্পন্ন সরকারি চাহিদা মেটাবার জন্যই উৎপাদন করা হত। এই শিল্প দেশের সর্বত্র ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত ছিল না। বরং কতকগুলি ছোট সংস্থাতেই এর কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল।

ধাতুশিল্প ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ধাতুশিল্পে (Metal Industry) জাপানের কৃতিত্ব কম ছিল না। তবুও বয়ন শিল্পের মত এই শিল্পে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ খুব সহজ ছিল না। কারণ এই শিল্পে প্রাচীন ও আধুনিক কৃৎকৌশলের ব্যবধান খুবই বেশি ছিল। এ ছাড়া আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি মূলধনের। তৃতীয়ত, যেখানে প্রাচীন জাপানেও বয়ন শিল্পের একটি অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল, ধাতুশিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য প্রয়োজন ছিল শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন।

বয়নশিল্প এবং ধাতুশিল্পের মধ্যে এই ব্যবধান জাপানের ভারী এবং লঘু শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই জাপানের ভারী শিল্পের উন্নয়ন ঘটেছে অনেক পরে।

আমরা দেখলাম মেইজি শাসনের প্রথম কয়েক বছরে কীভাবে শিল্পের উন্নয়ন ঘটেছিল। কিন্তু ১৮৮২ সালের পরে জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের এই প্রত্যক্ষ ভূমিকায় ছেদ পড়েছিল।

১.৯.৩ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

এতক্ষণ আমরা যে সমস্ত শিল্পের কথা আলোচনা করেছিলাম সেগুলি ছিল ক্ষুদ্র শিল্প। এবার আমরা কয়েকটি বৃহৎ শিল্প উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করব। জাপানে তোকুগাওয়া শাসনের সময় থেকেই লৌহ

ও ইস্পাত শিল্প ক্ষুদ্রায়তনে গড়ে উঠেছিল। মেইজি শাসনকালে ১৮৯৬ সালে সরকারি প্রচেষ্টায় প্রথম লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হল এখানে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। The Yawata Iran Works সরকার প্রতিষ্ঠিত প্রথম লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র।

এর পরে বেসরকারি মালিকানায়—আরও কয়েকটি উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলেও মোট উৎপাদনে তাদের অংশ ছিল সামান্য। এই কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের জন্য জাপানকে আমদানির ওপর নির্ভর করতে হত।

১.৯.৪ জাহাজ শিল্প

১৮৯৬ সালে The Shipbuilding Encouragement Act ছিল জাপানে জাহাজ তৈরির ও মেরামতি শিল্পের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত Shiboura Engineering Works এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলেও এব্যাপারে জাপানকে প্রধানত আমদানীর ওপর নির্ভর করতে হত।

১.৯.৫ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শিল্প

মেইজি শাসনের শেষের দিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শিল্পে বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে খুবই দ্রুত গতিতে উন্নয়ন ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক কয়লা শিল্প তোকুগাওয়ার সময়েই উন্নত হয়েছিল। মেইজি শাসনে কয়লা শিল্পে আধুনিকীকরণ ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় জাপানে এই সময়ে তাম্র শিল্পের গুরুত্বও খুব বেশি ছিল বিশেষ করে তাম্র রপ্তানীর ক্ষেত্রে।

১.৯.৬ কাগজ শিল্প

কাগজ শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নত কৃৎকৌশলের প্রয়োগ এবং প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি একই সঙ্গে প্রয়োগ করা হত।

১.৯.৭. সিমেণ্ট ও কাঁচ শিল্প

সিমেণ্ট ও কাঁচ তৈরির জন্য মেইজি শাসনে আধুনিক কৃৎকৌশলের প্রয়োগ করা হয়।

১.৯.৮. এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

জাপানে লঘু (Light) এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রধানত মেরামতি এবং সংরক্ষণ—এই দুই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সাইকেল তৈরির কাজে এই শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

১.৯.৯ রেললাইন ও দূরভাষ

মেইজি সরকারের রেললাইন এবং দূরভাষ (Telegraph) লাইন তৈরি করার কাজেও উল্লেখযোগ্য

ভূমিকা ছিল। ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকাতে স্থানীয় উৎসাহে ছোট ছোট রেললাইন ধীরগতিতে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু জাপানে সরকারের উদ্যোগে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী রেললাইন তৈরির কাজ দ্রুতগতিতেই সম্পন্ন হয়েছিল।

১.১০ অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রগতি—প্রকৃত মজুরিতে পরিবর্তন

যে কোন দেশের অর্থনীতির মতই জাপানের ক্ষেত্রে এটাই লক্ষণীয় যে, প্রাথমিক স্তরে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরিতে (Real Wage) সামান্যই বৃদ্ধি হয়। শ্রমের বর্দ্ধিত উৎপাদনশীলতার ফলে বর্দ্ধিত বিনিয়োগ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মভূত (absorb) হয়। তাই জাপানে মেইজি শাসনে উন্নয়নের পরবর্ত্তী স্তরেই প্রকৃত মজুরী উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়টি এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্ত্তী পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কাজ চালু করা হয়।

১.১০.১. জীবিকার গঠনে পরিবর্তন

মেইজি শাসনের আমলে বিংশ শতাব্দীতে জাপানে শিল্প ও ব্যবসায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার বিভিন্ন স্তরেও পরিবর্ত্তন এসেছিল। কৃষিকর্মে (Primary Sector) নিযুক্ত জনসংখ্যার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে (Secondary Sector) এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে (Tertiary Sector) নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১.১০.২. বৈদেশিক বাণিজ্য

জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন (মেইজি শাসনে) তার বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তিত ধরনের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৮৮০-র দশকে জাপানের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল চাল, চা, রেশম এবং তাম্র। শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের মোট রপ্তানিতে চাল এবং চায়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যায়। এই সময় কাঁচা রেশম, রেশমজাত দ্রব্য এবং কার্পাস জাত দ্রব্যের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মোট আমদানির ক্ষেত্রে খাদ্য ও পানীয়ের অনুপাতের সামান্যই পরিবর্তন হয়েছিল। অপরদিকে মোট আমদানিতে কাঁচামালের আমদানি খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৮০ থেকে জাপানের বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্য (Balance of Trade) অনুকূল ছিল। এর কয়েকবছর পরে পণ্য বাণিজ্যে (Visible Trade) প্রতিকূল অবস্থা লক্ষিত হয়েছিল।

১৮৯৩-তে জাপানে তৈরি জাহাজ তার মোট রপ্তানির ৭% এবং আমদানির ৯% বহন করতে পারত। বিংশ শতাব্দীতে মেইজি শাসনের কালেই জাপানের জাহাজ দেশের মোট আমদানি ও রপ্তানির প্রায় ৫০% বহন করত। জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—অসম

চুক্তি— (Unequal Treaties) মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঠিক আগেই জাপান এতে সম্মতি জানাতে বাধ্য হয় এবং এর ফলে জাপানকে তার প্রতিকূলে একটি বাণিজ্য-শুল্ক বসাতে বাধ্য করা হয়। এর দ্বারা জাপানকে তার আমদানি শুল্ক কম রাখতে হয়েছিল। তাই দেশের নতুন শিল্পের সংরক্ষণের জন্য জাপানের মেইজি সরকার এদের কম সুদে ঋণ, অর্থসাহায্য, কারিগরি সাহায্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, কাঁচামাল (যা দেশে পাওয়া যেত না) নিঃশুল্ক (Duty Free) আমদানি হিসাবেই আসত। আংশিক ভাবে উৎপন্ন (Semi-manufactured) দ্রব্য কম শুল্কে আমদানি করা হত। সম্পূর্ণভাবে উৎপাদিত দ্রব্য ও বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক বেশি ছিল।

১.১০.৩. অর্থনৈতিক সংস্থা

মেইজি শাসনে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ব্যাঙ্কিং শিল্পের সূচনা হয় এবং নির্দিষ্ট আর্থিক নীতি (Monetary Policy) হাতে নেওয়া হয়। তোকুগাওয়া শাসনে ১৮৬২-তে জাপানে পশ্চিমি ধাঁচে ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। এগুলি ছিল জাতীয় ব্যাঙ্ক এবং সরকারি কোষাগারের (Treasury) সরকারের ঋণপত্রের আমানতের ভিত্তিতে ওই সব ব্যাঙ্কের নোট ছাপাবার ক্ষমতা ছিল। ১৮৭৬-১৮৮০-র মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ১৪৮টি জাতীয় ব্যাঙ্ক অনেক পরিমাণে নোট ছাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়েছিল। ১৮৮১-তে কাউন্ট মাতসুকাটা (Count Matsukata) অর্থমন্ত্রী হওয়ায় তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৮২-তে জাপানে প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য ১৮৮৭-তে The Yokohama Specie Bank প্রধান বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক রূপে কাজ শুরু করে। ঋণ দেবার জন্য দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান The Industrial Bank এবং The Hypothec Bank এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপানের জনগণের ঐচ্ছিক সঞ্চয়কে (Voluntary Saving) বিনিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য The Deposits Bureau of the Ministry of Finance-এর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

তবে জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর্থিক লেনদেনের একটি বাজার গঠন করতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে জাপানের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের নগদ সম্পদের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

১.১০.৪. রাজস্ব ব্যবস্থা

মেইজি শাসনকালে সরকারি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে বলতে গেলে এর পূর্ববর্তী পর্যায়ে জাপানের অবস্থা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

এই সময়ে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাবার কারণ হল—প্রথমত, মেইজি শাসনের প্রথম কয়েকটি বছরে বিদ্রোহ দমন করার জন্য ব্যয়। দ্বিতীয়ত, সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত সামুরাইদের জন্য অবসর ভাতা। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যের জন্য ব্যয়। অপরদিকে, প্রাপ্য রাজস্ব ঠিক সময়ে সরকারের হাতে না পৌঁছনোর জন্য সরকারকে ঋণ এবং নোট ছাপানোর ওপর নির্ভর করতে হয়। ১৮৭০-এ ৯% সুদে ১ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের জাতীয় বণ্ড বাজারে ছাড়া হয়।

এই ১৮৭০ সালেই কৃষি জমির ওপর স্থায়ীভাবে এবং বর্দ্ধিত হারে কর বসানো হয়।

১.১০.৫. মূলধনের গঠন

মেইজি শাসনে কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত কোনভাবেই যাতে অনুৎপাদক (Unproductive) ভোগের দ্বারা বিনষ্ট না হয় এবং মূলধন গঠনের কাজে লাগে, সেজন্য বিভিন্ন সংগঠন স্থাপিত হয়। মেইজি শাসনের প্রথম দিকে কৃষিজাত উদ্বৃত্তকে Productive Investment বা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে পরিণত করা এবং তার সুফল সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল।

১.১০.৬ মেইজি শাসনে শিক্ষার উন্নয়ন

মেইজি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অন্যতম প্রশংসাযোগ্য ভূমিকা ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে। জাপান সরকার বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশে কমিশন পাঠিয়েছিল। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে জাপানী সরকার একটি শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন কমিশন আমেরিকার Massachesetts, এবং Connecticut এ বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা ও জার্মানীর উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং জাপানে খুব শীঘ্রই একটি নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। ১৮৯০-এ কতকগুলি কারিগরী প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়।

১.১০.৭. মেইজি শাসনে বৈপ্লবিক চিন্তার সূত্রপাত

মেইজি শাসনকালে বৈপ্লবিক চিন্তার সূত্রপাত অনেকাংশেই আধুনিক জাপানকে গড়তে সাহায্য করেছিল। মেইজি শাসনের প্রথম দুই দশকে জাপানের জনসাধারণের জীবনে এর একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সামুরাই-এর একটি ছোট পরিবার থেকে আসা শিক্ষাবিদ Fukugawa Yukichi আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর চিন্তাধারা ছিল সংস্কারমুক্ত। Nakamura Masanao-র চিন্তাধারা ছিল আদর্শবাদ ও যুক্তিবাদের মিশ্রণ। এই পরিবর্তিত আবহাওয়ায় জাপানীদের পোষাক, খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা, সংগঠন এবং সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তন খুব সহজে এবং শান্তিপূর্ণভাবে আসেনি। ১৮৭৭ সালে অসন্তুষ্ট সামুরাইরা বিদ্রোহ করেছিল। এ ক্ষেত্রে মেইজি সরকারের দ্বারা নবগঠিত সামরিক বাহিনী বিভিন্ন বিদ্রোহ দমনে সার্থক হয়েছিল।

১.১১. সরকারের সক্রিয় ভূমিকা ও তার অবসান

চিরাচরিত ক্ষেত্রে, যেমন কৃষিতে মেইজি-সরকারের প্রত্যক্ষভাবে মধ্যস্থতা করেনি। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে জাপানের অভিজ্ঞতা পশ্চিমী দেশগুলি থেকে ভিন্ন। ইউরোপের দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখা যায় প্রথমে লঘু শিল্প এবং পরে ভারী শিল্পের উন্নয়ন ঘটেছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রণি ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন অর্থসাহায্য এবং সংরক্ষণের দ্বারা সরকার জাপানে প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে বিচারের মাপকাঠি ছিল জাতীয় স্বার্থ, শিল্পগুলির টিকে থাকার ক্ষমতা নয়। জাপানের এই আধুনিক ক্ষেত্রের উন্নয়ন সেখানকার সামরিক ক্ষমতার চাহিদা অনুযায়ীই হয়েছিল।

মেইজি সরকার শুধুমাত্র শিল্পোন্নয়নের সাংগঠনিক কাঠামো গঠনেই থেমে থাকেনি, ফলদায়ক অর্থনৈতিক

উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন কর এবং সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সরকারের অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

সরকারি ব্যয়ের একটি বড় অংশ সামরিক শাসনের জন্য ব্যয় হত। এর ফলে সামরিক ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটেছিল। সমাজে আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অপেক্ষাকৃত ধনী সম্প্রদায়ের সঞ্চয় বৃদ্ধি হওয়ায় তা অর্থনেতিক উন্নয়নের সহায়ক হয়েছিল।

মেইজি সরকার বিভিন্ন ঋণ অনুমোদন করে এবং শেয়ারের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক বিনিয়োগের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু জাপানে অর্থনৈতিক কাজকর্মের নৈতিকতার দিকটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্যবসায়ীদের কাছে মুনাফাটাই সবথেকে জরুরী ছিল না। জাতীয় স্বার্থ সবার ঊর্দ্ধে ছিল। তাই মেইজি সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল।

মেইজি সরকার তোকুগাওয়া বাকুফুর কাছ থেকে একটি জটিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং একটি আমলাতান্ত্রিক সংগঠন পেয়েছিল, যার দ্বারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ সম্ভব হয়েছিল।

মেইজি সরকার তার নবগঠিত সম্পদের দ্বারা জাপানের পরিবহণ, যোগাযোগ, শক্তি উৎপাদন এবং সামরিক বাহিনীকে উন্নত করেছিল। জাপানের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টিকে থাকতে হলে একটাই রাস্তা ছিল ফুকোকু কায়োহেই (Fukoku Kyohei—rich country, strong army)। অর্থনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশ্যে মেইজি সরকার বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানী করে সেগুলি ব্যবসায়ীদের কাছে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করতো।

প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রেই মেইজি সরকার এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের মধ্যে একটা সাধারণ বোঝাপড়া ছিল। এক্ষেত্রে সরকার দ্বৈত নীতি অবলম্বন করেছিল—আধুনিক ক্ষেত্র, বা সামরিক বাহিনী এবং ব্যবসায়ী সংগঠনকে শক্তিশালী করেছিল আর চিরাচরিত ক্ষেত্র—যা আধুনিক জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

মেইজি সরকার বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে জাপানকে রক্ষা করেছিল এবং দেশীয় শিল্পকে উন্নত করতে সাহায্য করেছিল।

মেইজি পুনপ্রতিষ্ঠার পর থেকে জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্রুতগতি সম্ভব হয়েছিল সরকার এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে।

১৮৮২ সালের পরে মেইজি সরকার শিল্পোয়নের সক্রিয় ভূমিকা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে (যেমন লৌহ ও ইস্পাত) নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। সরকার তার বেশিরভাগ শিল্প-সম্পত্তি খুব সুবিধাজনক দামে বেসরকারি ব্যবসায়ী সংস্থাকে বিক্রয় করে দিয়েছিল। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সংস্থা হিসাবে জাইবাৎসুর (Zaibatsu) নাম খুবই উল্লেখযোগ্য।

১.১২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিফলন

সারণি—১

জাপানের কৃষিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার

সাল	সঞ্চয়ের হার	বিনিয়োগের হার	উদ্বৃত্ত সঞ্চয়
১৮৮৮-৯২	১০.৩	৪.৩	৬.০
১৮৯৩-৯৭	১২.৯	৪.৩	৮.৬
১৮৯৮-১৯০২	১৩.৩	২.৯	১০.৪
১৯০৩-০৭	১০.৯	২.৪	৮.৫
১৯০৮-১২	১১.৮	১.৮	১০.২

সারণি—২

জাপানে জীবিকার গঠন পরিবর্তন (গণনা-হাজার)

	অর্থনৈতিক ক্ষেত্র	১৯১৩	১৯৩০	১৯৪০
(১)	প্রাথমিক ক্ষেত্র—কৃষি, অরণ্য, মৎস্য চাষ, খনিজ	১৬,৪২৬	১৫,০৩৬	১৪,৯৯৮
(২)	মধ্যক্ষেত্র—শিল্প ও নির্মাণকাজ	৪,৫৯৪	৫,৮৫৪	৮,১১৫
(৩)	পরিষেবামূলক কাজের ক্ষেত্র—পরিবহণ, ব্যবসায়, বৃত্তিমূলক কাজ	৫,৪০২	৮,৭২৯	৯,৩৬৫

সারণি—৩

বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ

সাল	রপ্তানী	আমদানী
১৮৮০	৭.৮	১১.২
১৮৯০	১৫.০	২৩.৮
১৯০০	৩১.৯	৪৮.৪
১৯১৩	১০০.০	১০০.০
১৯৩০	১৮৮.৯	১৭৫.১
১৯৩৭	৩৮৮.১	২৫৯.৫

সারণি—৪

প্রকৃত জাতীয় আয়

সাল	মোট জাতীয় আয়	প্রাথমিক ক্ষেত্র	মধ্যক্ষেত্র	পরিষেবামূলক ক্ষেত্র
১৮৭৮	১,১১৭	৬৯১	৯৫	৩৩১

সাল	মোট জাতীয় আয়	প্রাথমিক ক্ষেত্র	মধ্যক্ষেত্র	পরিষেবামূলক ক্ষেত্র
১৮৯০	২,৩০৮	১,৪২৯	২২৪	৬৫৫
১৯০০	৩,৬৪০	১,৬৭১	৮১৮	১,১৫১
১৯১৩	৫,৮০৭	২,৪৯৫	১,১৬৮	২,১৪৪
১৯১৯	৭,৮৮৯	৩,০১১	২,০২১	২,৮৫৭
১৯২০	৬,৩১৬	২,১৪৭	১,৬৮৬	২,৪৮৩
১৯২৯	১০,৯৬২	২,৭৪০	২,৯১১	৫,৩১১
১৯৩০	১২,৭১৫	২,৪৭৭	৩,৫৫০	৬,৬৮৮
১৯৩৬	১৬,১৩৩	৩,১৪৯	৫,০৯৬	৭,৮৮৮

১.১৩. মেইজি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

যদিও মেইজি শাসনে জাপানে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তবুও কয়েকটি ক্ষেত্রে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ছিল—সেগুলি হল—(১) জমি কর (২) সামুরাইদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা কমানো (৩) জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা।

মেইজি শাসনে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরা প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের অধীনে ছিল। এই কারণে বিভিন্ন সময়ে জাপানে যদিও অনেক পরিবর্তন এসেছিল তবুও হিংসাত্মক সামাজিক আন্দোলন ঘটেনি, প্রত্যেক সহযোগী শাসকই নিজের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করেছিল। এই অবস্থায় মেইজি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খুব কার্যকরী হয়নি।

১.১৪. অনুশীলনী

কয়েকটি টীকা লিখুন

ফুজিওয়ারা (Fujiwara) [উত্তর ১.২]

বাকুফু (Bakufu) [উত্তর ১.২]

তোকুগাওয়া (Tokugawa) [উত্তর ১.৩]

শোগুন (Shogun) [উত্তর ১.২]

মেইজি (Meiji) [উত্তর ১.১]

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ—

১। তোকুগাওয়া কি? [উত্তর ১.২]

২। সামুরাই কাকে বলে? [উত্তর ১.২]

৩। শোগুন কী ? [উত্তর ১.২]

৪। বাকুফু কি? [উত্তর ১.২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

১। শোগুন-এর পতনের কারণ কী ? [উত্তর ১.৪]
২। মেইজি শাসনে জাপানের বিভিন্ন বয়ন শিল্পের আলোচনা করুন [উত্তর ১.৩]
৩। মেইজি শাসনে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ দিন। [উত্তর ১.৯]
৪। মেইজি শাসনের বিরুদ্ধে কী কী প্রতিবাদ ছিল ? [উত্তর ১.১২]

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

১। মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন। [উত্তর ১.৮ ও ১.৯]
২। মেইজি শাসনে জাপানের ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষির অগ্রগতি আলোচনা করুন। [উত্তর ১.৮]
৩। মেইজি শাসনে জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য ও রাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণ দিন। [উত্তর ১.৯]

একক ২ ☐ জাইবাৎসু

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা
২.২ গঠন ও পরিচিতি
২.৩ আভ্যন্তরীণ সংগঠন
২.৪ বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাইবাৎসুর ভূমিকা
২.৫ জাইবাৎসুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ
২.৬ অস্তিত্বের সংকট ও জাইবাৎসুর বর্তমান ভূমিকা
২.৭ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টীকা
২.৮ অনুশীলনী
২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১. প্রস্তাবনা—ঐতিহাসিক পটভূমিকা

এবার আমরা জাপানের বেসরকারি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উদ্যোক্তা জাইবাৎসু (Zaibatsu) সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

মেইজি শাসনের প্রথম অবস্থায় জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে বিষয়ে আমরা আগেই জেনেছি। কিন্তু উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মেইজি সরকার অর্থনীতির অনেকগুলি ক্ষেত্রেই সক্রিয় ভূমিকা থেকে বিদায় নিয়েছিল। সরকারি ক্ষেত্রে ছিল—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, অস্ত্র নির্মাণ, রেল, কতকগুলি জনহিতকর কাজ, বনসম্পদ এবং সরকারের একচেটিয়া শিল্প, যেমন—লবণ, তামাক, কর্পূর প্রভৃতি। বাকী সবই ছিল বেসরকারি ক্ষেত্রে।

জাপানের মেইজি শাসনে বেসরকারি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংগঠনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জাইবাৎসু বা অল্পসংখ্যক বড় ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত সংগঠন। জাপানের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর এদের নিয়ন্ত্রণ ছিল ব্যাপক।

জাপানে কয়েকটি ব্যবসায়ী পরিবার ছিল, যারা ঊনবিংশ শতকের কয়েক দশক ধরে অথবা শতাব্দী ধরে ব্যাঙ্কিং শিল্পে এবং বাণিজ্যে গভীরভাবে নিযুক্ত ছিল। এরা ডায়মিয়োর প্রতিনিধিরূপে তাদের রাজস্বের তত্ত্বাবধান করতো। এদের সঙ্গে সামুরাই শ্রেণির কয়েকটি পরিবার সরকারের অর্থনৈতিক নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব নিয়েছিল। জাপানে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ এই ব্যবসায়ী সংগঠনেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

২.২ গঠন ও পরিচিতি

জাইবাৎসুর মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে মিৎসুই (Mitsui)। এরা সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ব্যাঙ্কিং শিল্পে এবং ব্যবসায়ে ছিল। তোকুগাওয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এরাই অর্থের যোগান দিয়েছিল। তাই মেইজি সরকারের সঙ্গে প্রথম থেকেই এদের সম্পর্ক ছিল গভীর। বিনিয়োগকারী এবং বাণিজ্যিক পুঁজিপতি থেকে এদের শিল্পপণ্য উৎপাদনকারী পুঁজিপতিতে রূপান্তর ঘটেছিল। এরা প্রধানত কয়লা, বয়নশিল্প, ধাতব শিল্প, যন্ত্রপাতি উৎপাদন, কাগজ, চিনি, জাহাজ তৈরি প্রভৃতিতে অর্থ বিনিয়োগ এবং সংগঠকের কাজ করতো।

মিৎসুই-এর পরেই মিৎসুবিশি (Mitsubishi) ও সুমিটোমোর (Sumitomo) নাম উল্লেখ করা যায়। মিৎসুবিশি ১৮৭৪-এ ফরমোজা আক্রমণের সময় সৈন্য পরিবহণ এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগানের জন্য অর্থ সরবরাহ করতো। ক্রমশ এই সংস্থা জাহাজ তৈরির শিল্পে সরকারের সহযোগিতায় কাজ করেছিল। এছাড়া সামুদ্রিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বীমা ব্যবসা, খনিজ শিল্প ও সুদের ব্যবসাতে প্রধান বিনিয়োগকারী রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। জাপানের নাগাসাকিতে এই সংস্থাই একটি জাহাজ ঘাঁটি এবং জাহাজ মেরামতের কারখানা তৈরি করেছিল। সুমিটোমো প্রথম তাম্র খনি সংক্রান্ত ব্যবসা শুরু করে। তারপর অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী রূপে কাজ শুরু করে।

ইয়াসুদা (Yasuda) প্রধানত ছিল একটি ব্যাঙ্কিং গোষ্ঠী (Banking Combine)।

প্রত্যেকটি ব্যবসায়ী সংগঠনই ব্যাঙ্কিং শিল্পে সহায়তা করতো। এর ফলে ব্যাঙ্ক ঋণের যোগান এবং ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জাইবাৎসু জাপানের শিল্প, বাণিজ্যকেই নিয়ন্ত্রণ করতো। এইভাবে প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতা জাইবাৎসুর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। জাপানে সংগঠিত অর্থের বাজারের অভাব থাকায় মেইজি শাসনে জাপানের আধুনিক শিল্প জাইবাৎসু-র ওপর মূলধনের যোগানের ব্যাপারে নির্ভরশীল ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিৎসুই ছোট ছোট উৎপাদকদের সম্বন্ধেও আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। শুধু ঋণই নয়, এদের কারিগরী সাহায্যও দেওয়া হত।

২.৩. আভ্যন্তরীণ সংগঠন

এখন জাইবাৎসুর আভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। প্রতিনিধি স্থানীয় জাইবাৎসু (Typical Zaibatsu) হচ্ছে প্রধানত একটি পরিবার। এরা জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারের বিধি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল এবং এর ফলে এই পরিবার নিজের ভাঙ্গন এড়াতে সক্ষম হয়েছিল। পরিবারের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগের মত (Hierarchy) পুরানো প্রথা, নেতৃত্ব এবং অধীনত্ব—এ সবই মেইজি শাসনে জাইবাৎসুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন—মালিকানা পরিবারের (Ownership Family) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সংগঠনের পরিচালনায় অনেক সময়ই বেতনভুক কর্মচারী বা শাসক নিয়োগ করা হত। এই পরিচালকদের বলা হত বান্টো (Banto)। বান্টোদের জাইবাৎসুদের পরিবারের সভ্য করার প্রথাও চালু ছিল।

২.৪. বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাইবাৎসুর ভূমিকা

জাইবাৎসুরা কিন্তু একই পরিচালকবর্গ ও কর্মীদের দ্বারা বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাতে (Trust) নিযুক্ত ছিলেন না। এরা সাধারণভাবে ব্যবসায়ীদের জোটও (Combine) ছিল না। শিল্প-সংগঠক হিসাবে এই দুটি এক নয়, পৃথক সংস্থা। একটি সত্যিকারের ট্রাস্ট-এর বৈশিষ্ট্য এই যে সে সব প্রতিযোগিতা দূর করে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে চায়। কিন্তু একটি সত্যিকারের জাইবাৎসুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—একটি পরিবারের ক্ষেত্রে, অগাধ সম্পত্তির কেন্দ্রীভবন। এই অর্থ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য নিয়োজিত হয়। মিৎসুই এবং মিৎসুবিশির আয়তন যে এত বৃহৎ হয়েছিল, তার কারণ, এরা বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এরা কখনই একটি বিশেষ ধরনের বাজারের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

জাইবাৎসু জাপানের মূলধন গঠনে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। শুধু তাই নয়, নতুন কারীগরী কৌশল উপস্থাপনাতেও তারা অগ্রণি ভূমিকা নিয়েছিল। জাইবাৎসু প্রায়ই পরস্পর সম্পর্কিত শিল্পে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে অংশত জাতীয় স্তরে (Semi National Level) পরিকল্পনা গঠন করতো। এক্ষেত্রে তারা স্বাধীন পরিকল্পনা গ্রহণ না করে সরকার অনুসৃত পরিকল্পনা মতই কাজ করতো।

২.৫. জাইবাৎসুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ

জাইবাৎসুর হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটলেও এবং তাদের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকলেও জাইবাৎসু কিন্তু তর্কের ঊর্দ্ধে ছিল না। জাইবাৎসু ছাড়া ক্ষমতার অন্যান্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল সৈন্যবাহিনী। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সৈন্যবাহিনী ক্ষমতায় এলে পুরোনো জাইবাৎসুদের সঙ্গে এর বিরোধ হয়। এই সময়ে নতুন ব্যবসায় সংগঠন আসে।

জাপানে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মালিকরা অর্থ সরবরাহের জন্য জাইবাৎসুর মত বড় শিল্পপতি, বড় ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার কাছে নির্ভরশীল হলেও বিভিন্ন সময়ে এরা জাইবাৎসুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তও হয়। জাপানে দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তীকালীন সময়ে, (Inter War Period) যখন দেশে সমভোগবাদ বিরোধী চণ্ডনীতির (Fascism) মতবাদ প্রাধান্য পাচ্ছিল সেই সময়ের জাপানের অর্থনীতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ফ্যাসিস্‌ম-এর বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল জাইবাৎসু বা ব্যবসায় পরিবারের বৈশিষ্ট্য—আর্থিক মূলধন এবং শিল্প মূলধনের সংযোগ ঘটিয়ে শিল্পে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করা এবং একচ্ছত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলা—জাইবাৎসুর এই শক্তিশালী সংগঠন গড়তে জাপান সরকার অনেক সাহায্য করেছিল। এই জাইবাৎসু অলিগোপলিষ্ট (Oligopolist) হিসাবে শুরু করে অনেক ব্যবসায় এবং শিল্পকে হোল্ডিং কোম্পানীর (Holding Company) সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করতো।

বিশ্বব্যাপী মন্দার (World Depression or Great Depression) সময়ে এই জাইবাৎসু তাদের মুনাফা

কমে যাওয়াতে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই সময়ে শ্রমিক সংগঠনগুলি তাদের প্রকৃত মজুরী রক্ষা করতে সচেষ্ট হলে জাইবাৎসু রাষ্ট্রের সাহায্যে শ্রমিক সংগঠনের ক্ষমতা খর্ব করেছিল।

অপরদিকে ছোট ছোট শিল্পপতিরা তাদের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য জাইবাৎসুকে দায়ী করেছিল। একদিকে যেমন জাইবাৎসুরা এদের আর্থিক দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করতো, অপরদিকে তেমনি নিজের স্বার্থে শ্রমিকদের সংগঠিত করতো। এই শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী সংগঠনও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল।

২.৬. অস্তিত্বের সংকট ও জাইবাৎসুর বর্তমান ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই স্ক্যাপ (SCAP বা Supreme Commander for the Allied Powers) জাপান থেকে সামন্ততন্ত্র এবং সামরিক শাসনের উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে জমিদারীপ্রথা ও জাইবাৎসুর বিলোপ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু স্ক্যাপ্ এই জাইবাৎসু বিলোপে সফল হয়নি। জাইবাৎসু হোল্ডিং কোম্পানী বা হোন্সা (Honsha)-র সাহায্যে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করতো। জাইবাৎসুকে তার কাজে পেশাদারী শাসনিকরা (Professional Executives বা Banto) সাহায্য করতো। স্ক্যাপ এটাই উপলব্ধি করেছিল যে জাইবাৎসু কেবলমাত্র ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনই ছিল না, এদের দ্বারা জাপানের অর্থনীতির নেতৃত্বও দেওয়া হয়েছিল। জাইবাৎসুকে দুর্বল করে দেওয়ার ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবর্তকের ভূমিকা বান্টো থেকে সরকারি কর্তাদের হাতে চলে গিয়েছিল। ক্রমশ ১৯৫০-এর মধ্যে কয়েকটি জাইবাৎসু—মিতসুই, মিতসুবিশি এবং সুমিটোমো আবার তাদের মধ্যে শিল্প ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পেরেছিলো। তবে ছোট জাইবাৎসুর পক্ষে আগের ক্ষমতায় ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

গায়াকু কোশু (Gyaku-kosu) হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্ত্তী একটি বিপরীতমুখী পদ্ধতি (Reverse Cousre) যার দ্বারা জাপান স্ক্যাপ-এর পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে পুরোনো চিরাচরিত (Traditional) নিয়মে ফিরে যেতে চেয়েছিল। এর মধ্যে জাইবাৎসুও ছিল।

২.৭ অনুশীলনী

কয়েকটি টীকা লিখুন

জাইবাৎসু (Zaibatsu) [উত্তর ২.০]

মিৎসুই ও মিৎসুবিশি (Mitsui and Mitsubishi) [উত্তর ২.০]

হোন্সা (Honsha) [উত্তর ২.৫]

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ—

১। জাইবাৎসু কাকে বলে?

[উত্তর ২.০]

২। জাপানের জাইবাৎসু পরিবারের প্রধান সদস্য কারা?

[উত্তর ২.১]

নীচের প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ—

১। জাইবাৎসুর কাজের বৈশিষ্ট্য কী কী?

[উত্তর ২.০]

২। জাইবাৎসুর ঐতিহাসিক পটভূমি এবং আভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

[উত্তর ২.০—২.২]

৩। বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাইবাৎসুর ভূমিকার বিবরণ দিন।

[উত্তর ২.৩]

২.৮. গ্রন্থপঞ্জী

১। Prof. Amlan Dutta—A Century of Economic Development of Russia and Japan.

২। W. W. Lockwood— The Development of Japan.

৩। Allen—A Short Economic History of Japan.

একক ৩ ☐ চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস—১৯৪৯ সাল থেকে রাষ্ট্রের ভূমিকা—কমিউন

গঠন

৩.০ ১৯৪৯-এর আগের চীনে চিরাচরিত অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য
৩.১ ১৯৪৯-এর চীন
৩.২ আধুনিক চীনের উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য ও নীতি
৩.৩ আধুনিক চীনের অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলির বৈশিষ্ট্য এবং মাওবাদ
৩.৪ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে সহায়ক বিষয়
৩.৫ চীনের বিকল্প উন্নয়ন কৌশল
৩.৬ পরিকল্পনা কৌশল হিসাবে "মহানভাবে অতিক্রান্ত ব্যবধান"
৩.৭ কৃষিকে "প্রথম গুরুত্ব" দেবার কৌশল বা "কৃষিই প্রথম" কৌশল
৩.৮ সম্পদ সম্পর্কিত নিয়ম
৩.৯ কৃষিতে অধিকার সম্পর্কিত নিয়ম
৩.১০ কমিউন্‌স্‌-এর প্রতিষ্ঠার পটভূমি
৩.১১ কমিউন্‌স্‌- কাকে বলে
৩.১২ কমিউন্‌স্‌-এর গঠন
৩.১৩ কমিউনের শাসন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন

৩.০ ১৯৪৯-এর আগের চীনে চিরাচরিত অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

চিরাচরিত বা পুরাতন চীনের অর্থনীতি গ্রামীণ এবং বাজার অর্থনীতির সংমিশ্রণ ছিল। প্রধান শাসন কেন্দ্র ও যোগাযোগ কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত গ্রামীণ এলাকাগুলির মধ্যে বাজার অর্থনীতির যোগসূত্র ছিল। অপরদিকে এই বৃহৎ দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলির সঙ্গে বাজার অর্থনীতির যোগসূত্র ছিল অতি ক্ষীণ। প্রাক্ কমিউনিষ্ট চীনে স্থানীয়, মধ্যবর্ত্তী এবং আঞ্চলিক বাজারের যোগসূত্র ছিল। আধুনিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে শিল্প, ব্যাঙ্কিং, পরিবহণ ও ব্যবসায় ১৯৫২ সালের আগে উল্লেখযোগ্যভাবে গড়ে ওঠেনি।

চীনের কমিউনিজম তার বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের শুরুতে একটি পরিশ্রমী, শৃঙ্খলাবদ্ধ, মিতব্যয়ী জাতিকে পেয়েছিল মানবসম্পদ (Human Resource) হিসাবে যা ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব সম্পদের অন্যতম। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটি শক্তিশালী এবং চলমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব—যা এই মানবসম্পদকে যুগ্মভাবে জাতীয় লক্ষ্য সাধনে নির্দেশিত করেছিল।

☐ **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরবর্ত্তী সময়ে চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা**—১৯৪৫-এর চীনকে বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই সময় চীনের অর্থনীতি ছিল মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং বিচ্ছিন্ন। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো পরস্পর সম্পর্কিত ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপান পরাজয় স্বীকার করলে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী জাপান-অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া দখল করে

এবং এর শিল্পজাত উৎপাদনের দক্ষতা ৫০% নষ্ট করে দেয়। এর ফলে ইস্পাত, বৈদ্যুতিক, খনিজ, যন্ত্রপাতি এবং আরও এই ধরনের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় রাশিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত চীনে কম্যুউনিষ্টদের আধিপত্য চায়নি। এছাড়া রাশিয়া নিজেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ছিল। তাই মাঞ্চুরিয়া শিল্প বিনষ্ট করে নিজে লাভবান হতে চেয়েছিল।

চীনে কমিউনিজম ক্ষমতায় আসার ঠিক আগে মূল্যস্তরে বৃদ্ধি ও অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির (Hyper Inflation) ফলে উৎপাদন ও বণ্টন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অপরদিকে ক্রমবর্ধমান সরকারি ব্যয় মেটাতে নোট ছাপানোর পরিমাণ খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা আরও অনুভূত হয়। অপরদিকে পরিবহণ এবং বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে দেশের সব অংশে বিভিন্ন দ্রব্যের যোগান, চাহিদা অনুযায়ী ছিল না। এটিও মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতার অন্যতম কারণ ছিল।

৩.১ ১৯৪৯-এর চীন

বর্তমান চীনের আধুনিকীকরণ শুরু হয় ১৯৪৯-এর পরে। এর ফলে ১৯৪৯-এর পরে চীনের অর্থনৈতিক গঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়। চীনের নতুন কম্যুউনিষ্ট সরকার ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত যে শিল্পগুলি আগেই ছিল, তাদের পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত ছিল।

এর ফলে তুলনামূলকভাবে কৃষির স্থান ১৯৩৩ থেকে ১৯৫২ এর মধ্যে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) ৬০% থেকে ৫০% এ কমে গিয়েছিল। অপরদিকে, আধুনিক শিল্প, নির্মাণকাজ, আধুনিক পরিবহণ, যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের উদ্যোগে মাঞ্চুরিয়া, উত্তর চীন এবং সাংহাইতে শুধু আধুনিক শিল্পই গড়ে ওঠেনি, এর পাশাপাশি অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্র এবং রেলপথ-রাস্তা উন্নয়নের সমন্বয় (Coordination of Rail-Road) ঘটেছিল।

একথা আংশিক ভাবে সত্য যে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (GDP) শিল্পজাত দ্রব্যের অংশ বৃদ্ধি পাওয়াতে সাধারণ মূল্যস্তরে তার প্রভাব পড়েছিল। কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদার চেয়ে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়াতে এর দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৫২ সালের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের গঠন (GDP) থেকেই বোঝা যায়, ঐ সময়েও চীনের অর্থনীতি অনেকটাই অনুন্নত ছিল, যদিও তাকে নিশ্চল (Stagnant) অর্থনীতি কোনওক্রমেই বলা যায় না।

ঐ সময়ে শিল্পোন্নয়ন ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিল। ১৯৩৯-এ জাপান-অধিকৃত চীনের উৎপাদন মূল্য চীন দেশের জাপান-অনধিকৃত অংশের থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে ওই উৎপাদন হ্রাস পায়। যুদ্ধোত্তর চীনে উৎপাদন আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করলেও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এর ফলে শিল্প এবং পরিবহণ আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য ১৯৪৯ সালে চীনে কম্যুউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন দ্রুতগতিতে হয়। তবুও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়নি। এমনকি মাথাপিছু উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছিল। তাই যুদ্ধোত্তর চীনের অর্থনীতিতে সাংগঠনিক পরিবর্ত্তন এলেও সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেভাবে ঘটেনি।

৩.২ আধুনিক চীনে উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য ও নীতি

লাল চীনে (Red China) সামাজিক রূপান্তরের সম্পূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা Yenan Strategy বা Yenan Model নামে পরিচিত। এই উন্নয়নের নীতি কৌশলে (Strategy) মানুষকে সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৪৯-এর পরে সামরিক এবং রাজনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য দূর করে লাল চীন বা স্বাধীন চীনের আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি করা হয়।

৩.৩ আধুনিক চীনের অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলির বৈশিষ্ট্য এবং মাওবাদ

মাও-সে-তুং (Mao-Tse-Tung) ঘোষিত আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে এবং আদর্শ মানব সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে, চীনের অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলি বোঝা অসম্ভব।

মাওবাদের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে গণ্য করা। যদি কোন মানুষকে সঠিকভাবে চালনা করতে হয় এবং তার ভেতরের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করতে হয়, তাহলে সেটা মাওবাদের দ্বারাই সম্ভব। কোন মানুষের মনে যদি কমিউনিজমের প্রতি আস্থা বদ্ধমূল হয়, তাহলে আদর্শ সংগঠনের সাহায্যে সে দেশের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে। এই কম্যুউনিষ্ট মানবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হবে আত্মকৃচ্ছসাধন। এর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নতুন কোন কিছুর পরীক্ষায় তার অদম্য উৎসাহ এবং ইচ্ছা। অবশ্য এ বিষয়ে কোন দ্বিমত ছিল না যে দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিটি অর্থনৈতিক কর্মে পেশাদারী মনোভাব, কৃৎকৌশলের অগ্রগতি, উন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং জটিল যন্ত্রপাতি—এ সমস্তই অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। অবশ্য উন্নয়নের লক্ষ্য কেবলমাত্র জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বা ক্ষমতার বৃদ্ধি নয়। বরং একটি বিরামহীন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা যেখানে পদমর্যাদা এবং আয়ের পার্থক্য ক্রমশ দূর করা সম্ভব।

৩.৪ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সহায়ক বিষয়

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পদ বন্টন ও তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট বন্টনের জন্য মাও-সে-তুং-এর মতে তিনটি পথ উল্লেখযোগ্য—বাধ্যতামূলক (Coercive) বা দমনমূলক, আদর্শমূলক (Normative) এবং লাভজনক (Remunerative) পন্থা। এর মধ্যে কেবলমাত্র শেষেরটিই হচ্ছে অর্থনৈতিক অস্ত্র। এই তিনটি উপায়ের গুরুত্ব তিনটি বিভিন্ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

প্রথম ধরনের পরিকল্পনাটি হচ্ছে একটি শুদ্ধ বাজার অর্থনীতির (Pure Market Economy) পরিকল্পনা, যেখানে (১) সম্পদের বন্টন গৃহস্থের পছন্দমত (Consumer's Preference) হয়, (২) মূল্য ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পদ নিয়োজিত হয় এবং (৩) যেখানে পরিকল্পনার কাজটি—সম্পাদন করার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির সমাজতন্ত্র গঠন করা উদ্দেশ্য হলেও এটি বাজার ভিত্তিক। এর বৈশিষ্ট্য হল—(১) উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ এবং সব শিল্প সরকারের অধীনে থাকে, (২) পরিকল্পনাটি প্রস্তুতকারকদের

পছন্দ অনুযায়ীই হয় এবং (৩) সম্পদের ক্ষেত্রগত বন্টন বাজারদরের সাহায্যেই হয়, এতে পরিকল্পনা প্রস্তুতকারকের পছন্দকে কাজে পরিণত করতে হলে তা বাজারের মাধ্যমেই করতে হবে। এছাড়া (৪) বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পুরস্কারের মাধ্যমে পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করা হয় (Remunerative বা Incentive)।

তৃতীয় ধরনের পরিকল্পনাতে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে সম্পদের ক্ষেত্রগত বন্টন হয় যাকে বলে কর্তৃত্বমূলক অর্থনীতি। এর বৈশিষ্ট্য (১) পরিকল্পনা প্রস্তুতকারকের পছন্দের (Preference) প্রাধান্য। (২) অর্থনীতিতে সম্পদের ক্ষেত্রগত বন্টন বাজার অর্থনীতি বা বাজারমূল্যের সাহায্যে হয় না, সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়।

মাও-এর মতে তৃতীয় ধরনের পরিকল্পনাটি হচ্ছে কমিউনিষ্ট চীনের পক্ষে সব থেকে উপযোগী। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যে প্রয়োজন—(১) সম্পদের সুযোগ্য ব্যবহারে পেশাদারদের এবং কারীগরী দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভূমিকা (২) উৎপাদনের উপাদান, উৎপাদিত দ্রব্য, সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাজারের ভূমিকা (৩) কি ধরনের মজুরী ব্যবস্থা চালু করতে হবে, (৪) কাম্য বিনিয়োগের হার এবং (৫) "লাল" (Red) চিহ্ন "দক্ষতা" (Experts)—এদের মধ্যে সতত-বর্ত্তমান বিতর্ক।

১৯৪৯-এর পরেই মাও এর আদর্শ ভিত্তিক পরিকল্পনা (Ideological Planning) এবং অন্যান্য বড় বড় নেতাদের বাস্তববাদী পরিকল্পনার (Practical Planning) মধ্যে প্রায়ই বিতর্ক উপস্থিত হোত যে, কোনটা বাস্তবে গ্রহণযোগ্য। চীনে এই প্রশ্ন সবসময়ই ছিল—যে লাল সেনা দেশে কমিউনিষ্ট বিপ্লবে জয়ী হোল, সেই লাল সেনার হাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব দেবার বিষয়ে কেন বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল।

৩.৫ চীনের বিকল্প উন্নয়ন কৌশল

১৯৪৯ সাল থেকে চীনের নীতি-নির্দ্ধারণ কমিটি এবং পরিকল্পনাকারকরা তিনটি বিকল্প উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে এসেছেন—

(১) ১৯৪৯-৫৩ সাল পর্য্যন্ত চীনের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনই ছিল কমুউনিষ্ট নেতাদের প্রধান কাজ।

(২) ১৯৫৩-৫৮ পর্য্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে স্ট্যালিনের কৌশল (A 'Stalinist Strategy') গ্রহণ করা হয়।

(৩) ১৯৫৮-৬০ "মহানভাবে অতিক্রান্ত ব্যবধান" বা "লম্বা দৌড়" (Great Leap)- এর কৌশল নেওয়া হয়।

(৪) ১৯৬১ সাল থেকে "কৃষিকে প্রথম গুরুত্ব" দেবার কৌশল বা "কৃষিই প্রথম" (Agriculture First Strategy) কৌশল গ্রহণ করা হয়।

পরিকল্পনার এই কৌশলকে আবার সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চ হার,

(২) বিশেষভাবে শিল্পের উন্নয়ন, (৩) শিল্পের মধ্যে মূলত ভারী শিল্পের উন্নয়ন (৪) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উচ্চহার, (৫) কৃষির বিনিময়ে শিল্পের উন্নয়ন (৬) কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সাংগঠনিক পরিবর্তন (৭) শিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধন প্রধান (Capital Intensive) উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ।

এ সবেরই একটা উদ্দেশ্য ছিল—কত কম সময়ে এবং কত তাড়াতাড়ি চীন এবং পৃথিবীর অন্যান্য শক্তির মধ্যে শিল্পশক্তি, সামরিক শক্তি এবং রাজনৈতিক শক্তির ব্যবধান কমানো যায়। এই পরিকল্পনায় কারীগরীদক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

৩.৬ পরিকল্পনা কৌশল হিসাবে "মহানভাবে অতিক্রান্ত ব্যবধান"

প্রথম পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীন অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করলেও কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের হারে খুবই ব্যবধান ছিল। কৃষিতে খাদ্যশস্য এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। চীনা নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন যে সোভিয়েট উপযোগী পরিকল্পনা চীনের পক্ষে আদর্শ পরিকল্পনা ছিল না। এজন্য ১৯৫৮ সাল থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চীনে গ্রেট লিপ (Great Leap) কৌশল নেওয়া হয়।

এই গ্রেট লিপ কৌশলকে নার্কস্-এক্কাউস্ (Nurkse-Eckaus) কৌশলও বলা হয়। নার্কস্-এর মতে, অর্ধোন্নত দেশে উদ্বৃত্ত শ্রমকে মূলধনে পরিণত করা যায়—গ্রেট লিপ তত্ত্বেও এটি একটি স্বীকার্য্য বিষয় (Assumption)। অপরদিকে দ্বৈত কৃৎকৌশলের দ্বারা কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন করে উৎপাদন সর্বাধিক করা—এক্কাউসের এই ধারণাও এই পরিকল্পনা কৌশলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই (১) কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমকে ব্যাপকভাবে—কাজে লাগানো এবং (২) কৃষি ও শিল্পে দুই ধরনের কৃৎকৌশলের প্রয়োগ—এই দ্বৈত ব্যবস্থা—গ্রেট লিপের দুটি মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালের পরেই চীনে ভীষণভাবে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হয়েছিল এবং এর ফলে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এই সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে শাসক মাও-এর উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে চীনকে সোভিয়েট-প্রভাব মুক্ত করা যায়—এবং কিভাবে চীনকে অনুন্নতির দুষ্ট চক্র (Vicioul Circle) থেকে মুক্ত করা যায়।

৩.৭ কৃষিকে "প্রথম গুরুত্ব" দেবার কৌশল বা "কৃষিই প্রথম—" কৌশল

১৯৬১ সালে চীন সরকার এই নতুন কৌশলের কথা ঘোষণা করে ১৯৬২ থেকে এটিকে কাজে পরিণত করা শুরু করে। অর্থাৎ কৃষির কৃৎকৌশল-জাত রূপান্তর শুরু হয়। এর গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাগুলি ছিল—

(১) যে সমস্ত শিল্প কৃষিকে সাহায্য করে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া

(২) প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগের হার হ্রাস করা এবং

(৩) কৃষিক্ষেত্র ও অ-কৃষিক্ষেত্র উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকমের আর্থিক ও প্রকৃত অনুদানের (Monetary and Real) ব্যবস্থা করা।

চীনে "গ্রেট লিপ" এর পরিকল্পনা আদর্শবাদকে প্রধান স্থান দিয়েছিল। কিন্তু "এগ্রিকালচার ফার্ষ্ট" বা "কৃষিই প্রথম"-এর নীতি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছিল।

কৃষির এই সর্বাধিক প্রাধান্য (Agriculture First) এবং কমিউনিষ্ট সরকারের আত্মপ্রত্যয়—এই যুগ্ম

সক্রিয় পরিকল্পনার ফলস্বরূপ দেখা যায় কৃষিতে বিনিয়োগের বৃদ্ধি, রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, জলসেচের জন্য পাম্প, কৃষির অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এবং গ্রামীণ বিদ্যুৎ—এ সবকিছুর ব্যবস্থা হয়েছিল। ষাট-এর দশকে অনেক প্রত্যয়ের সঙ্গে বাস্তবে বিভিন্ন উৎসাহদানের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য মাও এই ধরনের নীতির বিরোধিতা করেন, কারণ এর ফলে গ্রামে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য বৃদ্ধির দ্বারা ধনতন্ত্রের প্রাধান্যই বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশঙ্কা করেন। এর ফলে বাজার দর ও বাজার দ্বারা নির্ধারিত মজুরীর গুরুত্ব বাড়বে এবং জনসাধারণের মধ্যে শোধনবাদী (Revisionism) মনোভাবের সৃষ্টি হবে বলে তিনি মনে করতেন। কমিউনিষ্ট চীনে "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" (Cultural Revolution) সূচনার প্রাক্কালে এই ধরনের বিভিন্ন প্রতিকূল সম্ভাবনার গুরুত্ব খুব বেশি ছিল।

চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সম্পদের ক্ষেত্রগত বন্টন নীতির কোন পরিবর্তন ঘটায়নি। তবে এই বিপ্লব পরিকল্পনায় বাস্তব লাভের গুরুত্ব—অপেক্ষা আদর্শবাদকেই (মাও-এর মতবাদ অনুসারে) প্রাধান্য দিয়েছিল।

১৯৪৯-১৯৭৫ এর মধ্যে চীনের অর্থনৈতিক নীতির বিবর্ত্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সম্পদের ক্ষেত্রগত বন্টন, অর্থনৈতিক নীতির চরিত্র, পরিকল্পনার রূপদানের নীতি—এ সমস্ত ক্ষেত্রেই উন্নয়নের কৌশলের (Development Strategy) পরিবর্তন ঘটেছে।

৩.৮ সম্পদ সম্পর্কিত নিয়ম

চীনে ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের ফলে সম্পদের ক্ষেত্র, অর্থনৈতিক সংগঠন এবং আয়ের বন্টনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল। এই কাজে কমিউনিষ্ট পার্টি তার বাহিনী (Cadre) এবং সৈন্যদের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরে সম্পদের বড় বড় বেসরকারি মালিকানা ধ্বংস করে দিয়েছিল। এর ফলে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে সরকারি ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরিত হয় এবং কম্যুউনিষ্ট সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৩.৯ কৃষিতে অধিকার সম্পর্কিত নিয়ম

আধুনিক চীনে কৃষিতে তিন ধরনের অধিকার স্বত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছিল—রাষ্ট্র, সমবায় এবং বেসরকারি।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫২-এর মধ্যে কৃষি জমির ৪৫ শতাংশ ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ কৃষি পরিবারের মধ্যে পুনর্বন্টন করা হয়েছিল। একই সময়ে অনেক উৎপাদক সমবায় (Producers' Cooperatives) গঠিত হয়েছিল। এর একটাই কুফলের সম্ভাবনা ছিল। সেটা হচ্ছে, জমির পুনর্বন্টনের দ্বারা একশ্রেণির কৃষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল এবং এতে কমিউনিষ্ট সরকারের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯২০-র দশকে লেনিন যখন নতুন অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগ করেছিলেন, তখন 'কুলক' শ্রেণির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল (New Economic Policy বা NEP)।

এই সব কারণে ভূমি সংস্কারের কাজ শেষ হবার পরেই চীনের কমিউনিষ্ট সরকার কৃষিতে উৎপাদক-সমবায় (Producers Cooperative) গড়ে তুলেছিল। এর ফলে জমির আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। উৎপাদক সমবায়ের একটি সাধারণ সংগঠক

ছিল 'পারস্পরিক সাহায্যের জন্য কর্মীদল' (Mutural Aid Teams)। ক্রমশ কমিউনিষ্ট ক্যাডারের দ্বারা এই অস্থায়ী সমবায়কে প্রায় স্থায়ী সমবায় (Three Season Mutual Aid Team) কাঠামোয় পরিণত করা হয়েছিল। পরবর্ত্তী পদক্ষেপ ছিল সর্বসময়ের জন্যে কৃষি-উৎপাদকের সমবায় গঠন করা (Permanent Mutual Aid Team)।

অবশ্য চীনে কমিউনিজ্‌মের প্রথম দিকে ব্যক্তিগত মালিকানায়ও কিছু জমি ছিল। এদের সঙ্গে যৌথ খামারের মালিকদের শ্রম এবং জৈব সার বিষয়ে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হত। এই কারণে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৫৮ থেকে "মহানভাবে অতিক্রান্ত ব্যবধান" (Great Leap) এবং কমিউনিজম্‌-এর অগ্রগতির ফলে সমস্ত বেসরকারি কৃষি জমির অধিকার অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। চীনে কমিউনিজ্‌ম-এর প্রথম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কমিউন্‌স্‌ (Communce) এবং তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

৩.১০ কমিউন্‌স্‌—এর প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৯৫৮ সালে গৃহীত "মহানভাবে অতিক্রান্ত ব্যবধান" বা Great Leap-এর এক গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল কমিউন্‌স্‌। এই পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য—শ্রমসম্পদের ক্ষেত্রগত বন্টন এবং কাম্য প্রয়োগ—এর পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় স্তরে কিছু প্রশাসনিক এবং বন্টনগত কাজ সম্পাদন করার জন্য সাংগঠনিক সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। এই সময়ে যৌথ খামারগুলির আয়তন প্রয়োজনের তুলনায় ছোট আকারের ছিল। এদের পক্ষে কয়েক হাজার শ্রমিককে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় কমিউনস্‌-এর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১১ কমুউন্‌স্‌ কাকে বলে

কমিউন্‌স্‌ হচ্ছে বড় বড় কৃষি-উৎপাদন কেন্দ্র। ১৯৫৮-এর শেষের দিকে কমিউনিজ্‌মের জোয়ারের সময় গড়ে ওঠা এক একটি কমিউন্‌-এ ৪৫৫০-টি কৃষি পরিবার ছিল এবং এর জনসংখ্যা ছিল ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০। অবশ্য বিভিন্ন কমিউন্‌-এর আয়তনে পার্থক্য লক্ষ্য করার ছিল। এদের সাধারণ আয়তনে ১,৪০০ কৃষি পরিবার থেকে ৯,৮০০ কৃষি পরিবারও ছিল। এমনকি কয়েকটি ক্ষেত্রে এক একটি কমিউন্‌-এ ১১,০০০ কৃষি পরিবারও থাকতো।

৩.১২ কমিউন্‌সের গঠন

একটি কমিউন্‌ হচ্ছে ২০টি থেকে ৩০টি উন্নত ধরনের কৃষি উৎপাদকদের সমবায় সংগঠনের সংযুক্তি। প্রত্যেকটি কমিউনের সঙ্গেই একটি করে শাসন কেন্দ্র (hsiang) গঠিত হয়েছিল যার সঙ্গে নতুন গড়ে ওঠা নগরের (Township) সাদৃশ্য ছিল। কতকগুলি বৃহৎ কমিউন্‌-এর ক্ষেত্রে সিয়াং-এর (hsiang) ওপরে একটি জেলা-কেন্দ্র (district unit) ছিল। কমিউনের সংগঠনের তিনটি বা চারটি স্তর—কমিউন্‌ কেন্দ্র, উৎপাদন-সম্পর্কিত বাহিনী, উৎপাদক দল। এর মধ্যে দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে আগেকার বড় বড় কৃষি উৎপাদন

সমবায় সংগঠন। তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে আগেকার ছোট ছোট কৃষি উৎপাদন সমবায় সংগঠন। যে সমস্ত কমিউনে চতুর্থ স্তরটি ছিল, সেখানে এই স্তরটি হচ্ছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মিলিত ধরন।

৩.১৩ কমিউনের শাসন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন

কমিউনের সর্বোচ্চ শাসন যন্ত্র হচ্ছে তার সব প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সম্মেলন। এই সম্মেলন (Congress) উৎপাদক দল, সৈন্যবাহিনী এবং যুবক ও স্ত্রীলোকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। এই কংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত শাসক সমিতিতে ডাইরেক্টর এবং ডেপুটি ডাইরেক্টর অন্তর্ভুক্ত। এটিই কমিউনের সর্বোচ্চ শাসনযন্ত্র ছিল। কিন্তু চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর কমিউনের বৈপ্লবিক সমিতিই শাসন করার দায়িত্ব নেয়। প্রথম দিকে কমিউনই সমস্ত জমি, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, পশুখাদ্য এবং অন্যান্য সম্পত্তির অধিকারী ছিল। কিন্তু ১৯৬০-৬১-এর তীব্র খাদ্য সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে শাসকগণ জমির অধিকার কমিউনের নীচুস্তরে হস্তান্তর করে। এই সময়ে বেসরকারি ক্ষেত্রেও কিছু জমি কমিউনিষ্ট সরকারের দ্বারা অনুমোদিত হয়। কমিউনের বিকেন্দ্রীকরণ হয়। অর্থাৎ চীনে কমিউনিজম্ আসার অনেক পরেও ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্তি সম্ভব হয়নি। এই কারণে ১৯৬৬-৬৮-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বারা বিপরীতমুখী ব্যবস্থার (Reverse Process) সূচনা হয়েছিল। এর ফলে বেশিরভাগ কমিউনগুলিতেই বেসরকারি জমি নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯২৮-১৯৩২-এর সোভিয়েট দেশের মত কৃষির এই আমূল সংস্কারে কোন বিরুদ্ধ শক্তিশালী জনমত চীনে ষাটের দশকে ছিল না।

কমিউনের এই বিবর্তনের মূল্যায়ন করলে বোঝা যায়, কোন অবস্থাতেই কমিউন কেন্দ্রীয় সংগঠনের চরম আকার ধারণ করেনি। অবশ্য এই কমিউন্‌রা দুটি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ব্যবস্থার সূচনা করেছিল—একটি হচ্ছে কমিউন্ মেস্ হল (Commune Mess Halls) —এগুলি জনসাধারণের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং কমিউনের সদস্যদের খাদ্যের ভোগব্যবস্থা (Food Consumption) নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ভোগব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধিই পেয়েছিল।

কমিউনের অন্য আর একটি ভূমিকা হচ্ছে—মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা। এটাও একটি উৎপাদন প্রতিরোধী (Counter Productive) ব্যবস্থা ছিল। এর দ্বারা অনেক কমিউন্‌ই আর্থিক মজুরীর পরিবর্তে প্রকৃত মজুরীর ব্যবস্থা করেছিল। মজুরীর এই ব্যবস্থা উৎসাহ দেবার পরিবর্তে শ্রমিকদের নিরুৎসাহই করেছিল কারণ শ্রমিকদের আর্থিক মজুরীর প্রয়োজনও ছিল।

১৯৫৮ সালে কমিউন্ গঠিত হবার পর থেকে তারা অর্থনৈতিক পরিচালন-সংক্রান্ত কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু কৃষি-জনিত অর্থনৈতিক বিপদের সময় থেকে এরা শুধুমাত্র স্থানীয় শাসকের ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়। ক্রমশ কমিউন্ মেস হল এবং মজুরী দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। কমিউনের বিবর্তনের মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, যদিও সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, বাস্তবে কিন্তু তা রূপায়িত হয়নি। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে কমিউন্ গ্রামের বাড়ী বিনষ্ট করে সেই ইঁটের সাহায্যে শ্রমিকদের জন্যে সাধারণ শয়নকক্ষ নির্মাণ করেছিল। স্বামী, স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের জন্যে আলাদা আলাদা থাকার জায়গা ঠিক করেছিল। যদিও এটা সত্য যে, চীনের কয়েকজন কমিউনিষ্ট নেতা এই ধরনের পরিকল্পনা করেছিলেন, জনসাধারণের পরোক্ষ প্রতিরোধে (Passive Protest) তা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। এই ধরনের অবাস্তব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে গিয়ে চীনের নেতারা বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন। তাই কোন সময়েই কমিউনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শাসনের কেন্দ্রিকতা স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

একক ৪ ❐ চীনে সাম্প্রতিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কার

গঠন

৪.০ সংস্কার
৪.১ সংস্কারের তিনটি দিক
৪.২ সংস্কারের বিভিন্ন ক্ষেত্র
৪.৩ আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কার
৪.৪ জনসংখ্যা নীতি
৪.৫ সংস্কারের নঞর্থক দিক
৪.৬ অনুশীলনী ও উত্তর সংকেত [একক ৩ ও একক ৪]
৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ চীনে সাম্প্রতিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কার

ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় ১৯৯১-এর জুলাই থেকে। কিন্তু কমিউনিষ্ট চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় ১৯৭৮-৭৯ সালে ডেন্ জিয়াওপিং (Deng Xiaoping)-এর সময় থেকে। চীনের এই বিষয়ে সাফল্য ক্রমান্বয়িকতার (Gradualism) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি চীন তার সংস্কার ব্যবস্থার দ্বারা এটাই প্রমাণ করেছে যে অর্থনৈতিক উদারীকরণ, রাজনৈতিক উদারীকরণের আগেই আসতে পারে।

১৯৯১-৯৪ সালের মধ্যে ভারতের প্রায় তিনগুণ আয়তন বিশিষ্ট এবং বাৎসরিক ১.৪% জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে (ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাৎসরিক ২.৩%) চীনে বাৎসরিক গড় উন্নয়নের হার (Rate of GDP) ছিল ১৩%, অথচ ঐ সময়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হার (GDP) ছিল মাত্র ৩%। চীনের এই অর্থনৈতিক সংস্কারের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে চীন অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি স্তরে দ্রুত-সাফল্য-সুনিশ্চিত করার পরিকল্পনা ('Big Bang' Policy) না নিয়ে কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রেই ধীরে চলার নীতি বা ক্রমান্বয়িকতার (Policy of Gradualism) নীতি গ্রহণ করেছিল।

৪.১ সংস্কারের তিনটি পর্ব

চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু হয়েছিল এবং এটি তিনটি পর্বে সম্পাদন করার পরিকল্পনা হয়েছিল। প্রথম পর্বটি শুরু হয় ১৯৭৮-৭৯ সালে চীনের অর্থনৈতিক উড়ান (Takeoff) থেকে শুরু করে ১৯৮১-৮২ সাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা হয় গ্রামীণ উদারীকরণের নীতি দিয়ে। এই প্রথম চীনে "ব্যক্তিগত দায়িত্ব প্রথা" (Personal Responsibility System) প্রবর্তন করা হয়—এই নিয়মকে কৃষি-গৃহস্থরা (Form Households) প্রথম রাষ্ট্রের অধীন জমি ইজারা (Lease) দেবার অনুমতি পেলেন এবং তাঁদের দ্বারা উৎপাদিত কৃষিপণ্য দ্বি-পদ্ধতি বিশিষ্ট (Two-Track Formula) সূত্র অনুসরণ করে বিক্রয় করার অনুমতি পেলেন। এই পদ্ধতি হল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ রাষ্ট্রের সংগ্রহকারী সংস্থাকে রাষ্ট্র নির্দেশিত মূল্যে (State Procurement Agencies)

বিক্রয় করা এবং অবশিষ্ট অংশ বাজারে বাজার-নির্ণিত দামে (Market determined) বিক্রয় করা। এই প্রথম কৃষিদ্রব্য খোলা বাজারে বিক্রয় করা শুরু হোল। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বাইরে (Central Plan) শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য নগর ও গ্রামীণ শাসকদের নগর ও গ্রামীণ শিল্প সংগঠন (Township and Village Enterprises বা TVE) স্থাপনে উৎসাহিত করা হোল। ক্রমশ TVE-র সংগঠন শক্তিশালী হওয়াতে, বর্তমানে তারা শিল্পদ্রব্যের মোট উৎপাদনের প্রায় ৭০% উৎপাদন করে।

সংস্কারের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯৮০-এর থেকে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বায়ন (Globalisation) এবং আন্তর্জাতিকীকরণ (Internationalisation)। ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং মূলধনের জন্য চীনের অর্থনীতি উন্মুক্ত (Open) হলেও প্রকৃতপক্ষে এই কাজ শুরু হয় মুদ্রার অতি মূল্য বিশিষ্ট বিনিময় হারের (Over-valued Exchange Rate) অবমূল্যায়ন (Devaluation) করে। ১৯৮০-এর দশক ধরে চীনে বাণিজ্যে উদারীকরণ চলছিল। রপ্তানীকারক সংস্থাগুলি তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটি বড় অংশ নিজেদের কাছে রাখতে পারতো।

উপকূলবর্তী এলাকা—জিয়াংসু (Jiangsu), জেজিয়াং (Zhejiang), এবং গুয়ানডন (Guangdon) এই তিনটি অঞ্চলকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (Special Economic Zones) সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং এদের সঙ্গে—হংকং ও তাইওয়ানের যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশেষে ১৯৯০ সালে কয়েকটি অঞ্চলে, বিশেষ করে উপকূল অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার গঠন করা হোল। ১৯৯২ সালের মধ্যে এই বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা চীনে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিল।

সংস্কারের তৃতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯৮৪-৮৫ সালে। এই সংস্কারের কেন্দ্রীভবনতা ছিল শহরের শিল্পের উন্নয়নে। এই পরিকল্পনায় শিল্পকেন্দ্রগুলিকে চুক্তিবদ্ধ (Contract) দামের বিষয়ে বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হোল। এমনকি কোন ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং কি কাঁচামাল নিয়োগ করবে—এ ব্যাপারেও তারা অনেক বেশি স্বাধীনতা পেলো। শ্রমিক এবং পরিচালক—উভয়েরই পারিশ্রমিক সংগঠনের কার্যসম্পাদনের সঙ্গে যুক্ত হোল, অর্থাৎ কমিউনিষ্ট চীনে ধনতান্ত্রিক দেশের মত মজুরীর স্তর উৎপাদনশীলতার হারের সঙ্গে সম্পর্কিত হোল। কৃষি গৃহস্থের মত শিল্প সংগঠনেও দ্বি-পদ্ধতি বিশিষ্ট সূত্র অনুসৃত হোল—রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শিল্পের পরিচালকদের তাঁদের উৎপাদনের একটি অংশ সংস্কার-নির্দেশিত মূল্যে বিক্রয় করতে হোত এবং বাকী অংশ তারা খোলা বাজারে বিক্রয় করতে পারতো।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, গ্রামীণ উদারীকরণ নীতি, বাজার অর্থনীতি উপকূল অঞ্চলের আন্তর্জাতিকীকরণ এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করা—এ সবই "ধীরে চলার" নীতি (Gradualism) এবং "পরীক্ষামূলক" (Experimentation) নীতি অনুসরণ করেছিল। চীনের মত কমিউনিষ্ট দেশে "দ্রুত সাফল্যের" নীতি (Big-Bang) এবং সমাজের "শীর্ষ স্থান থেকে নীচু স্তর" ("Top-Down Reforms") পর্য্যন্ত সংস্কারের নীতির চেয়ে "ধীরে চলার" নীতি প্রাধান্য পেয়েছিল।

চীনের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক সংস্কার এটাই প্রমাণ করেছে যে, শিল্পের সংস্কারের চেয়ে কৃষির সংস্কার প্রথমে প্রয়োজন। ১৯৮১ সাল থেকে কৃষিতে সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। ১৯৮৩ এর পরেই—"সাধারণ কমিউন" গুলি (People's Comunes) আইন অনুযায়ী বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৪.২ সংস্কারের বিভিন্ন ক্ষেত্র

চীনের এই সংস্কার নীতির দ্বারা অর্জিত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন দুটি প্রধান ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে—প্রথমত গ্রামীণ অঞ্চলে এবং দ্বিতীয়ত উপকূলবর্তী অঞ্চলে। কাজেই এটা স্পষ্ট, সংস্কারের গতির (Speed of Reform) চেয়ে সংস্কারের দিক্‌নির্ণয়ই (Direction of Reform) বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

চীনের এই সংস্কার নীতি বিকেন্দ্রীকরণ নীতির (Policy of Decentralisation) একটি অঙ্গ। ১৯৮৭ সাল থেকে স্থানীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ এলাকায় অর্থনৈতিক কাজ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে তাদের রাজস্বও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ স্থানীয় শাসকদের নিজেদের অর্থ নিজেদেরই দায়িত্বে থাকে। প্রত্যেকটি স্থানীয় শাসক তাদের নিজ নিজ TVE গঠন করে। এই TVE চীনের শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য। চীনের TVEs ভারতের ছোট ছোট শিল্পকেন্দ্রগুলির সঙ্গে তুলনীয়। চীনের সংস্কারের যুগে বিভিন্ন TVE-এর মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে শিল্পে উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪.৩ আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কার

চীনে ক্রম-উদারীকরণ নীতির অঙ্গ হিসাবে আর্থিক এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেও সংস্কার সাধন শুরু হয়।

চীনের সংস্কারের যুগে সুদের হারকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়েছিল। সাংহাই এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের শেয়ার বাজারের হঠাৎ পাওয়া সমৃদ্ধি (Boom)-কে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। এর ফলে অবাঞ্ছিত ফাটকা ব্যবসা রোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

চীনে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ১৯৮৮ সালে আর্থিক সংস্কার শুরু হয়। এটি একটি নির্বাচনমূলক ব্যবস্থা ছিল এবং আর্থিক এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। বড় বড় আর্থিক কেন্দ্রে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলো তাদের কাজের বিস্তৃতি ঘটাবার অনুমোদন পেয়েছিল। কিন্তু বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলি, যারা প্রধানত TVE-এর কাজ করতো তাদের খুব বেশি বিস্তৃতি ঘটেনি। এখনও পর্য্যন্ত TVE-কে অর্থ সাহায্য দেয় সরকারি ব্যাঙ্ক। কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় শাসক এবং স্থানীয় শাসকদের সহযোগিতায় আংশিকভাবে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (Semi Rural Banks) স্থাপিত হয়েছে।

চীনে এই আর্থিক এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কার—যা প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—তা খুব বেশি সফল হয়নি। কারণ হিসাবে বলা যায়, প্রথমত, কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কিং-এর এই নতুন আবহাওয়ায় বেসরকারি ব্যাঙ্কদের স্বাধীন প্রবেশে চীনের সরকার উৎসাহ দেয়নি।

আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কারের দ্বিতীয় স্তম্ভটি ছিল এই যে—ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত আর্থিক ক্ষেত্র দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখবে। চীনে সরকারি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি এ বিষয়ে সফলতা পায়নি। তবে ৯০-এর দশকের শেষ দিকে দেখা যায়, যে ব্যাঙ্কগুলি TVE-দের অর্থ যোগান দেয়, তারা কাম্য মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে। আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কারের তৃতীয় স্তম্ভটি হোল—প্রথম ও দ্বিতীয় কাজটির বিস্তৃতি।

চীনে অর্থনৈতিক উদারীকরণ, রাজনৈতিক উদারীকরণের আগে এলেও কমিউনিজমের পরিকাঠামোতে আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের আংশিক সংস্কার সম্ভব হয়েছে। বড়, মধ্যম আয়তনের এবং ছোট আয়তনের ব্যাঙ্কের পুনর্গঠনে এবং গ্রামীণ উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি রেখে এই অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর গতিতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

কমিউনিষ্ট চীনে স্থানীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে ক্রমশ বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল এবং একক ভাবে কৃষককে ও ছোট ব্যবসায় সংগঠনকে তাদের নিজস্ব কাজে উৎসাহ দান করা হয়েছিল।

৪.৪ জনসংখ্যা নীতি

জনসংখ্যার তীব্র ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে চীন বাধ্যতামূলকভাবে কিছু নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। যার ফলে জনসংখ্যার বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ২% থেকে ১.৪% করা সম্ভব হয়েছিল।

সম্প্রতি ম্যাকমিলান ও নউটন-এর (McMillan and Naughton) দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, নব্বই-এর দশকে চীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা খুবই উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেসিও (ICOR) খুব বেশি কমে যায়।

৪.৫ সংস্কারের সদর্থক দিক

চীনের সাম্প্রতিক কালের সংস্কারের কয়েকটি সদর্থক দিক হচ্ছে—প্রথমত, এই সকল সংস্কার কোন প্রচণ্ড সংঘর্ষের মাধ্যমে (Shock Therapy) হয়নি। চীনের সংস্কারের বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল—ধীরগতি, ক্রমবর্ধমান এবং পরীক্ষামূলক। দ্বিতীয়ত, এই সংস্কার বৃহদায়তন বেসরকারিকরণ সমর্থন করেনি, আয়ের হ্রাস ঘটায়নি এবং বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করেনি।

চীনে মূল্যস্তর বিষয়ে এবং আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সংস্কার সব শেষে এসেছিল এবং এখন এটা সমাপ্তির পথে। এ সত্ত্বেও চীনে ১৯৮২ থেকে ১৯৯৩-এর মধ্যে বাৎসরিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধির হার ছিল ১০%। চীনে পরবর্তী সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এই বৃদ্ধি ১৩% হবে।

৪.৭ অনুশীলনী ও উত্তর সংকেত

টীকা লিখুন।

১। মাওবাদ [উত্তর ৩.৩]

২। "মহানভাবে অতিক্রান্ত ব্যবধান" [উত্তর ৩.৬]

৩। "কৃষিই প্রথম" [উত্তর ৩.৭]

৪। কমিউন [উত্তর ৩.১১]

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

১। কমিউন কী?

[উত্তর ৩.০]

২। আধুনিক চীনের উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য ও নীতি কী?
[উত্তর ৩.২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ঃ

১। কম্যুউনিজমের প্রতিষ্ঠার পটভূমি কী?
[উত্তর ৩.১০]

২। কমিউনের গঠন সম্বন্ধে বলুন।
[উত্তর ৩.১৩]

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

১। আধুনিক চীনে গৃহীত বিকল্প উন্নয়ন কৌশল সম্বন্ধে বলুন।
[উত্তর ৩.৫]

২। কমিউনের শাসন পদ্ধতি আলোচনা করে এর মূল্যায়ন করুন।
[উত্তর ৩.১৩]

৩। চীনে সাম্প্রতিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
[উত্তর ৪.০—৪.৬]

৪। চীনে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংস্কার—বিভিন্ন পর্ব ও বিভিন্ন ক্ষেত্র আলোচনা করুন।
[উত্তর ৪.১ ও ৪.২]

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Prof. Alexander Eckstein—China's Economic Revolution.

২। Prof. Alok Ghosh—Economic Reforms in India and China and the Need for Revamping the Banking Sector—Artha Beekshan—Dec, 1994.

ই. ই. সি—৬

পর্যায়-২৩

অর্থনীতির ঐচ্ছিক পাঠক্রম

(স্নাতক পাঠক্রম)

একক ১ ☐ পরিবেশ এবং অর্থব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা

১.৩ পরিবেশের সংজ্ঞা

১.৪ অর্থব্যবস্থা এবং পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক

১.৫ সারাংশ

১.৬ অনুশীলনী

১.৭ উত্তরমালা

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনারা বুঝতে পারবেন—

- অর্থব্যবস্থা বলতে সাধারণভাবে কি বোঝানো হয়।
- পরিবেশ বলতে কি বোঝানো হয়।
- অর্থব্যবস্থা এবং পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক কী কী?

১.১ প্রস্তাবনা

পরিবেশ অর্থনীতি (Environmental Economics) বর্তমান যুগে অর্থনীতির গবেষকদের মধ্যে ভীষণভাবে উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং পরিবেশ অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনায় প্রথমেই অর্থব্যবস্থা এবং পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা জানা ভীষণভাবে জরুরি। পরিবেশ যেমন অর্থব্যবস্থাতে প্রাকৃতিক উপাদানের যোগান দেয়, তেমনি বিবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে উদ্ভূত বর্জ্য পদার্থের সর্বশেষ গ্রাহক হিসাবে কাজ

করে। কিন্তু উক্ত বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করলে পরিবেশ দূষিত হয়। এ ছাড়াও পরিবেশ মানুষকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রদান করে। পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ এবং সৌন্দর্য্য মানুষকে আনন্দ দেয়; তা ভোগ করে মানুষ উপযোগ (utility) লাভ করে। এখন পরিবেশ এবং অর্থব্যবস্থার মধ্যে নিবিড় সম্পর্কটি বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

১.২ অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা

সাধারণভাবে, অর্থব্যবস্থা বলতে বোঝায় সামাজিক, আইনগত ও প্রযুক্তিগত কিছু ব্যবস্থা যার মাধ্যমে জনসাধারণ তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে চায়। এই ধারণাটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে বিভিন্ন লোক যারা কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম বা ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি লাভের আশায় কাজ করে থাকে। অর্থনৈতিক কাজগুলিকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়—উৎপাদন ও ভোগ। যখন কিছু উপাদানকে নির্দিষ্ট প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যবহার করে নতুন কিছু দ্রব্য বা সেবা তৈরি করা হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে উৎপাদন এবং যারা এই কাজ করে তাদের বলে উৎপাদক। আর যে কাজের মাধ্যমে এই উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী জনসাধারণ ব্যবহার করে সেই কাজকে বলে ভোগ এবং যারা ভোগ করে তাদের বলে ভোক্তা।

১.৩ পরিবেশের সংজ্ঞা

অপরদিকে পরিবেশ বলতে পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ প্রাণ, যে আবহাওয়ায় এই প্রাণের অস্তিত্ব থাকে এবং পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি বা তেজ (energy) ও বস্তুগত উপাদান (meterial resource)-এর সমষ্টিকে বোঝায়।

১.৪ অর্থব্যবস্থা এবং পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক

এখন দেখা যাক অর্থব্যবস্থা কিভাবে পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ উৎপাদন ও ভোগ—এই দুই ধরনের অর্থনৈতিক কাজকে শক্তিজাতীয় সম্পদ ও বস্তুজাতীয় সম্পদ সরবরাহ করে থাকে। যেমন—প্রাকৃতিক গ্যাস বা সমুদ্রের ঢেউ শক্তিজাতীয় সম্পদ যা ব্যবহার করে মানুষ কিছু দ্রব্য বা সেবা তৈরি করে। আবার কয়লা, গাছ ইত্যাদি হল বস্তুজাতীয় সম্পদের উদাহরণ। এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলি এবং আরও কিছু উপাদান উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীতে পরিণত হয়। যেমন—কয়লা থেকে লোহা তৈরি হওয়া। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দ্রব্য বা সেবাসামগ্রীর সাথে সাথে কিছু বর্জ্য পদার্থও (Waste products) তৈরি হয়। এই বর্জ্য পদার্থগুলির কিছুটা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শোধিত হয়ে পুনরায়

অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে ব্যবহৃত হয়। যেমন—বিভিন্ন কারখানা থেকে যে সমস্ত বর্জ্য তরল পদার্থ পাওয়া যায়, অনেক সময় সেগুলিকে শোধিত করে জল বা অন্য কিছু হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্জ্য পদার্থের অশোধিত অংশ পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হয়। অর্থাৎ পরিবেশ এখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ দ্বারা সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ বা জঞ্জাল ফেলার পাত্র হিসাবে কাজ করে। একইভাবে ভোগ প্রক্রিয়াজাত বর্জ্য পদার্থসামগ্রীও পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে অতএব আমরা দেখছি পরিবেশের দুটি কাজ হল অর্থব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক উপাদান সরবরাহ করা এবং আর্থিক কাজকর্মজাত বর্জ্য পদার্থের সর্বশেষ গ্রাহক হিসাবে কাজ করা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরিবেশও নিজে কিছু বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে। যেমন—গাছ থেকে পাতা মাটিতে পড়ে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশজাত এইসব বর্জ্য পদার্থের প্রায় পুরোটাই পরিবেশ স্বাঙ্গীকরণ করতে পারে, যেমন—গাছ থেকে পড়া পাতা ধীরে ধীরে মাটিতে মিশে যায়। কিন্তু অর্থব্যবস্থা তার যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থগুলি গ্যাসের আকারে বায়ুতে, তরলের আকারে নদী ইত্যাদিতে এবং শক্ত বা পূর্ণগর্ভ বস্তুর আকারে মাটিতে নিক্ষেপ করে সেগুলি পুরোপুরি পরিবেশে মিশতে পারে না এবং তার ফলে পরিবেশের ওপর কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বর্জ্য পদার্থের কতটা পরিবেশে পুরোপুরি মিশে যাবে, কতটাই বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে এবং বাকী কতটা পরিবেশে থেকে যাবে সেগুলি নির্ভর করে পরিবেশের অঙ্গীভূত করার ক্ষমতা (assimilative capacity)-র ওপর। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত পরিবেশ বর্জ্য পদার্থগুলিকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ এর থেকে বেশি হলে বা বর্জ্য পদার্থগুলি যদি বিশেষ ধরনের হয় (যেমন—কিছু বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক) তাহলে পরিবেশ সেগুলি গ্রহণ করতে বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে অর্থব্যবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারে না। এই থেকে যাওয়া বর্জ্য পদার্থগুলি তখন দূষণ সৃষ্টি করে। এই দূষণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তখন তা' পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

উৎপাদন ও ভোগের উপাদান সংগ্রহ করা ছাড়াও অন্য আর একটি ভাবে মানুষ পরিবেশ থেকে উপযোগিতা লাভ করে। যেমন, কোন প্রাকৃতিক সম্পদ দেখে ও তার সৌন্দর্য্য ভোগ করে মানুষ আনন্দিত হয়। এই আনন্দ পাওয়াও এক ধরনের ভোগ যার থেকে মানুষ সরাসরিভাবে কিছু উপযোগিতা লাভ করছে। আমরা যখন পাহাড়, সমুদ্র দেখে আনন্দলাভ করি তখন বলা হয় যে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে মনোরমতা বা আমোদপ্রমোদ মূল্য (amenity value) পাচ্ছি।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা পরিবেশের যে কাজগুলি অর্থব্যবস্থার সাথে তার এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে সেগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত পরিবেশ অর্থব্যবস্থাকে উৎপাদন ও ভোগের উপযোগী প্রাকৃতিক উপাদান সরবরাহ করে থাকে। দ্বিতীয়ত উৎপাদন ও ভোগ প্রক্রিয়াজাত বর্জ্য

পদার্থসামগ্রী পরিবেশেই নিক্ষিপ্ত হয় এবং তৃতীয়ত পরিবেশ ভোক্তাকে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যজাত আনন্দ দান করে।

ওপরের সমগ্র আলোচনাটিকে বোঝার সুবিধার জন্য একটি সহজ চিত্রের মাধ্যমে নীচে দেখান হল।

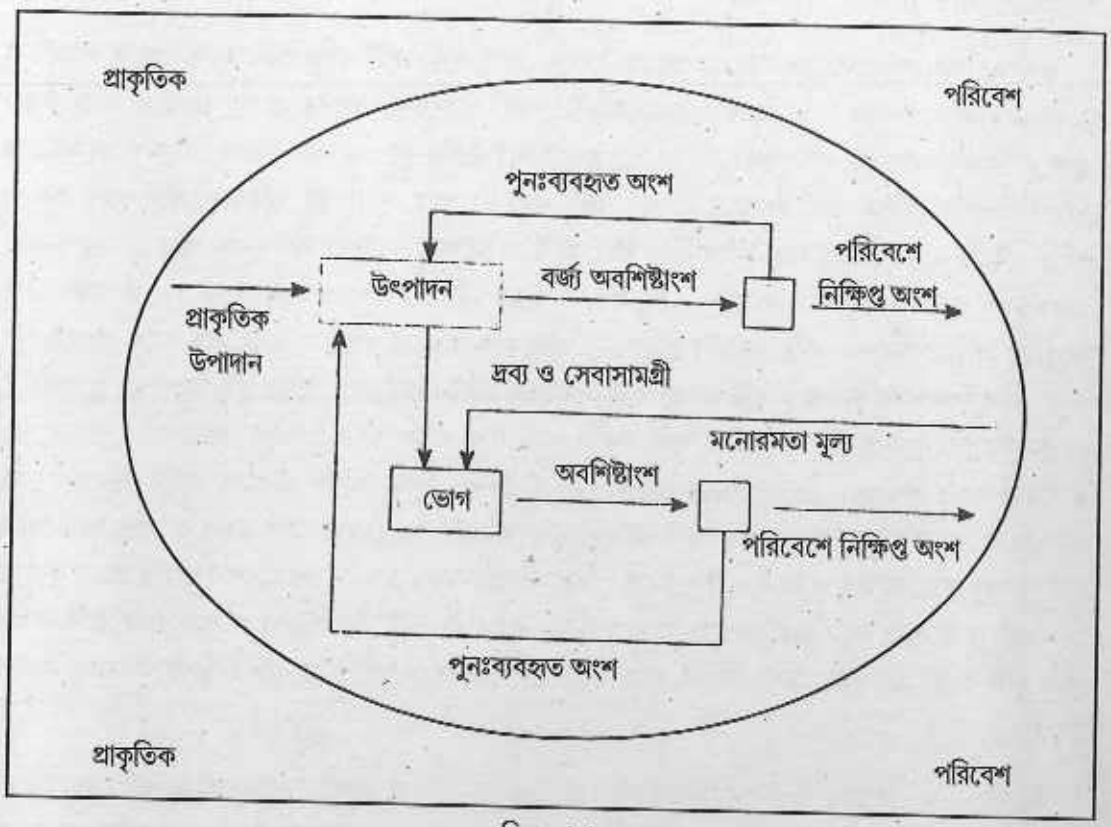

চিত্র—1.1

উপরের আলোচনা থেকে পরিবেশের তিনটি কাজকে একত্রিত করে আমরা বলতে পারি, পরিবেশের মূল কাজটি হল পৃথিবীর বুকে প্রাণকে ধরে রাখা। পরিবেশের এই মূল কাজটি ব্যাহত হতে পারে যদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলি নিঃশেষিত হয়ে যায় বা দূষণ এমন পরিমাণে পৌঁছায় যাতে তার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির কারণে প্রাণের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং, অর্থনৈতিক কাজকর্মগুলি এমনভাবে চালানো উচিত যাতে পরিবেশ তার এই মূল কাজটি অব্যাহত রাখতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশ সম্পর্কিত অর্থনীতিতে (Resource and Environmental Economics) আমরা এই বিষয়গুলিকেই আলোচনা করি।

১.৫ সারাংশ

অর্থব্যবস্থা বলতে বোঝায় সামাজিক, আইনগত ও প্রযুক্তিগত কিছু ব্যবস্থা যার মাধ্যমে জনসাধারণ তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে চায়। পরিবেশ বলতে পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ প্রাণ, যে আবহাওয়ায় এই প্রাণের অস্তিত্ব থাকে এবং পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি ও বস্তুগত উপাদানের সমষ্টিকে বোঝায়।

পরিবেশের কাজগুলি হল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক উপাদান সরবরাহ করা, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ গ্রহণ করা ও মানুষকে তাঁর সৌন্দর্য্য দিয়ে আনন্দদান করা।

প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশ সম্পর্কিত অর্থনীতিকে আমরা মানুষের দ্বারা পরিবেশের সুষম বা কাম্য ব্যবহার নীতি আলোচনা করি।

১.৬ অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(1) ——— একটি শক্তিজাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ——— একটি বস্তুজাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ।

(2) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল দুটি কাজ হল ——— ও ———।

(3) অর্থব্যবস্থা দ্বারা সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থগুলি কতটা দূষণ সৃষ্টি করবে তা নির্ভর করে পরিবেশের——— ক্ষমতার ওপর।

সংজ্ঞাসহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন :

(4) (ক) উৎপাদন ও ভোগ, (খ) পরিবেশের অঙ্গীভূত করার ক্ষমতা, (গ) মনোরমতা মূল্য।

(5) পরিবেশ ও অর্থব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? পরিবেশ ও অর্থব্যবস্থার মধ্যে যে সম্পর্ক দেখা যায় চিত্রসহ তা আলোচনা করুন।

১.৭ উত্তরমালা

(1) সৌরশক্তি, কয়লা।

(2) উৎপাদন, ভোগ।

(3) অঙ্গীভূত করার।

(4) সূত্র : (ক) যখন কিছু উপাদানকে নির্দিষ্ট প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যবহার করে কোন দ্রব্য বা সেবা উৎপন্ন করা হয়, তখন তাকে বলে উৎপাদন, আর উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার করার কাজকে বলে ভোগ। আপনি কিছু উদাহরণের সাহায্যে আরও স্পষ্ট করতে পারেন।

(খ) যে ক্ষমতার সাহায্যে পরিবেশে নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন বস্তু পরিবেশে প্রাকৃতিকভাবে মিশে যায়, তাকে বলে পরিবেশের অঙ্গীভূত করার ক্ষমতা। উদাহরণসহ পরিবেশ সৃষ্ট বর্জ্য ও মনুষ্য সৃষ্ট বর্জ্য পরিবেশে কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে অঙ্গীভূত হতে পারে আলোচনা করুন।

(গ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে মানুষ যে উপযোগিতা লাভ করে তাকে বলে মনোরমতা মূল্য। দু'একটি উদাহরণ দিতে চেষ্টা করুন।

(5) সূত্র : ওপরের সমগ্র আলোচনাটিকে 1.1 নং চিত্রসহ বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(1) Rabindranath Bhattacharyya (Ed). (2000) : *"Environmental Economics—An Indian Perspective"*. Oxford University Press.

(2) To Titenberg (1998) : *Environmental Economics and Policy,* 2nd ed, U.S.A. Addison-Wesley.

একক ২ ❐ নিঃশেষযোগ্য সম্পদ এবং পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদ

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ নিঃশেষযোগ্য সম্পদ

২.২.১ বিকল্প দ্রব্যের অস্তিত্ব ও নিষ্কর্ষণ নীতি

২.২.২ নতুন আবিষ্কার এবং প্রযুক্তির উন্নতি

২.২.৩ সম্পদ নিষ্কর্ষণ এবং পরিবেশ ব্যয়

২.৩ পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদ

২.৩.১ সম্পদের বৃদ্ধিরেখা

২.৩.২ দক্ষতা এবং বহনযোগ্য সরবরাহ নির্ধারণে নিষ্কর্ষণ এবং চেষ্টার ভূমিকা

২.৩.৩ বাধাহীন অধিকার এবং সর্বসাধারণের সম্পত্তি

২.৪ সম্পদের অপ্রতুলতা

২.৫ সারাংশ

২.৬ অনুশীলনী

২.৭ উত্তরমালা

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন—

- প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিভাগ।
- পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদ এবং নিঃশেষযোগ্য সম্পদের মূল পার্থক্য।
- ব্যবহার ব্যয় এবং সুযোগ ব্যয়।

- কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের মৌলিক শর্ত।
- নিঃশেষযোগ্য সম্পদ বেশিদিন সঞ্চিত রাখার উপায়।
- সর্বাধিক বহনযোগ্য সরবরাহ।
- পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কাম্য অবস্থা নির্ধারণের উপায়।

২.১ প্রস্তাবনা

প্রথম এককের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, পরিবেশ অর্থব্যবস্থাকে বস্তুজাতীয় এবং শক্তিজাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহ করে। অর্থব্যবস্থা এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদন ও ভোগের উপাদান হিসাবে নানাভাবে ব্যবহার করে থাকে। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে আমরা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট যে সমস্ত সম্পদ বর্তমান বা ভবিষ্যতে মানুষের ব্যবহারযোগ্য, সেই সমস্ত সম্পদকেই বুঝি। বনভূমি, জলাভূমি, খনিজ পদার্থ; অখনিজ শক্তিসম্পদ, যেমন, সৌরশক্তি, বাতাস, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদি। মাটির অভ্যন্তরস্থ জলসম্পদ এবং সর্বোপরি পরিবেশের বর্জ্য পদার্থ অঙ্গীভূত করার ক্ষমতা ইত্যাদি হল প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ। অর্থাৎ কোন প্রাকৃতিক বস্তু আমাদের কাছে সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে কি না তা নির্ভর করছে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অবস্থা, রুচি ও পছন্দ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ইত্যাদির ওপর। যেমন, একশ বছর আগে আমরা ইউরেনিয়ামের কথা জানতাম না, বা জলাভূমির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সম্যক্ অবহিত ছিলাম ন। তাই এগুলি তখন আমাদের কাছে সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হত না।

আবার আমরা এটাও জানি যে, মানুষের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে ফেললে তা পুনরায় সৃষ্টি করা সবসময়ে সম্ভব নয়। যেমন, কয়লার সঞ্চিত ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা আবার গঠন করে তোলা সম্ভবই নয়। প্রাকৃতিক উপায়ে গঠিত হতে গেলেও যতটা সময় লাগে তা অর্থনীতির ধারণায় অর্থবহ নয়। আবার, সৌরশক্তিকে যত খুশি ব্যবহার করলেও তার পরিমাণ কমে না। এছাড়াও কিছু সম্পদ আছে—যেমন, বনভূমি—সেগুলি মানুষের চেষ্টায় এবং প্রাকৃতিকভাবে পুনরায় সৃষ্টি করা যেতে পারে। বর্তমানে উৎপাদন ও ভোগ প্রক্রিয়াকে বেশি পরিমাণে চালিয়ে গেলে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক উপাদানের অপ্রতুলতা বা অভাব দেখা দিতে পারে। সুতরাং সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আবার, একটি নির্দিষ্ট কাম্য হারে আর্থিক বৃদ্ধির জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করতেই হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের এই সুষম ব্যবহারের নীতি নির্ধারণই প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক অর্থনীতির মূল উপজীব্য।

সাধারণভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদ এবং অপরটি নিঃশেষযোগ্য। যে সমস্ত সম্পদ ব্যবহার হলেও অর্থবহ সময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক উপায়ে আবার

সৃষ্টি হতে পারে তাদের বলে পুনর্গঠনযোগ্য (renewable) সম্পদ। যেমন—মাছ বা বনভূমি অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহৃত হলেও যুক্তিসঙ্গত অল্পসময়ের মধ্যে আবার জন্মাতে বা গঠিত হতে পারে এবং ব্যবহার হওয়ার আগের অবস্থায় এগুলিকে আবার পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যে সমস্ত সম্পদ একটি যুক্তিগ্রাহ্য সময়ের মধ্যে পুনর্গঠিত হতে পারে না, তাদের বলে নিঃশেষযোগ্য (exhaustible) সম্পদ। যেমন, কয়লা প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায় বলে এটি একটি নিঃশেষযোগ্য সম্পদ।

পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানুষের ব্যবহার করার পদ্ধতির ওপর নির্ভর করছে সম্পদটি কত তাড়াতাড়ি কতটা পরিমাণে পুনর্গঠিত হতে পারে। যেমন, কোন পুকুর থেকে যদি প্রায় সব মাছই তুলে নেওয়া হয়, তাহলে অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক মাছ থেকে আগের পরিমাণে মাছ তৈরি হওয়া দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অনেক সময় আবার অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহারের ফলে কিছু কিছু প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন, বনভূমিকে বেশি কেটে ফেললে, দু'একটি দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির গাছ বা প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে তাই প্রধান কাজটি হল এমনভাবে এই সম্পদ ব্যবহারের নীতি স্থির করা উচিত যাতে সবসময়েই একটি কাম্য পরিমাণে পাওয়া সম্ভব।

নিঃশেষযোগ্য সম্পদ যেহেতু একবার ব্যবহার করে ফেললে আর তৈরি হয় না, তাই অর্থব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে এই সম্পদের যথাযথ বন্টন। বর্তমান এককে আমরা ক্রমান্বয়ে এই দুইপ্রকার সম্পদের কাম্য (Optimal) ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব।

২.২ নিঃশেষযোগ্য সম্পদ

যে সমস্ত সম্পদ একবার ব্যবহার করে ফেললে আর সেগুলি প্রাকৃতিক উপায়ে পুনরায় তৈরি হয় না, তাদের নিঃশেষযোগ্য সম্পদ বলা হয়। খনিজ দ্রব্যাদি এবং খনিজ তেল ইত্যাদি নিঃশেষযোগ্য সম্পদের উদাহরণ। এই ধরনের সম্পদকে নিঃশেষযোগ্য বলা হয় কারণ এগুলি তৈরি হতে কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটি বছর সময় লেগে যায়, অর্থাৎ অর্থনীতির ধারণায় যুক্তিগ্রাহ্য সময়ের মধ্যে এগুলি পুনঃসৃষ্টি হয় না।

কোন একটি প্রজন্ম যদি কোন নিঃশেষযোগ্য সম্পদকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে ফেলে তাহলে পরবর্তী প্রজন্মগুলির ব্যবহারের জন্য সম্পদটি কম পরিমাণে অবশিষ্ট থাকবে এবং কয়েকটি প্রজন্ম পরে তা পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সুতরাং নিঃশেষযোগ্য সম্পদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে একটি যুক্তিগ্রাহ্য সময় পর্যন্ত সকল প্রজন্মই এই সম্পদটি ব্যবহার করতে পারে।

এখন আমরা কোন নিঃশেষযোগ্য সম্পদের কাম্য ব্যবহার কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যেহেতু নিঃশেষযোগ্য সম্পদের মোট পরিমাণ স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে, সেজন্য এই সম্পদের পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একজন বিক্রেতার সিদ্ধান্ত অন্য যেকোন সাধারণ দ্রব্যের পূর্ণ

প্রতিযোগী বিক্রেতার সিদ্ধান্তের থেকে আলাদা হবে। অন্য যেকোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক লাভের শর্তটি হল প্রান্তিক ব্যয় ও দাম পরস্পরের সমান হবে (P = MC)। কিন্তু নিঃশেষযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে নিষ্কর্ষণের (Extraction) প্রান্তিক ব্যয় ছাড়াও একটি সুযোগ ব্যয় (Opportunity cost) থাকে। যে কাজে সম্পদটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার বদলে অন্যভাবে ব্যবহার করলে সর্বাধিক যে আয় পাওয়া যেত, সেই আয়ের পরিমাণই সম্পদটিকে বর্তমান কাজে লাগানোর সুযোগ ব্যয়।

অর্থাৎ কোন নিঃশেষযোগ্য সম্পদকে ভবিষ্যতে কাজে লাগালে তা থেকে সর্বাধিক যে আয় পাওয়া যেত বর্তমানে লাগানোর ফলে সেই ভবিষ্যৎ আয়টিকে ত্যাগ করতে হচ্ছে। এই ত্যক্ত আয়ের পরিমাণই সম্পদটিকে বর্তমানে কাজে লাগানোর সুযোগ ব্যয়। এই সুযোগ ব্যয়কে অনেক সময় প্রয়োগ ব্যয় বা ব্যবহার ব্যয় (user cost)-ও বলা হয়। নিঃশেষযোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে বর্তমানের ভোগ ভবিষ্যতের ভোগের সুযোগকে নষ্ট করে দেয় বলে এখানে ব্যবহার ব্যয়ের ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক লিটার তেল নিষ্কর্ষণ করে বাজারে বিক্রয় করলে এখন আয় পাওয়া যাবে বটে কিন্তু ভবিষ্যতে এই এক লিটার তেল ব্যবহার করে তার থেকে আয়ের সুযোগ আর থাকছে না। তাই এই এক লিটার তেল নিষ্কর্ষণ ও বিক্রয়ের প্রান্তিক ব্যয়ের সাথে সাথে ভবিষ্যতের ত্যাগজনিত সুযোগ ব্যয়কেও হিসাবে এনে আমরা বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয় পেয়ে থাকি। অর্থাৎ

বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয় (Augmented Marginal Cost বা AMC) = নিষ্কর্ষণের প্রান্তিক ব্যয় (MC) + ব্যবহার ব্যয় (User Cost বা UC) (AMC = MC + UC)।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একজন উৎপাদক প্রত্যেক সময়কালে ততটুকু সম্পদ নিষ্কর্ষণ করবে যাতে তার বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয় সম্পদের দামের সমান হয়। অর্থাৎ সম্পদ নিষ্কর্ষণের ভারসাম্য অবস্থার শর্তটি হল

$$P = AMC = MC + UC \quad \text{.....(1)}$$

নীচের 2.1 নং চিত্রে নিঃশেষযোগ্য সম্পদের কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের শর্তটি দেখানো হল।

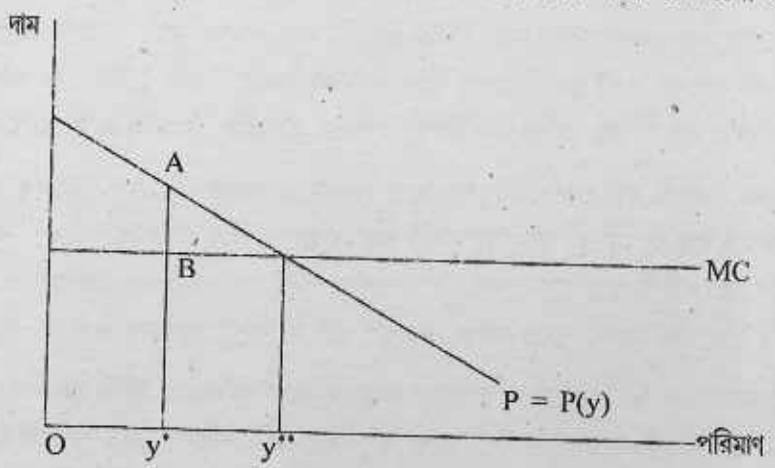

চিত্র—2.1

2.1 নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে নিঃশেষযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবস্থায় নিষ্কর্ষণের বা উৎপাদনের পরিমাণ সাধারণ দ্রব্যের ভারসাম্য উৎপাদনের থেকে কম হবে ($y^* < y^{**}$)। সাধারণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ দাম যখন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান, তখন উৎপাদন = y^{**} আর নিঃশেষিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম যখন বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয়ের সমান, উৎপাদন = y^*। এখানে সুযোগ ব্যয় বা ব্যবহার ব্যয়ের পরিমাণ AB অংশের সমান।

নিঃশেষযোগ্য সম্পদের কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের উপরিউক্ত নীতিটি থেকে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাকৃতিক সম্পদের বর্তমান নিষ্কর্ষণের হার বর্তমান বাজার দাম এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত (expected) দামের ওপর নির্ভর করে। আর ভবিষ্যৎ দামের প্রত্যাশার থেকেই সুযোগ ব্যয় নির্ধারিত হয়। প্রতিযোগিতার বাজারে সম্পদের কোন সরবরাহকারী যদি মনে করে সম্পদটির ভবিষ্যৎ দাম বর্তমানের তুলনায় অনেকটাই কম (বেশি) হবে, তাহলে সে বর্তমানে অনেক বেশি (কম) পরিমাণ সম্পদ নিষ্কর্ষণ করবে যেহেতু সম্পদটির সুযোগ ব্যয় কম (বেশি)।

আমাদের এই আলোচনাকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখন মনে করা যাক যে দুটি প্রজন্মের মধ্যেই কোন একটি সম্পদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ এখানে দুটি সময়কাল আছে। সম্পদের মালিক সম্পদটিকে হয় বর্তমানে (অর্থাৎ সময়কাল 0-তে) পুরোপুরি নিষ্কর্ষণ করে ফেলবে অথবা ভবিষ্যতের (অর্থাৎ সময়কাল 1-এর) জন্য কিছুটা রেখে দেবে। মনে করা যাক, সম্পদটির বর্তমান ও প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ দাম যথাক্রমে p_0 ও p_1 এবং সম্পদটিকে নিষ্কর্ষণ করে বাজার পর্যন্ত নিয়ে আসার গড় ব্যয় = C। এই গড় ব্যয়টিকে দুটি সময়কালের জন্যই স্থির মনে করা হচ্ছে অর্থাৎ গড় ব্যয় = C = প্রান্তিক ব্যয়। এখন, বিক্রেতা যদি সম্পদটিকে বর্তমানে বিক্রয় করে তাহলে সে প্রতি এককে $(p_0 - C)$ পরিমাণ নীট আয় পাবে কিন্তু ভবিষ্যতে তাকে প্রতি এককে $(p_1 - C)$ পরিমাণ আয়ের সুযোগ ছাড়তে হবে। বর্তমানে অর্থাৎ সময়কালে এই আয়ের মূল্য $\frac{p_1 - C}{1+r}$-এর সমান, যেখানে r = ডিসকাউন্টের হার।*

অর্থাৎ এক একক সম্পদ বর্তমানে বিক্রয় করলে তা থেকে প্রাপ্ত আয় $= (p_0 - C) - \frac{p_1 - C}{1+r}$, $\frac{p_1 - C}{1+r}$

হল এক একক সম্পদ বর্তমানে নিষ্কর্ষণ করার সুযোগ বা ব্যবহার ব্যয়। যদি $(p_0 - C) > \frac{p_1 - C}{1+r}$ হয়, তাহলে সম্পদটি বর্তমানে বিক্রয় করলেই লাভ। অপরপক্ষে, $(p_0 - C) < \frac{p_1 - C}{1+r}$ হলে অর্থাৎ বর্তমানের নীট আয় যদি ভবিষ্যতের আয়ের বর্তমান মূল্যের থেকে কম হয়, তাহলে সম্পদটি ভবিষ্যতের ব্যবহারের

---

* কোন একটি সম্পদ যদি T-তম সময় পর্যন্ত যথাক্রমে B_0, B_1, B_T পরিমাণ আয় হয়, তবে এই সমস্ত আয়ের বর্তমান মূল্য হল $\sum_{t=0}^{T} B_t / (1+r)^t$ এবং r-কে বলা হয় ডিসকাউন্টের হার।

জন্য রেখে দেওয়াই লাভজনক। কোন উৎপাদক বর্তমানে ততটা সম্পদই নিষ্কর্ষণ করবে যতটা নিষ্কর্ষণ করলে তার বর্তমান আয় ও ভবিষ্যতের আয়ের বর্তমান মূল্য সমান হবে। অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায়

$$(p_0 - C) = \frac{p_1 - C}{1+r}$$

অথবা, $p_0 = C + \frac{p_1 - C}{1+r}$ ..... (2)

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ওপরের 2 নং শর্তটি কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের জন্য আগে পাওয়া 1নং শর্তটির মতই। অর্থাৎ, কোন সম্পদের কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের শর্তটি হল তার বর্তমান দাম প্রান্তিক ব্যয় ও সুযোগ বা ব্যবহার ব্যয়ের যোগফলের সমান হবে।

$$p_0 = C + \frac{p_1 - C}{1+r}$$

$$\therefore p_1 - C = (p_0 - C)(1+r) \quad \text{..... (2a)}$$

(2a) নং সমীকরণটি হল কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের দ্বিতীয় শর্ত এবং এটিকেই নিঃশেষযোগ্য সম্পদ নিষ্কর্ষণের মৌলিক শর্ত বলা হয়। এই শর্ত অনুসারে বলা যায় যে কোন উৎপাদক কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণ রেখার ওপর অর্থাৎ রেখাটির প্রত্যেক বিন্দুতে সম্পদটির বর্তমান নিষ্কর্ষণের বা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিরপেক্ষ। এই রেখাটির ওপর সম্পদটির প্রান্তিক ব্যয় বাদ দিয়ে যে দাম, তা সুদের হারের সাথে সমান হারে বাড়তে থাকে (এখানে ডিসকাউন্টের হারকেই সুদের হার বলা হচ্ছে)।

এই সূত্রটি প্রাথমিকভাবে বার করেছিলেন অর্থনীতিবিদ হ্যারল্ড হোটেলিং [দ্রষ্টব্য হোটেলিং 1931] 'The Economics of Exhaustibles Resources', Journal of Political Economy, 39, 137-75.

একটি ছোট্ট উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা যাক। মনে করা যাক, সুদের হার = 10% এবং নীট দাম (P–MC) অর্থাৎ ব্যবহার ব্যয়* = 20 টাকা। যদি ব্যবহার ব্যয় পরের বছর এর 20% এর কম বাড়ে, তাহলে বর্তমানে সম্পদটি নিষ্কর্ষণ করাই লাভজনক। কারণ বর্তমানের 20 টাকা আয় কোন সম্পত্তিতে 10% সুদে বিনিয়োগ করে ভবিষ্যতের মোট আয় হবে 22 টাকা। আর যদি ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত নীট দাম 22 টাকার বেশি হয়, তাহলে সম্পদটি বর্তমানে নিষ্কর্ষণ না করাই লাভজনক। কারণ বর্তমানে নিষ্কর্ষণ করলে ভবিষ্যতে সুদসমেত মাত্র 22 টাকাই পাওয়া যাবে আর ভবিষ্যতে নিষ্কর্ষণ করলে খরচ বাদ দিয়ে নীট আয় 22 টাকার বেশি হবে।

* যেহেতু দাম = প্রান্তিক ব্যয় + ব্যবহার ব্যয়।

যদি নিষ্কর্ষণের প্রান্তিক ব্যয় দামের তুলনায় যৎসামান্য হয়, তাহলে (2) বা (2a) নং সমীকরণকে নিম্নোক্তভাবে লেখা হয়—

$$\frac{p_1}{p_0} = 1 + r$$

অথবা, $p_1 = p_0(1+r)$

অর্থাৎ কাম্য নিষ্কর্ষণ রেখার ওপর সম্পদের দাম সুদের হারের সাথে সাথে বাড়তে থাকে। ডিস্‌কাউন্টের হার যত বেশি হবে কাম্য রেখার ওপর সম্পদের দাম তত বেশি বাড়বে। অর্থাৎ, r যত বেশি হবে, ব্যবহার ব্যয় তত কম হবে এবং সম্পদ নিষ্কর্ষণ তত বেশি হবে। বাস্তবে নিষ্কর্ষণ ব্যয় কখনোই শূন্য হয় না। তখন দাম যদি সুদের হারের সাথে সমান হারে বাড়ে, নীট দাম সুদ অপেক্ষা বেশি বাড়বে। অর্থাৎ কোন সম্পদের দাম 30 টাকা ও নীট দাম 25 টাকা হলে যখন সুদ ও দাম উভয়েই 10% হারে বাড়ে, তখন নীট দাম বৃদ্ধি পেয়ে 28 টাকা হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার 12%। এই পার্থক্যের জন্যই দাম ও সুদ এক হারে বাড়লে ভবিষ্যতের নিষ্কর্ষণের জন্য সম্পদটিকে রেখে দেওয়াই লাভজনক। কারণ এখানে ব্যবহার ব্যয়ের বৃদ্ধির হার (12%) সুদের বৃদ্ধির হার (10%)-এর থেকে বেশি।

২.২.১ বিকল্প দ্রব্যের অস্তিত্ব ও নিষ্কর্ষণের নীতি

আমরা এতক্ষণ নিঃশেষযোগ্য সম্পদের কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের নীতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি সেখানে বিকল্প দ্রব্যের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে আলোচনার মধ্যে আনিনি। কিন্তু আলোচ্য সম্পদটির কোন বিকল্প যদি পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই কাম্য নিষ্কর্ষণের নীতিটির পরিবর্তন হবে। ধরা যাক যে, বিকল্প দ্রব্যটি এক্ষেত্রে একটি পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদ যার নিষ্কর্ষণের প্রান্তিক ব্যয় স্থির। উদাহরণ হিসাবে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস বা তেলের বিকল্প হিসাবে সৌরশক্তির কথা মনে করতে পারি বা মাটির নীচের জলের বিকল্প হিসাবে ভূপৃষ্ঠের জলের (surface water) কথাও মনে করা যায়।

বিকল্প দ্রব্যের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের নীতি নির্ধারণ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় যে, নিঃশেষযোগ্য সম্পদের নিষ্কর্ষণের বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয় তার বিকল্পের ব্যবহারের প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হতে পারে না। কারণ তা হলে সবসময়েই বিকল্প পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদটিকেই ব্যবহার করা হবে এবং নিঃশেষযোগ্য সম্পদটি কখনোই নিষ্কর্ষিত হবে না। সুতরাং, এক্ষেত্রে বিকল্প দ্রব্যের বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয় যদি দ্রব্যটির ব্যবহারের জন্য সর্বাধিক প্রদানের ইচ্ছা (Maximum Willingness to pay যাকে আমরা Choke price ও বলে থাকি)-এর থেকে কম হয়,

> যে দামে দ্রব্যের কোন চাহিদা থাকে না সেই দামকে 'Choke price' বলা হয়।

তাহলে এই বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয়টিই নিঃশেষযোগ্য সম্পদের কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

এবার ব্যাপারটিকে আমাদের পরিচিত সমীকরণগুলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাক। আমরা জানি, বিকল্প দ্রব্য না থাকলে কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণ রেখার সমীকরণটি হল—

$$p_1 = Mc + (p_0 - MC)(1 + r)$$

$$\therefore\ p_2 = Mc + (p_0 - MC)(1 + r)^2$$

এবং $$p_t = Mc + (p_0 - MC)(1 + r)^2 \quad \ldots\ldots\ldots (3)$$

(3) নং সমীকরণটিকে পরপৃষ্ঠায় ছবিতে দেখান হল।

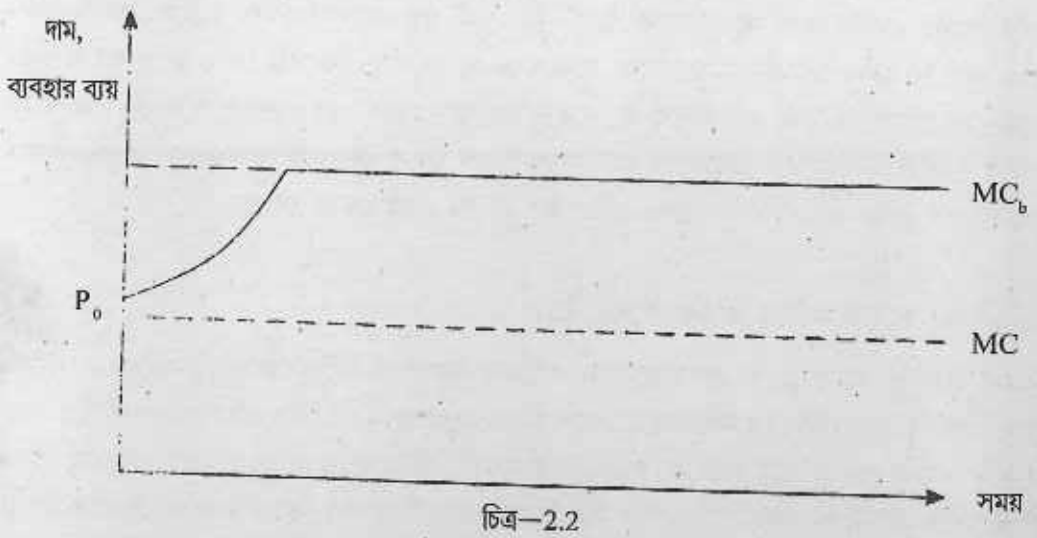

চিত্র—2.2

অর্থাৎ যত দিন যায়, দাম তত স্থির প্রান্তিক ব্যয়ের থেকে বেশি হতে হতে MC_b বা বিকল্প দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হতে চায়। দাম বা বর্ধিত প্রান্তিক আয়ের বৃদ্ধি বিকল্প দ্রব্যের নিষ্কর্ষণের প্রান্তিক ব্যয় পর্যন্তই বাড়তে পারে। অর্থাৎ এখানে বিকল্প দ্রব্যটি এমন একটি সম্পদ বা প্রযুক্তি যেটি বর্ধিত খরচে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি সরবরাহ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রাকৃতিক তেলের শক্তির বিকল্প হিসাবে আমরা সৌরশক্তিকে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু সেটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমানটি হল যে এটি একটি যুক্তিগ্রাহ্য সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে না।

বিকল্পের প্রান্তিক ব্যয় পর্যন্তই যে দাম বাড়তে পারে সেটি প্রমাণ করার জন্য মনে করা যাক যে, বিকল্পটি হল সৌরশক্তি। সৌরশক্তির প্রান্তিক ব্যয় তেলের ব্যারেল প্রতি প্রাপ্তশক্তির এককে MC_b টাকার

সমান। যেহেতু সৌরশক্তি অফুরন্ত তাই MC_b-ই বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয় কারণ এখানে কোন ব্যবহার ব্যয় নেই। এখন মনে করা যাক যে, T-তম সময়ে তেলের দাম হবে—

$$p_T = M_c + (p_0 - MC)\ (1 + r)^T$$

আমরা এই সময়ে তেলের বদলে সৌরশক্তি ব্যবহার করব যদি $p_T = MC_b$ হয়।

$$\therefore\ MC_b = MC + (p_0 - MC)(1+r)^T$$

$$\therefore\ p_0 - MC = \frac{MC_b - MC}{(1+r)^T}$$

এখন, $$p_0 - MC = \frac{p_t - MC}{(1+r)}$$

$$\therefore \frac{p_t - MC}{(1+r)^t} = \frac{MC_b - MC}{(1+r)^T}$$

এখন, $$p_t = MC + \frac{MC_b - MC}{(1+r)^T}(1+r)^t$$

$$= MC + \frac{MC_b - MC}{(1+r)^{T-t}}\ (t < T)$$

অর্থাৎ ব্যবহার ব্যয় $(MC_b - MC)$-এর সাথে r সমহারে বাড়তে থাকে এবং T-তম সময়ে বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয় এবং দাম MC_b-এর সমান হয়।

২.২.২ নতুন আবিষ্কার এবং প্রযুক্তির উন্নতি

সাধারণতঃ সময়ের সাথে সাথে নিষ্কর্ষণের খরচ বাড়তে থাকে। কারণ ভূগর্ভে সহজলভ্য এবং অল্প খরচ সম্পন্ন সঞ্চিত সম্পদ শেষ হয়ে গেলে আমাদের ক্রমশঃ ভূগর্ভের আরও নীচে সম্পদের খোঁজ করতে হয়। এই সম্পদ তখন খুব একটা সহজলভ্য না হওয়ায় অনুসন্ধানের প্রান্তিক খরচ সময়ের সাথে সাথে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং এই ক্রমবর্ধমান নিষ্কর্ষণ ব্যয়ের কারণেই নতুন সম্পদের অনুসন্ধান (exploration) করা হয়। যখন প্রাপ্ত নতুন সম্পদের প্রান্তিক নিষ্কর্ষণ ব্যয় আগের সম্পদটির বর্ধিত প্রান্তিক নিষ্কর্ষণ ব্যয়ের থেকে কম হয়, তখনই এই অনুসন্ধানের কাজটি সফল হয়। এই কম নিষ্কর্ষণ ব্যয় সম্পন্ন নতুন সম্পদের আবিষ্কার আগের সম্পদটির বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয় বা দামকে কমাতে সাহায্য করে। অর্থাৎ,

কোন একটি সম্পদের ক্রমবর্ধমান নিষ্কর্ষণ ব্যয়কে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা (যার ফলে সহজলভ্য নয় এমন সম্পদের আবিষ্কার সম্ভব) কমানো যেতে পারে। তবে একথা উল্লেখ্য যে, নিঃশেষযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে একটা সময়ের পরে যখন সম্পদটির মোট সঞ্চিত পরিমাণ অনেকটাই কমে আসবে তখন বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয় এবং দামের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

২.২.৩ সম্পদ নিষ্কর্ষণ এবং পরিবেশ ব্যয়

কোন প্রাকৃতিক সম্পদের নিষ্কর্ষণের ফলে সমাজকে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন—কয়লা খননের ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অবনতি বা পাহাড় কেটে জনপদ সৃষ্টি করার ফলে পাহাড়ের সৌন্দর্যহানি ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিবেশ ব্যয়ের সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ সম্পদের মালিক বা উৎপাদক নিষ্কর্ষণের ব্যয় এবং ব্যবহার ব্যয় বহন করে থাকে। কিন্তু সে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বহন করে না বলে পরিবেশ ব্যয় তার নিষ্কর্ষণের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু যদি পরিবেশ ব্যয়টিও তার মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে সম্পদের দাম বৃদ্ধি পেত এবং চাহিদা হ্রাস পেত। সেক্ষেত্রে সম্পদ নিষ্কর্ষণের পরিমাণ কম হওয়ায় সম্পদটি অনেকদিন সঞ্চিত থাকতে পারত। অন্যথায় নিষ্কর্ষণের ব্যয় এবং দাম কম হওয়াতে নিষ্কর্ষণ বেশি হয়ে অল্পদিনের মধ্যে সম্পদটি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

২.৩ পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদ

আগের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এর পরিমাণ স্থির নয় এবং ব্যবহারের হার কমিয়ে বা বাড়িয়ে তা বাড়ানো বা কমানো যায়। যদি যে হারে সম্পদটির প্রাকৃতিক বৃদ্ধি হচ্ছে, তার থেকে তার ব্যবহারের হার কম (বেশি) হয়, তাহলে সম্পদটির পরিমাণ সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি (হ্রাস) পাবে। যেমন, যে হারে কোন এক ধরনের গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে তার থেকে সেই গাছ লাগানোর হার যদি বেশি হয়, তাহলে সেই ধরনের গাছের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। তবে উল্লেখযোগ্য যে, যেকোন সম্পদের পরিমাণ একটি সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্তই বাড়তে পারে এবং তা নির্ভর করে পরিবেশের বহনক্ষমতা (carrying capacity)-এর ওপর। কোন একটি পুকুরে যদি কোন মাছ না ধরা হয়, তবে মাছের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়বে কিন্তু এই বৃদ্ধি অনির্দিষ্টভাবে চলতে পারে না, এবং পুকুরের আকার, আয়তন, জলের পরিমাণ, জলের প্রকৃতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে মাছের সর্বাধিক সংখ্যা। পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে এই প্রাকৃতিক বৃদ্ধির সাথে সাথে তার ব্যবহারও চলতে থাকে। এই ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারে কিন্তু যদি তা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে সম্পদটির প্রাকৃতিক বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যায় এবং বসবাসকারী কোন প্রজাতির ধ্বংসের কারণে সম্পদের পরিমাণ ন্যূনতম সীমার থেকেও কমে যায়, তবে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ব্যাহত হবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য ক্রমশঃ নষ্ট হতে থাকবে।

সুতরাং, নিঃশেষযোগ্য সম্পদের মতোই পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রেও কাম্য ব্যবহার হার নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী। বর্তমান আলোচনায় আমরা এই সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্ব (theorem) প্রতিষ্ঠিত করব। আলোচনার সময় কিছু কিছু সম্পদ, যেমন, সূর্যকিরণজাত শক্তি বা সমুদ্রের ঢেউজাত শক্তি, যেগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে পৃথিবীতে আসে, সেগুলিকে আলোচনার বাইরে রাখব। যখন আমরা কোন একটি প্রজাতি সম্পর্কে আলোচনা করব তখন অনুমান করে নেব যে, একটি প্রজাতি অন্য কোন প্রজাতির ওপর নির্ভরশীল নয়। যদিও আমরা জানি যে, যেকোন প্রজাতিই অস্তিত্বের জন্য অন্যান্য প্রজাতিগুলির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল, তবুও আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রজাতির পারস্পরিক অনির্ভরশীলতার অনুমানটি প্রয়োজন।

২.৩.১. সম্পদের বৃদ্ধিরেখা

নীচের 2.3 নং ছবিতে সময়ের সাথে সাথে কোন একটি প্রাকৃতিক পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি কিভাবে হয়, তা দেখান হল।

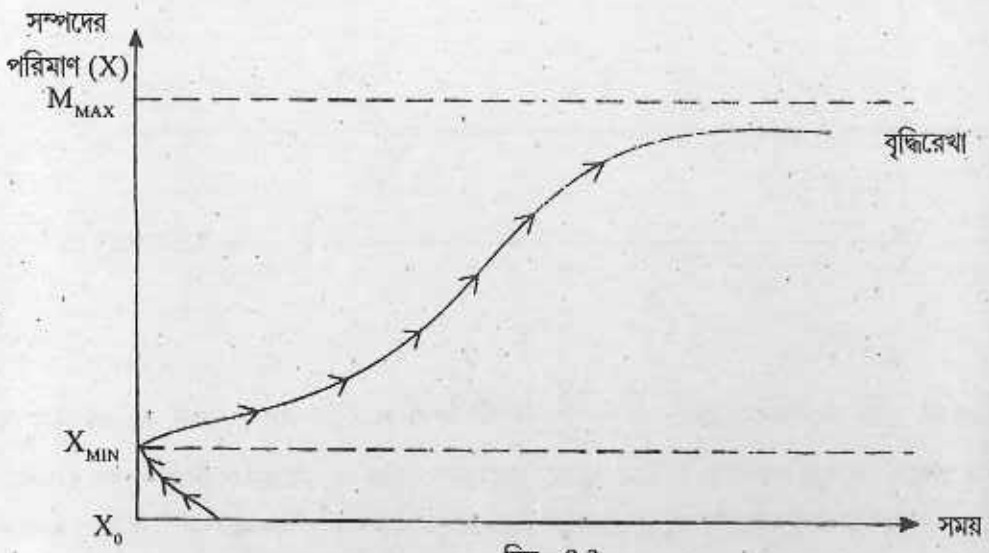

চিত্র—2.3

মনে করা যাক, উপরের ছবিতে যে সম্পদটির বৃদ্ধিরেখা আঁকা হয়েছে, সেটি একটি মাছ। ছবির বৃদ্ধিরেখাটি একটি লজিস্টিক (Logistic) অপেক্ষক*। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, প্রথমাবস্থায় যখন মাছের সংখ্যা খুব কম থাকে তখন সংখ্যাবৃদ্ধি খুব বেশি হারে হয়। কিন্তু যখন মাছের সংখ্যা এমনভাবে বেড়ে যায় যে মাছগুলিকে খাবারের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তখন সংখ্যাবৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং মাছের সংখ্যা পরিবেশের বহনক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত সর্বাধিক সংখ্যা (X_{MAX})

* একটি Logistic অপেক্ষককে আমরা $y = \frac{C}{1+ac^{-bt}}$ সমীকরণের সাহায্যে লিখি। এখানে t = সময়কাল

$a > 0, b > 0, C > 0$। a, b, c স্থির। অর্থাৎ এখানে $t \to \infty$ মানে $y \to c$।

সমান হওয়ার দিকে এগোয় (converge করে)। মাছের একটি সর্বনিম্ন সংখ্যা (X_{MIN}) থাকে যার থেকে মাছের পরিমাণ কম হলে সেই প্রজাতির মাছটি অবলুপ্ত হয় (অর্থাৎ $X = X_0$)।

এই বৃদ্ধিহারটিকে অন্যভাবেও দেখানো যেতে পারে। নীচের 2.4 নং চিত্রে সমান্তরাল অক্ষে মাছের সংখ্যা এবং অনুভূমিক অক্ষে বৃদ্ধিহার মাপা হচ্ছে। বৃদ্ধিহারকে X দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

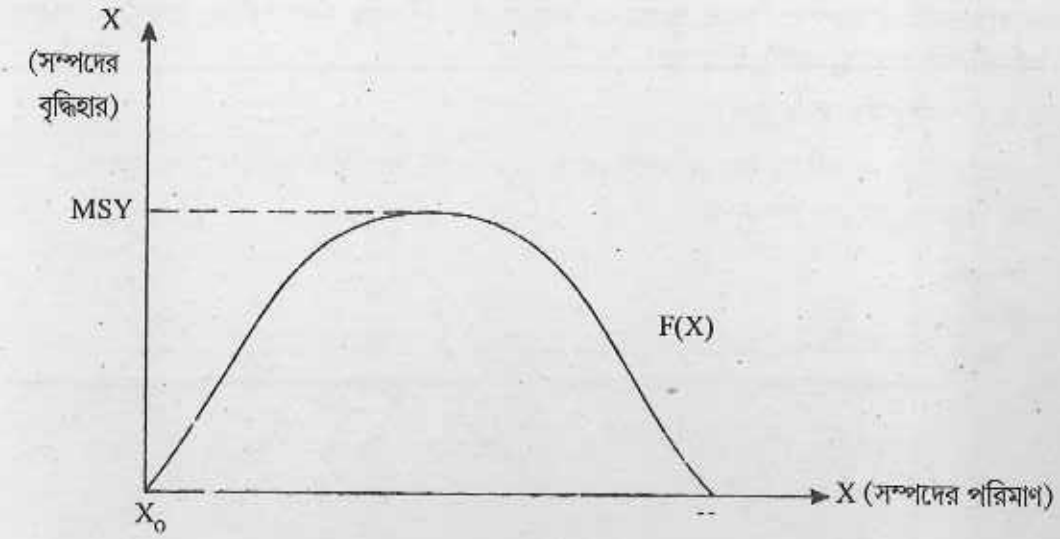

চিত্র—2.4

F (X) রেখাটি বৃদ্ধি অপেক্ষক রেখা। $X=\frac{dX}{dt}$ চিহ্নটি দ্বারা সময়ের সাথে সাথে X-এর সংখ্যার পরিবর্তনের হারকে বোঝায়। ওপরের ছবিতে আমরা অনুমান করেছি যে, মাছের সর্বনিম্ন সংখ্যা হল শূন্য (অর্থাৎ $X_{MIN} = 0$)। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, মাছের সংখ্যার সাথে সাথে বৃদ্ধিহার ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং একটি সর্বোচ্চ হারে পৌঁছবার পর এই বৃদ্ধিহারটি ক্রমশঃ কমতে কমতে মাছের সংখ্যা যখন পরিবেশের বহনক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যায় পৌঁছয়, তখন বৃদ্ধিহার শূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ মাছের সংখ্যা আর বাড়তে পারে না। এখানে অনুমান করা হয়েছে যে কোন মাছ ধরা হচ্ছে না। মাছের এই সর্বাধিক বৃদ্ধিহারকে বলা হয় সর্বাধিক বহনযোগ্য সরবরাহ (maximum sustainable yield)। কোন পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদ থেকে যদি সর্বাধিক বহনযোগ্য সরবরাহের অর্থাৎ MSY-এর সমপরিমাণ ব্যবহার করে ফেলা হয়, তাহলে সেই সম্পদটি আবার সৃষ্টি হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে আমরা আবার তার থেকে MSY পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করতে পারব। যদি পুনরায় সৃষ্টি হতে পাঁচ বছর সময় লাগে, তাহলে প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর আমরা MSY পরিমাণ ব্যবহার করতে পারব। এই MSY-ই হল সেই সর্বাধিক পরিমাণ যে পরিমাণে কোন সম্পদকে ব্যবহার করলে সেই সম্পদটি নিঃশেষিত হয়ে যায় না।

সুতরাং আমাদের সম্পদ ব্যবহার MSY-এর সমান হওয়া উচিত যাতে সম্পদটি পরবর্তী প্রজন্মের ব্যবহার ও প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৃথিবীতে থাকতে পারে।

MSY ধারণাটির সমস্যা হল এটি আর্থিকভাবে দক্ষ বা কাম্য পরিমাণ নির্ধারণে অক্ষম। পরবর্তী আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হবে।

২.৩.২. দক্ষতা এবং বহনযোগ্য সরবরাহ নির্ধারণে নিষ্কর্ষণ এবং চেষ্টার ভূমিকা

সম্পদ ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত তা দেখার জন্য আমরা চেষ্টা (effort)-এর ধারণাটি ব্যবহার করব। সাধারণতঃ বলা যায় সম্পদ ব্যবহারের যে চেষ্টা তা সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণও মোট সম্পদের পরিমাণের অনুপাতের সমান হবে। অর্থাৎ

$E = \frac{H}{X}$, অর্থাৎ $H = EX$।

এখানে E, H ও X-এর দ্বারা যথাক্রমে চেষ্টার পরিমাণ, সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ ও মোট সম্পদের পরিমাণকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। নীচের 2.5 নং ছবিতে সম্পদ সংগ্রহের হারকে দেখান হল। চেষ্টার পরিমাণ কিভাবে ভারসাম্য অবস্থায় সম্পদ সংগ্রহের (harvest) এবং মোট সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করে 2.5 নং ছবিতে তা দেখান হল। যেখানে EX অর্থাৎ মোট সম্পদ সংগ্রহ সম্পদ বৃদ্ধির হারের (X) সমান, সেখানেই

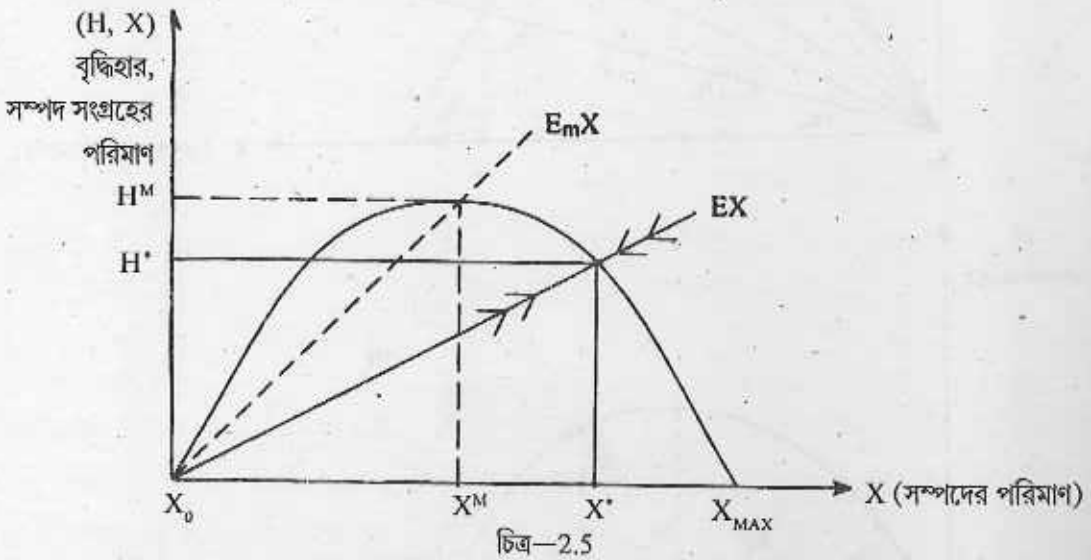

চিত্র—2.5

ভারসাম্য অবস্থা পাওয়া যায়। ওপরের ছবিতে ভারসাম্য অবস্থায় সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ H^* এবং মোট সম্পদের পরিমাণ X^*। EX রেখাটি কোথা দিয়ে যাবে তা নির্ভর করছে E-এর ওপর এবং EX-র স্থান নির্ধারিত হওয়ার পর তার থেকে H^* ও X^* নির্ধারণ করা যায়। X^*-এর ডানদিকে EX রেখার ওপর যেকোন বিন্দুতে সম্পদসংগ্রহ সম্পদের যোগান-এর থেকে বেশি হবে, এবং সম্পদের

পরিমাণ তখন ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকবে। X-এর বামদিকে যেকোন বিন্দুতে সম্পদসংগ্রহ প্রাকৃতিক বৃদ্ধির হার-এর থেকে কম হওয়ায় সম্পদের পরিমাণ বাড়বে।

ওপরের ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে H*-ই সর্বাধিক সম্ভাব্য সম্পদসংগ্রহ নয়, সর্বাধিক সম্পদসংগ্রহ MSY-এর সমান হবে। অর্থাৎ E-কে বাড়িয়ে বা কমিয়ে আমরা সম্পদসংগ্রহের হার নির্ধারণ করতে পারি অর্থাৎ E আমাদের সম্পদের কাম্য ব্যবহার নির্ধারণের উপায় (instrument) হিসাবে কাজ করে। আর এই E-কে কতটা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে তা নির্ভর করছে চেষ্টার ব্যয় ও সম্পদ থেকে আয় (revenue)-এর ওপর।

চেষ্টার পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হয় তা বোঝার জন্য প্রথমে আমরা সম্পদসংগ্রহ এবং চেষ্টার পরিমাণের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করব। নীচের 2.6 নং ছবিটি 2.5 নং ছবি থেকে পাওয়া যায়। এই ছবিতে চেষ্টার

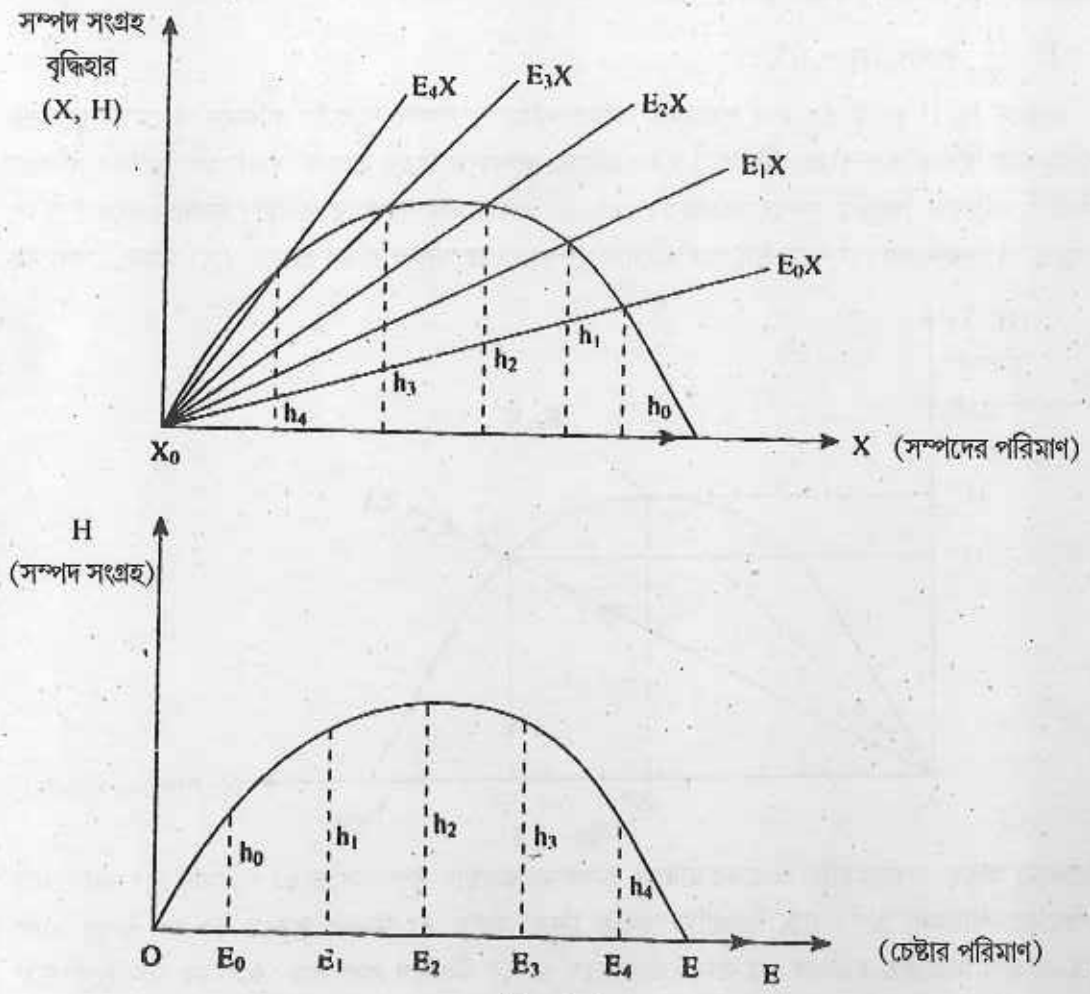

চিত্র—2.6

পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারসাম্য স্থির বিন্দুর পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। ছবিতে $E^4 > E^3 > E^2 > E^1 > E^0$ (EX রেখার ঢাল হল E)। h_0 / h_1 ইত্যাদি বিভিন্ন পরিমাণ চেষ্টার জন্য সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণকে চিহ্নিত করছে। ছবির নীচের অংশে আঁকা রেখাটি থেকে বিভিন্ন E ও সংশ্লিষ্ট h গুলি পাওয়া যায়। এই রেখাটিকে চেষ্টা সম্পদ সংগ্রহ রেখা বলা যায়। এটিকে দেখতে অনেকটা বৃদ্ধিরেখার মত, শুধু এই রেখার সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ ওপরের বৃদ্ধিরেখা থেকেই পাওয়া। সুতরাং ওপরে যখন $X = X_{MAX}$, নীচে চেষ্টার পরিমাণ শূন্য এবং X_0-তে চেষ্টার পরিমাণ $\bar{E}$।

উপরের এই চেষ্টা সম্পদ সংগ্রহ রেখাটি থেকেই আমরা আয় ও ব্যয়রেখা পেতে পারি। চেষ্টাকে উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ হিসাবে ধরে নিলে চেষ্টার পরিমাণকে চেষ্টার দাম (যেমন, মজুরীহার) দিয়ে গুণ করলে মোট ব্যয় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ

$$TC = W. E.$$

W = চেষ্টার দাম বা মজুরী যা স্থির

TC = মোট ব্যয়

সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণকে জিনিসটির দাম দিয়ে গুণ করে মোট আয়রেখা পাওয়া যাবে, অর্থাৎ

$$TR = P. H.$$

TR = মোট আয়

P = দাম (স্থির)

এই TR ও TC রেখাকে নীচে 2.7 নং চিত্রে আঁকা হল, যেহেতু P স্থির, তাই TR রেখাটি চেষ্টা সম্পদ-

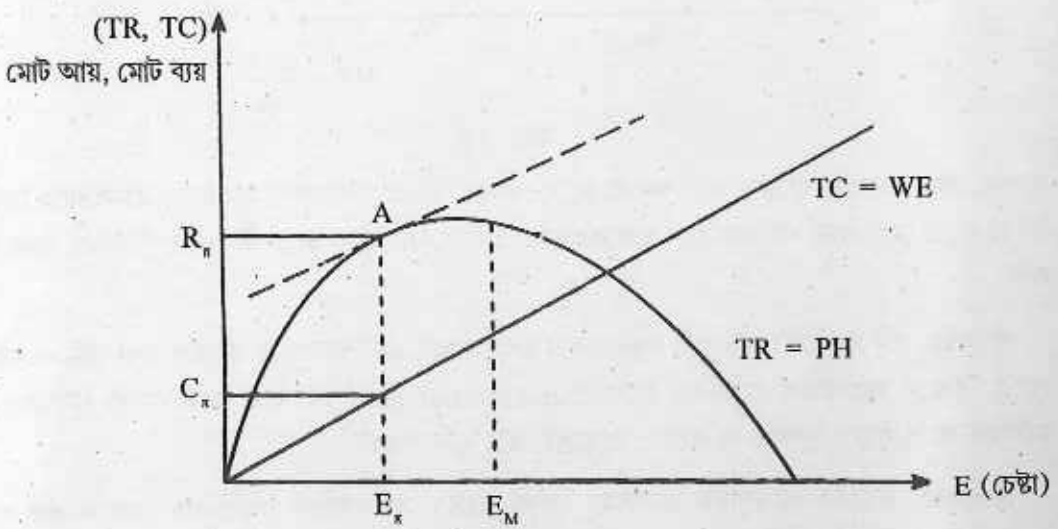

চিত্র—12.7

সংগ্রহ রেখার মতই আকৃতিবিশিষ্ট। TC রেখাটি সরলরেখা এবং এর ঢাল W-এর সমান। উৎপাদক সেই পরিমাণে চেষ্টা প্রয়োগ করবে যেখানে তার লাভ [TR – TC অর্থাৎ (মোট আয়-মোট ব্যয়)] সর্বাধিক হয়। চিত্রানুসারে বলা যায় উৎপাদকের সর্বাধিক লাভদায়ক চেষ্টা বা ভারসাম্য চেষ্টার পরিমাণ হল E_π। কারণ A বিন্দুতে TR ও TC রেখার দূরত্ব অর্থাৎ মোট লাভের পরিমাণ সর্বাধিক।

ওপরের ভারসাম্য অবস্থাটিকে চেষ্টার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখা দ্বারাও দেখানো যেতে পারে (2.8 নং ছবি)। লাভ সর্বাধিক হয় যখন প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়। এখানে প্রান্তিক আয় = $MR = \frac{d(TR)}{d_E}$ অর্থাৎ TR রেখার ঢাল এবং প্রান্তিক ব্যয় = $MC = \frac{d(TC)}{d_E} = W$ অর্থাৎ TC রেখার ঢাল। E_π পরিমাণ চেষ্টাতে MC = MR অর্থাৎ ভারসাম্য পরিমাণ চেষ্টা = E_π। ওপরের আলোচনাতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে সমস্ত

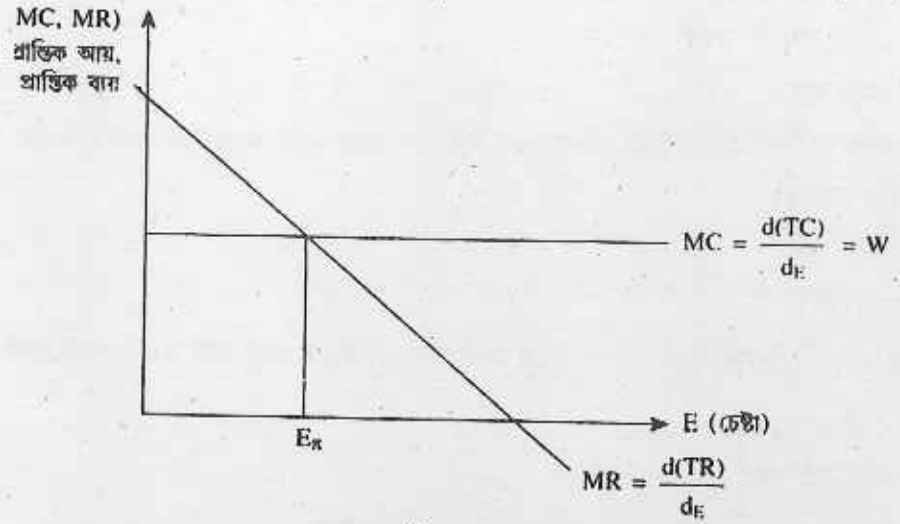

চিত্র—2.8

সম্পদ কোন একজন ব্যক্তির মালিকানায় আছে অথবা বিভিন্ন মালিকেরা একসাথে এমনভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যাতে মোট লাভ সর্বাধিক হয়। ওপরের সমগ্র আলোচনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, যদি সম্পদের মালিকরা নতুন কোন উৎপাদকের এই শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি না করতে পারে, তাহলে আলোচিত অতিরিক্ত লাভ (Supernormal profit) ক্রমশঃ কমে যেতে থাকবে। যদি মালিকানার অধিকার সুস্পষ্ট না থাকে, তাহলেই এটা ঘটা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, সর্বাধিক লাভদায়ক ভারসাম্য বিন্দুটি MSY বা সর্বাধিক বহনযোগ্য যোগান-এর সাথে একই হয়নি। ছবিতে যে পরিমাণ সম্পদ দেখা যাচ্ছে, তা MSY-এর থেকে বেশি (দ্রষ্টব্য : 2.7 নং চিত্র)।

কারণ চেষ্টার পরিমাণ কম হওয়ায় ($E_{\pi} < E_{M}$) সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ কম ও সম্পদের পরিমাণ MSY-এর থেকে বেশি। তাই MSY-কে সামাজিকভাবে কাম্য অবস্থান বলা যায় না।

তৃতীয়তঃ, যদি W খুব বেশি হয় তাহলে লাভ সর্বাধিক করার জন্য সম্পদ-সংগ্রহের পরিমাণ খুব কম হবে অথবা কোন সম্পদ-সংগ্রহ নাও হতে পারে (TC রেখার পুরোটাই যদি TR রেখার ওপরে থাকে)। আবার, চেষ্টার দাম বা W খুব কম হলে বা শূন্য হলে TC রেখাটি সমান্তরাল অক্ষ বরাবর থাকবে এবং MSY থেকে পাওয়া বিন্দু ও সর্বাধিক লাভদায়ক ভারসাম্য বিন্দুটি একই হবে।

চতুর্থতঃ, একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট যে সর্বাধিক লাভ করলেই কোন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। বিলুপ্তি নির্ভর করবে অন্য অনেক বিষয়ের ওপর।

পঞ্চমতঃ, ওপরের আলোচনায় সময়কে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়েছে যে সম্পদের মালিকদের ভবিষ্যতের জন্য ডিসকাউন্টের হার শূন্য। এখানেও যদি নিঃশেষযোগ্য সম্পদের মতই ব্যবহার-ব্যয়ের ধারণাটি আনা হত, ভারসাম্য বিন্দুটি তাহলে পরিবর্তিত হয়ে যেত।

২.৩.৩ বাধাহীন অধিকার এবং সর্বসাধারণের সম্পত্তি (Open/free access and common-property solutions)

আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি তাতে পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদটিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন হিসাবে ধরা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু সম্পদ সাধারণের সম্পত্তিও হতে পারে। সাধারণের সম্পত্তি যে সমস্ত সম্পদ, সেগুলি আসলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর—যেমন, কোন সম্প্রদায় বা জাতি—সম্পত্তি। সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সকলেরই সেই সম্পদে অবাধ অধিকার থাকতে পারে। কিন্তু, এক্ষেত্রে সাধারণতঃ সম্পদ ব্যবহারের কিছু নিয়মাবলী গড়ে ওঠে এবং গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যেকোন ব্যক্তির সম্পদ ব্যবহারের একটা সীমারেখা টানা থাকে। তা না হলে সম্পদের অবাধ ব্যবহারের কারণে কোন প্রজাতির অবলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। এহ ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিন্দুটি সর্বাধিক লাভদায়ক বিন্দুর ডানদিকে অবস্থান করে।

কিছু কিছু সম্পদের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের অবাধ অধিকার থাকে। যেমন, সমুদ্র আন্তর্জাতিকভাবে সাধারণ সম্পত্তি এবং সেজন্য তিমিমাছের ওপর কোন দেশ বা ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকার নেই। এই অবাধ-অধিকারমুক্ত সম্পদ দুই ধরনের বাহ্যিকতার সৃষ্টি করে : (1) সমসাময়িক বাহ্যিকতা যা কেবলমাত্র বর্তমান প্রজন্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। যেমন, সমুদ্রে অসংখ্য মাছ ধরার নৌকার উপস্থিতি ভীড় সৃষ্টি করে এবং তার ফলে প্রত্যেক জেলেই বেশি চেষ্টা দিয়ে কম পরিমাণ মাছ ধরতে পারে। (2) একটি আন্তঃপ্রজন্ম বাহ্যিকতা, যার ফল ভোগ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বর্তমান প্রজন্ম মাছ বেশি ধরলে মাছের পরিমাণ খুব কমে যাবে এবং তার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মাছ ধরা থেকে কম লাভ করতে পারবে।

অবাধ ব্যবহারের সম্পদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লাভ হলে ক্রমশঃ নতুন লোক এই সম্পদ সংগ্রহের

কাজে বিনিয়োগ করবে এবং সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ ততটাই হবে যখন উৎপাদনকারীরা কেবলমাত্র স্বাভাবিক (normal) লাভই করবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সম্পদের ব্যবহার বেশি মাত্রায় হবে।

নীচের ছবিতে E_{OA} এবং H_{OA} এই অবাধ ব্যবহারযুক্ত সম্পদগুলির ক্ষেত্রে চেষ্টা এবং সংগ্রহের পরিমাণ সূচিত করছে।

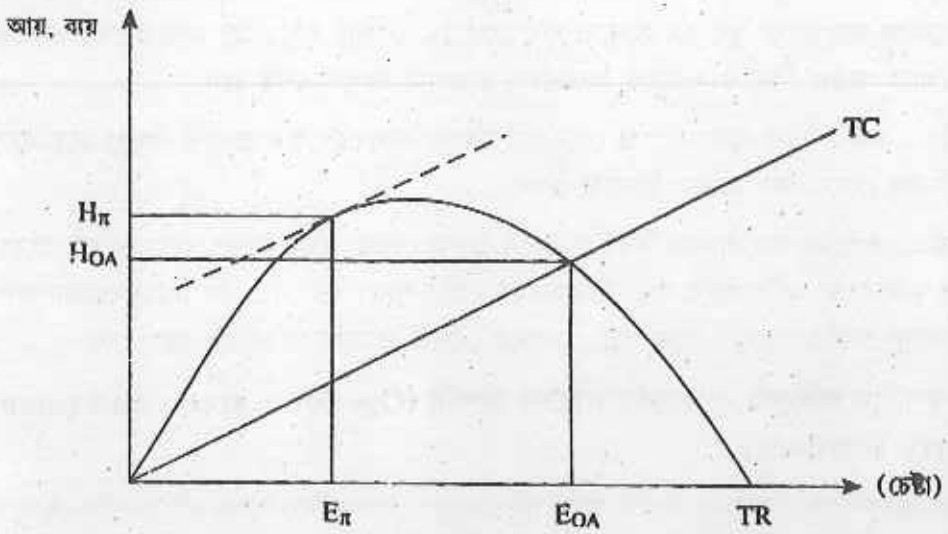

চিত্র—2.9

এক্ষেত্রে ভারসাম্য বিন্দুটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির ভারসাম্য বিন্দুর ডানদিকে থাকবে। যদি কোন লোকের সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে, তাহলে সে সম্পদের ভবিষ্যৎ আয়কেও হিসাবে আনবে, আর যখন সম্পত্তির ব্যবহার অবাধ তখন সম্পদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নিয়ে ব্যবহারকারীরা কেউই চিন্তিত হয় না এবং প্রত্যেক উৎপাদক তখন বেশি করে সম্পত্তি ব্যবহার করবে। তাই অবাধ অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে সবসময়েই যে বিলুপ্তি হবে তা নয়। প্রজাতির প্রকৃতি এবং সম্পদের পরিমাণ X_{MIN}-এর থেকে কমে গেলে তখন সম্পদ-সংগ্রহের ব্যয় ও তা থেকে প্রাপ্ত লাভের ওপর নির্ভর করবে বিলুপ্তির সম্ভাবনা কতটা। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে যায়।

(ক) যদি চেষ্টার কোন খরচ না থাকে, তখন চেষ্টা সর্বাধিক হয় এবং সম্পদের পরিমাণ গিয়ে পৌঁছয় O-তে।

(খ) যদি সম্পদের প্রাকৃতিক বৃদ্ধিহারের থেকে সম্পদ-সংগ্রহের হার বেশি হয়।

প্রজাতির অবলুপ্তির সম্ভাবনা বেশি থাকে যদি সম্পদের পরিমাণের একটি সর্বনিম্ন সংখ্যা (critical minimum level) থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, সাধারণের অধিকারযুক্ত সম্পদ আর অবাধ ব্যবহারযুক্ত সম্পদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যেখানে অবাধ ব্যবহারযুক্ত সম্পদের ক্ষেত্রে সকলেই যত খুশি সম্পদ ব্যবহার করতে পারে, সেখানে সাধারণের অধিকারযুক্ত সম্পদের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের জন্যই সম্পদ ব্যবহারের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলী থাকে। কারণ সম্পদের অবাধ ব্যবহারের ফলে প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেলে সকলেরই হিতের পরিমাণ কমে যাবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের এই ক্ষতিকে পূরণ করা যাবে না। সাধারণতঃ দেখা যায়, সাধারণের সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিন্দুটি ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্ষেত্রের ভারসাম্য বিন্দু ও অবাধ অধিকারের ক্ষেত্রের ভারসাম্য বিন্দুর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে। সাধারণের সম্পত্তির এই সুবিধাটি নষ্ট হয়ে যায় যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার ফলে জনগোষ্ঠীর আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে তার অন্তর্ভুক্ত লোকেরা নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করে তাদের ব্যক্তিগত লাভ সর্বাধিক করতে চায়।

২.৪ সম্পদের অপ্রতুলতা

এই এককের 2.2 নং অংশে আমরা নিঃশেষযোগ্য সম্পদ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি তাতে যে প্রশ্নটি আমাদের মনে জাগে তা হল যে, সত্যিই কি প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমশঃ অপ্রতুল হয়ে পড়ছে? সম্পদের প্রকৃত ব্যবহারের হার সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকেই এই ধরনের প্রশ্ন জাগে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রয়োজন সম্পদের অপ্রতুলতাকে পরিমাপ করার।

সম্পদের অপ্রতুলতাকে পরিমাপ করার আগে প্রথমেই দেখে নেওয়া প্রয়োজন অপ্রতুলতা বলতে আমরা কি বুঝি। সাধারণতঃ যদি বাজারে কোন দ্রব্যের একটি ধনাত্মক দাম (Positive price) থাকে, তাহলেই বলা হয় যে দ্রব্যটি অপ্রতুল। অর্থনীতিবিদ ফিশার কোন দ্রব্যের অপ্রতুলতাকে পরিমাপ করার আদর্শ নির্দেশক-এর সম্বন্ধে বলেছেন যে, আদর্শ নির্দেশক (indicator) এক একক সম্পদ পাওয়ার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সেগুলিকে পরিমাপ করে।

সম্পদের অপ্রতুলতা পরিমাপক নির্দেশকগুলি নানা ধরনের হতে পারে। সেগুলি হল—(1) প্রাকৃতিক সম্পদের দাম, (2) যে জমিতে কোন প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সেই জমির ভাড়া (rent), (3) সম্পদ নিষ্কর্ষণের ব্যয় এবং (4) যে নির্দেশকগুলি প্রাকৃতিক সম্পদকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করার সময়ে কিভাবে মূলধন ও শ্রম ব্যবহৃত হচ্ছে তার পরিমাপ করে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকগুলি হল দাম ও নিষ্কর্ষণ ব্যয়।

অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর মতানুসারে, যত বেশি সম্পদের ব্যবহার হবে তত তা নিষ্কর্ষণের ব্যয় বাড়তে থাকবে। কারণ সময়ের সাথে সাথে আমাদের কম খরচসম্পন্ন সম্পদ নিষ্কর্ষিত হয়ে গেলে আরও

নিষ্কর্ষণের জন্য বেশি খরচ করতে হয়। অর্থাৎ সম্পদ যত অপ্রতুল হতে থাকে, তার নিষ্কর্ষণের ব্যয় তত বেড়ে যায়। আর নিষ্কর্ষণের ব্যয় বেশি হলে স্বাভাবিকভাবেই দামও বেড়ে যাবে।

দাম ও নিষ্কর্ষণ ব্যয়—এই দুটি নির্দেশকের ওপর ভিত্তি করে অপ্রতুলতা তত্ত্বটি (scarcity hypothesis) গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্বটিকে দুটিভাবে বলা হয়। প্রথমটি, যাকে বলা হয় জোরালো ভাষ্য (strong version), বলে যে এক একক সম্পদ নিষ্কর্ষণের ব্যয় সময়ের সাথে সাথে বাড়া উচিত। আর দুর্বল ভাষ্য (weak version) অনুসারে, অ-নিষ্কর্ষী দ্রব্যের তুলনায় নিষ্কর্ষী (extractive) দ্রব্যের খরচ সময়ের সাথে সাথে বাড়া উচিত। এই ভাষ্যটি সময়ের সাথে সাথে প্রযুক্তিগত উন্নতি যেভাবে খরচকে কমায় সেই ব্যাপারটিকে মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে।

অপ্রতুলতা তত্ত্বকে বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখার জন্য যা যা গবেষণামূলক কাজ হয়েছে, সেগুলি এই তত্ত্বকে সমর্থন করে না। এমনকি, ব্যবহার ব্যয়ের কারণে নিঃশেষযোগ্য দ্রব্যের দাম যে অন্যান্য দ্রব্যের দামের তুলনায় বেশি বাড়বে—এই তত্ত্বটিও বাস্তবে প্রমাণ করা যায়নি। অপ্রতুলতা তত্ত্বের অসাফল্যের কারণগুলি নীচে বর্ণনা করা হল।

প্রথমত, উচ্চমানের সম্পদ যত নিঃশেষিত হতে থাকে, ততই নিম্নমানের সম্পদকে অনেক বেশি পরিমাণে খুঁজে পাওয়া যায়। আর নতুন সম্পদ আবিষ্কার যত বেশি হয়, মানের এই পার্থক্য তত কমতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, একটি সম্পদের দাম যত বাড়তে থাকে, তার চাহিদাও কমে যায় যেহেতু মানুষ তখন বেশি পরিমাণে বিকল্প দ্রব্য ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ চাহিদা হ্রাসের মাধ্যমে অপ্রতুলতার ব্যাপারটি কমে যায়।

এই এককটি প্রস্তুত করতে Pearce এবং Turner-এর *Environmental and Resource Economics* এবং R. N. Bhattacharya সম্পাদিত *Environmental Economics—An Indian Perspective* বই দুটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং সম্পদের নতুন ভাণ্ডার আবিষ্কার—এই দুইয়ের মাধ্যমে নিষ্কর্ষণ ব্যয় এবং দাম কমতে থাকে। এছাড়াও প্রযুক্তির উন্নতির কারণে আমরা সম্পদটিকে দক্ষভাবে ব্যবহার করতে শিখি।

২.৫ সারাংশ

আমরা এই এককে যা আলোচনা করেছি তার সারাংশ নীচে লিপিবদ্ধ করা হল।

- প্রাকৃতিক সম্পদ সাধারণতঃ দুই প্রকার—নিঃশেষযোগ্য ও পুনর্গঠনযোগ্য। যে সমস্ত সম্পদ একবার ব্যবহার করে ফেললে সেগুলিকে আর তৈরি করা যায় না, তাদের বলে নিঃশেষযোগ্য সম্পদ। যে

সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করলেও যুক্তিগ্রাহ্য সময়ের মধ্যে আবার তারা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হতে পারে, তাদের বলে পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদ। কয়লা এবং বনভূমি যথাক্রমে একটি নিঃশেষযোগ্য এবং একটি পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদের উদাহরণ।

- নিঃশেষযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে বর্তমানের ভোগ ভবিষ্যতের ভোগের সুযোগকে নষ্ট করে দেয় বলে এক্ষেত্রে ব্যবহার-ব্যয় বা প্রয়োগ-ব্যয় বা সুযোগ-ব্যয়ের ধারণাটি আনা হয়। এক একক সম্পদকে বর্তমানে ব্যবহার না করলে ভবিষ্যতে তা থেকে সর্বাধিক যে আয় পাওয়া যেত, সেটিই সম্পদটিকে বর্তমানে ব্যবহার করার সুযোগ-ব্যয়। এই ধরনের দ্রব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য অবস্থায় দাম নিষ্কর্ষণের প্রান্তিক-ব্যয় ও সুযোগ-ব্যয় বা ব্যবহার-ব্যয়ের যোগফলের সমান হয়।

- কোন নিঃশেষযোগ্য সম্পদের ব্যবহার যখন মাত্র দুটি প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, তখন কাম্য নিষ্কর্ষণের শর্তটি হল যে কোন উৎপাদক কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণ রেখার ওপর যেকোন বিন্দুতে সম্পদটির বর্তমান নিষ্কর্ষণ বা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিরপেক্ষ। এটিই কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের মৌলিক শর্ত।

- নিঃশেষযোগ্য সম্পদের বিকল্প দ্রব্য থাকলে সম্পদের দাম বা বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয় বিকল্পের প্রান্তিক ব্যয় পর্যন্তই বাড়তে পারে, তার বেশি বাড়ে না।

- নিঃশেষযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতি নিষ্কর্ষণের প্রান্তিক ব্যয়কে কমিয়ে দেয়। আর যদি এই সম্পদ নিষ্কর্ষণের কারণে পরিবেশের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার জন্য নিষ্কর্ষণের ব্যয়ের সাথে একটি পরিবেশ ব্যয় যোগ করা হয়, তাহলে নিষ্কর্ষণের মোট প্রান্তিক ব্যয় বেড়ে যায় এবং চাহিদা হ্রাস পায়। সেক্ষেত্রে সম্পদটি অনেক বেশি দিন সঞ্চিত থাকতে পারে।

- পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে সম্পদটির প্রাকৃতিক বৃদ্ধিহার যদি সম্পদ ব্যবহারের হারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সময়ের সাথে সাথে সম্পদটির পরিমাণ বাড়তে থাকবে। সম্পদের সর্বাধিক বৃদ্ধি হারকে বলা হয় সর্বাধিক বহনযোগ্য সরবরাহ (MSY)। একটি তত্ত্ব অনুসারে, সম্পদ ব্যবহারের হার MSY-এর সমান হওয়া উচিত।

- সম্পদ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা এবং তার খরচকে যদি আলোচনায় আনা যায়, তবে সর্বাধিক লাভদায়ক বিন্দুতে চেষ্টার প্রান্তিক ব্যয় সম্পদের প্রান্তিক আয়ের সমান হবে। এটিই কাম্য অবস্থা। কাম্য অবস্থায় সম্পদের পরিমাণ MSY-নীতি অনুসারে সম্পদের পরিমাণের সমান না-ও হতে পারে। অর্থাৎ MSY নীতি অর্থনৈতিকভাবে অদক্ষ।

- সম্পদের ব্যবহার অবাধ হলে (free/open access) সম্পদটির অবলুপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আর যে সমস্ত সম্পদ কোন একটি জনগোষ্ঠীর অধিকারে থাকে, সেই সমস্ত সম্পদ বেশিদিন স্থায়ী হয়, কারণ এর ব্যবহারের হার কম।
- কোন সম্পদের যদি বাজারে দাম থাকে তবে বলা হয় সেটি অপ্রতুল। অপ্রতুলতার প্রধান দুইটি নির্দেশক হল সম্পদের দাম ও নিষ্কর্ষণ ব্যয়। সময়ের সাথে সাথে কোন সম্পদ অপ্রতুল হয়ে যায়—সম্পদের এই অপ্রতুলতা তত্ত্বটি প্রযুক্তিগত উন্নতি, নতুন সম্পদ ভাণ্ডার আবিষ্কার, বিকল্পের অস্তিত্ব ইত্যাদি কারণে বাস্তবে প্রমাণ করা যায়নি।

২.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

(1) প্রাকৃতিক সম্পদ কয়প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের সংজ্ঞা দিন।

(2) একটি নিঃশেষযোগ্য সম্পদের সাথে একটি সাধারণ দ্রব্যের পার্থক্য কী? উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন?

(3) সুযোগ ব্যয় কাকে বলে?

(4) 'সাধারণের সম্পত্তি' বলতে কিরকম সম্পদকে বোঝানো হয়?

(5) সম্পদের অবাধ অধিকার বলতে কী বোঝায়?

(6) সম্পদের অপ্রতুলতার নির্দেশকগুলি কী কী?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বিশদভাবে আলোচনা করুন :

(7) নিঃশেষযোগ্য সম্পদের কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের প্রথম শর্তটি চিত্রসহ আলোচনা করুন।

(8) নিঃশেষযোগ্য সম্পদের কাম্য পরিমাণ নিষ্কর্ষণের মৌলিক শর্তটি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(9) একটি নিঃশেষযোগ্য সম্পদের যদি কোন বিকল্প দ্রব্য থাকে, তাহলে সেই সম্পদের বর্ধিত প্রান্তিক ব্যয় ও বিকল্প দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক কি রকম হয় আলোচনা করুন।

(10) পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে MSY-এর ধারণাটি স্পষ্টভাবে আলোচনা করুন।

(11) পুনর্গঠনযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে MSY-এর নীতিটি কি অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ সমাধান দিতে পারে? ছবিসহ আলোচনা করুন।

(12) ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদ, সাধারণের সম্পত্তি এবং অবাধ অধিকারযুক্ত সম্পদ—এই তিনটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

২.৭ উত্তরমালা

(1) সংকেত : নিঃশেষযোগ্য (কয়লা) ও পুনর্গঠনযোগ্য (বনভূমি)। আপনি আরও কয়েকটি উদাহরণ খুঁজে দেখতে পারেন।

(2) সূত্র : নিঃশেষযোগ্য সম্পদ পুনরায় সৃষ্টি হতে কয়েক কোটি বছর লেগে যায়, কিন্তু সাধারণ দ্রব্য মানুষ তৈরি করতে পারে।

(3) সূত্র : দ্রষ্টব্য : ২.২

(4) দ্রষ্টব্য ২.৩.৩

(5) দ্রষ্টব্য ২.৩.৩

(6) দ্রষ্টব্য ২.৪

(7) সূত্র : P = MC + UC = AMC। 2.1 নং চিত্রটি ব্যবহার করুন।

(8) সূত্র : $P_1 - C = (P_0 - C)(1 + r)$ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(9) সূত্র : $P_t = MC + \frac{MC_b - MC}{(1-r)^{T-t}}$। দ্রষ্টব্য : ২.২ ক। 2.2 নং চিত্রটি ব্যবহার করুন।

(10) দ্রষ্টব্য : ২.৩.১ এবং চিত্র 2.4।

(11) সূত্র : চেষ্টা, সম্পদসংগ্রহের পরিমাণ, সম্পদের পরিমাণ এদের সম্পর্ক স্থাপন করে আয় ও ব্যয়ের ধারণাগুলি আলোচনা করে কাম্য ভারসাম্য অবস্থা নির্ধারণ করুন ও MSY-নীতি অনুযায়ী ভারসাম্য অবস্থার সাথে তুলনা করুন। 2.4, 2.5, 2.6 ও 2.7 নং ছবিগুলি ব্যবহার করুন।

(12) সূত্র : ১১ নং প্রশ্নে যে কাম্য ভারসাম্য অবস্থা পেয়েছেন তার সাথে ২.৩.৩-এর আলোচনাকে মিলিয়ে উত্তর দিন। সাধারণের সম্পত্তির ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিন্দুটি ব্যক্তি-মালিকানাধীন সম্পদের ভারসাম্যের ডানদিকে এবং অবাধ-অধিকারযুক্ত সম্পদের ভারসাম্য বিন্দুর বাঁদিকে অবস্থান করবে।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(1) Rabindranath Bhattacharyya (ED) (2000) : *Environmental Economics—An Indian Perspective*, Oxford University Press.

(2) Pearce, D and Turner (1990) : *Economics of Natural Resources and the Environment*. New York : Harvester and Wheatcheef.

(3) Titenberg T. (1998) : *Environmental Economics and Policy, 2nd Ed. U.S.A* Addison-Wesley.

একক ৩ ❐ দূষণ ও বাহ্যিকতা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের একাধিক পদ্ধতি

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ দূষণ, পরিবেশ ও অর্থনীতি

৩.২.১ দূষণ কিভাবে ক্ষতির সৃষ্টি করে

৩.২.২ দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থসমূহের প্রকারভেদ

৩.৩ দূষণ ও বাহ্যিকতা

৩.৪ বাহ্যিকতা ও তার সমাধান

৩.৪.১ সম্পত্তির অধিকার ও রোনাল্ড কোজ-এর তত্ত্ব

৩.৪.২ কোজতত্ত্বের সমস্যা

৩.৫ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতি ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা

৩.৫.১ কর এবং কাম্য পরিমাণ দূষণ

৩.৫.২ কাম্য পরিমাণ পিগোভিয়ান কর নির্ধারণ

৩.৫.৩ করারোপের সুবিধা ও সমস্যা

৩.৫.৪ প্রশমন ব্যয়

৩.৫.৫ অনুশীলনী

৩.৬ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

৩.৬.১ দূষণ সমস্যার সমাধানে সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ ব্যবস্থা

৩.৬.২ কর ও মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা

৩.৬.৩ দূষণ নিয়ন্ত্রণে ভর্তুকী প্রদান

৩.৬.৪ দূষণ সৃষ্টির লেনদেনযোগ্য অনুমতিপত্র প্রদান এবং কাম্য পরিমাণ দূষণ

৩.৬.৫ অনুমতিপত্রের লেনদেন

৩.৬.৬ বিভিন্ন ধরনের অনুমতিপত্র প্রদানব্যবস্থা

৩.৬.৭ অনুশীলনী

৩.৭ সারাংশ

৩.৮ সার্বিক অনুশীলনী

৩.৯ উত্তরমালা

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুগুলিকে সম্যকরূপে বুঝতে পারবেন :

- পরিবেশ সম্পর্কিত অর্থনীতি বলতে কি বোঝায়?
- অর্থব্যবস্থার ওপর পরিবেশ দূষণের প্রভাব,
- অর্থনৈতিক দক্ষতাকে প্রতিষ্ঠিত করার একাধিক উপায় এবং তাদের তুলনামূলক বিচার।

৩.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আমাদের আলোচনার বিষয় পরিবেশ সম্পর্কিত অর্থনীতি (Environmental Economics)। আমরা জানি, পরিবেশ সম্পর্কিত অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় হল পরিবেশ দূষণ এবং অর্থব্যবস্থা ও পরিবেশের ওপর এই দূষণের প্রভাব। এখানে আমরা আলোচনা করব পরিবেশ দূষণ কীভাবে কোন অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক অর্থনৈতিক দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। আর্থিক কাজকর্ম এবং তার থেকে সৃষ্টি হওয়া দূষণ ও তার প্রভাব—এই বিষয়গুলিকে যদি খোলাবাজারের আচরণের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে আমরা একটি অর্থনৈতিকভাবে অদক্ষ জায়গায় অবস্থান করছি। এ কারণে অর্থনৈতিক দক্ষতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা হয়। এই এককে আমাদের আলোচনার বিষয় বিভিন্ন ধরনের উপায় এবং তাদের তুলনামূলক বিচার।

৩.২ দূষণ, পরিবেশ ও অর্থনীতি

প্রথম এককের আলোচনা থেকে আমরা জানি যে, উৎপাদন ও ভোগ প্রক্রিয়ার অবশিষ্টাংশ পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হয়। এই অবশিষ্টাংশগুলি গ্যাসের আকারে বায়ুতে মিশতে পারে এবং তরল বা পূর্ণগর্ভ বস্তুর আকারে জল ও ভূপৃষ্ঠস্থ জমিতে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। আবার কিছু অবশিষ্টাংশ শক্তির (energy) আকারেও থাকতে পারে। যেমন, উৎপাদন থেকে সৃষ্ট উত্তাপ, শব্দ ইত্যাদি। এই অবশিষ্টাংশের কিছুটা পুনঃব্যবহৃত হয় এবং বাকী অংশ পূর্ণগর্ভ বর্জ্য (solid waste) এবং ক্ষতিকর পদার্থ হিসাবে (যেমন, অত্যধিক উত্তাপ, ব্যবহৃত তেল এবং বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ) পরিবেশে থেকে যায় এবং দূষণ সৃষ্টি করে।

অর্থনৈতিক কাজকর্মজাত এই দূষণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কতটা ক্ষতি করবে তা নির্ভর করছে পরিবেশের স্বাঙ্গীকরণের ক্ষমতার ওপর। প্রাকৃতিক ব্যবস্থার এই ক্ষমতা কিছু দূষণ-সৃষ্টিকারী পদার্থকে (pollutant) কিছুটা পরিমাণে অকার্যকরী করে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে এরা আর ক্ষতিকর থাকে না। কিন্তু পরিবেশে এই দূষণ-সৃষ্টিকারী পদার্থগুলির পরিমাণ যখন একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন পরিবেশের স্বাঙ্গীকরণ ক্ষমতা কমে যায় এবং দূষণজনিত ক্ষতির সৃষ্টি হয়। নীচের 3.1 নং ছবিতে দূষণের পরিমাণ ও ক্ষতির সম্পর্ক দেখান হল।

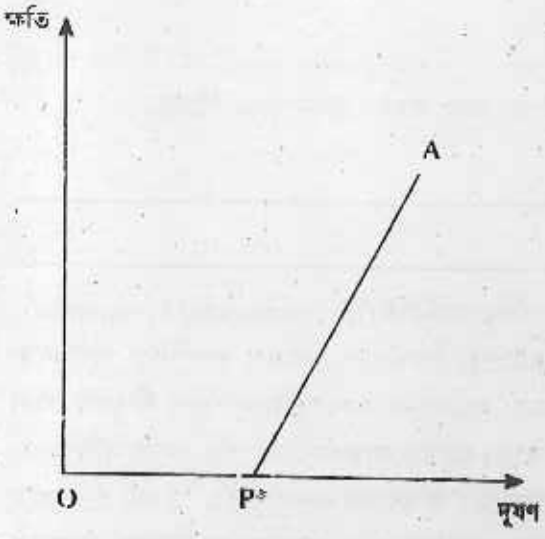

চিত্র—3.1a

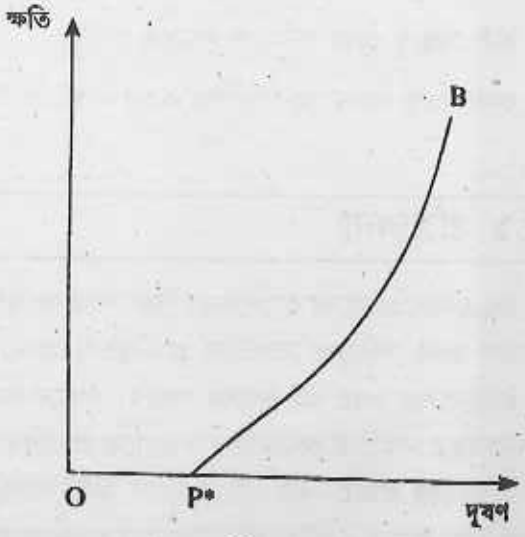

চিত্র—3.1b

উপরের (3.1a) ও (3.1b) নং ছবি দুটিতে দেখা যাচ্ছে যে, দূষণের সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রা (P*) পরে ক্ষতির পরিমাণ দূষণের পরিমাণের সাথে সাথে নির্দিষ্ট (3.1a) বা বর্ধিত (3.1b) হারে বাড়তে থাকে। OA ও OB রেখাদুটি দুইরকমের ক্ষতি-অপেক্ষক।

৩.২.১ দূষণ কিভাবে ক্ষতির সৃষ্টি করে

আমরা দেখেছি যে দূষণের পরিমাণ যত বেশি হবে ক্ষতির পরিমাণও তার সাথে সমহারে বা বর্ধিত হারে বাড়তে থাকবে। এখন, যে যেভাবে এই ক্ষতির সৃষ্টি হয় তা আলোচনা করা যাক।

দূষণের ফলে সাধারণতঃ দু'ভাবে ক্ষতির সৃষ্টি হয়। প্রথমত, স্বাস্থ্যের অবনতি হয় এবং দ্বিতীয়ত, উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। দেখা যায় যে, পরিবেশের বিভিন্ন প্রকার দূষণের (বায়ু, জল, ভূমি, শব্দ ইত্যাদি দূষণ) সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর। দূষিত বায়ুতে শ্বাসগ্রহণ বা দূষিত জল পান ইত্যাদি মানবদেহে বিভিন্ন প্রকার রোগের জন্ম দেয়। এই ধরনের রোগের প্রকোপ বেশি হলে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। যেমন, ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা।

উৎপাদনশীলতা হ্রাসও দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত, মাটি, জল ইত্যাদি দূষণের ফলে প্রাকৃতিক উপাদানের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। যেমন, অত্যধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহারে চাষের জমির উর্বরতা কমে যায়। আবার, মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তাদের উৎপাদনশীলতা নষ্ট হয়। এভাবেই অত্যধিক দূষণের ফলে পরিবেশ ও অর্থনীতি—দুই'ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই মোট ক্ষতিকেই ওপরে বর্ণিত ক্ষতি-অপেক্ষকের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

আবার, অত্যধিক পরিমাণে আঞ্চলিক দূষণের ফলে পরিবেশের জৈব-ভারসাম্য (bio-diversity) নষ্ট হয়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পেতে পারে। সর্বোপরি, বর্তমানে যে ধরনের বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত দূষণ সৃষ্টি হয়েছে, তা সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বকেই ক্রমশঃ বিপন্ন করে তুলছে।

৩.২.২ দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থসমূহের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দূষণ-সৃষ্টিকারী পদার্থসমূহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীবিভাগটি করা হয় দূষকের (pollutant) জমার প্রকৃতি থেকে। যখন কোন দূষকের পরিমাণ সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে এবং তার খুব সামান্য অংশই প্রাকৃতিক পরিবেশের অঙ্গীভূত হয়, সেই ধরনের দূষকগুলিকে বলে পুঞ্জীভবনশীল দূষক। যেমন, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, যেগুলি এত ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে অঙ্গীভূত হয় যে বলা যায় এরা সবসময়েই স্থায়ীভাবে থাকে। আরেকটি উদাহরণ হল প্লাস্টিক। যে দূষক পদার্থগুলি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পরিবেশে অঙ্গীভূত হয়, সেগুলিকে বলে অপুঞ্জীভবনশীল দূষক পদার্থ। যেমন, শব্দ। বেশিরভাগ দূষক পদার্থই কিছুটা পরিমাণে পুঞ্জীভবনশীল।

আবার, কিছু কিছু দূষক পদার্থ আছে যেগুলি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই দূষণকে সীমাবদ্ধ রাখে। সেগুলিকে বলা হয় আঞ্চলিক দূষক পদার্থ। যেমন, শব্দদূষক বা দৃশ্যদূষক। আবার কিছু কিছু দূষক পদার্থ বিশ্বব্যাপী দূষণ সৃষ্টি করে। যেমন, অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ফলে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন-এর নির্গমন ওজোন

স্তরকে হ্রাস করে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত দূষণ সৃষ্টি করে। বর্তমান পৃথিবীতে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা সবকটি দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম থেকে সৃষ্ট দূষণের সমষ্টিজাত।

দূষণের উৎসের বিভিন্নতা থেকেও দূষকের প্রকারভেদ করা সম্ভব। যখন কোন একটি কারখানা থেকে ধোঁয়ার আকারে দূষণ সৃষ্টি হয় বা যখন কোন শহরের বর্জ্য তরল পদার্থ মিলিত হয়ে একটি জায়গা দিয়েই প্রকৃতিতে নির্গত হয়, সেই ধরনের দূষক পদার্থগুলির উৎস চিহ্নিত করে তাদের কমানোর চেষ্টা করা সহজ। এগুলিকে বলে **বিন্দু উৎসজাত দূষক**। আবার যখন বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য কলকারখানা এবং বাড়ী থেকে বর্জ্য নদীতে মিশে নদীর নিম্নগতি অঞ্চলে দূষণ ঘটায় (যেমন, গঙ্গাদূষণ), বা যখন রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণে মাটি দূষিত হয়, তখন কোন উৎস কতটা দূষণ সৃষ্টি করছে তা নির্ধারণ করা এবং তার প্রতিকার করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের দূষক পদার্থগুলিকে অ-বিন্দু উৎসজাত দূষক বলা হয়।

এক এক ধরনের দূষক পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি এক এক রকম হয়। যেমন, মাটি দূষণের ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণের যে উপায় অবলম্বন করা হবে, বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে না। আবার, আঞ্চলিক দূষণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি এবং বিশ্বব্যাপী দূষণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি এক নয়। এই এককের পরবর্তী বিভাগগুলিতে আমরা দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

৩.৩ দূষণ ও বাহ্যিকতা

এ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করেছি তা থেকে একথা স্পষ্ট যে, দূষণের ফলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক এককের সমৃদ্ধি বা হিতের (welfare) পরিমাণ কমে যায়। এই হিত বা সমৃদ্ধি বলতে আমরা উপযোগ বা পরিতৃপ্তিকেই বুঝি। দূষণের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, একজন মানুষের কাজকর্ম অন্যদের সমৃদ্ধি কমিয়ে দেয়। যেমন, একটি কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের যদি ক্ষতিপূরণ না দিতে হয়, তাহলে উৎপাদক তার কাজের মাধ্যমে দূষণ সৃষ্টি করে যাবে এবং অন্যদের জন্য বাহ্যিকতা সৃষ্টি করবে। একজনের কাজকর্মজাত এই বাহ্যিকতাকে আমরা সমাজের ওপর একটি বাহ্যিক ব্যয় (external cost) হিসাবে ধরতে পারি। এই বাহ্যিক ব্যয়কে ঋণাত্মক বাহ্যিকতা (negative externality) বা বাহ্যিক আর্থিক অসুবিধা (external diseconomy)-ও বলা হয়। আর যদি অন্যদের সমৃদ্ধি কমে যাওয়ার জন্য উৎপাদক তাদের ক্ষতিপূরণ দেয় তাহলে বলা হয় দূষণের প্রভাবকে অন্তস্থ (internalise) করা হয়েছে।

এখন আমরা দূষণের সামাজিকভাবে কাম্য পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করব। এর জন্য প্রথমেই আমাদের

MNPB বা প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধা (Marginal Net Private Benefit) রেখা এবং প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয় (Marginal External Cost বা MEC) রেখা সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। নীচের 3.2 নং চিত্রে একটি পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন এককের চাহিদা ও প্রান্তিক ব্যয়রেখা আঁকা হয়েছে। প্রান্তিক ব্যয়কে দাম থেকে বিয়োগ করে প্রান্তিক লাভরেখা (Marginal Profit বা M_π) পাওয়া গেছে।

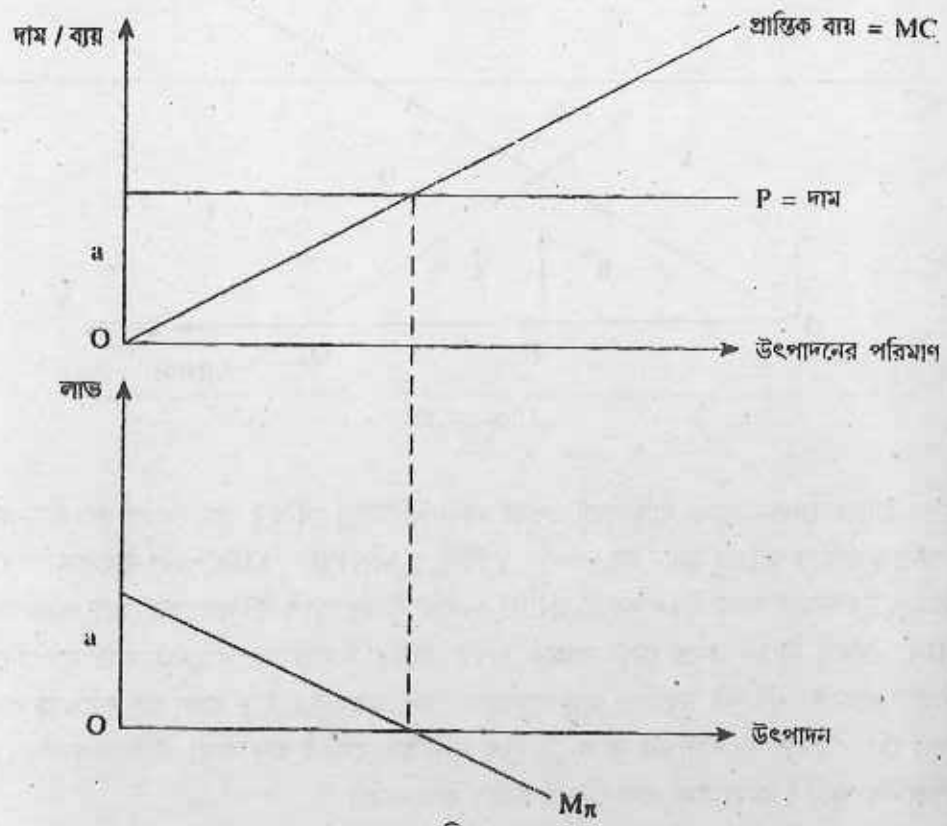

চিত্র—3.2

প্রতি একক উৎপাদন বাড়ালে লাভ কতটা বাড়ে M_π রেখার দ্বারা তা বোঝা যায়। মোট লাভ সবচেয়ে বেশি হয় যখন উৎপাদন বাড়তে বাড়তে এমন হয় যাতে শেষ একক উৎপাদনের প্রান্তিক লাভ হয় শূন্য অর্থাৎ $M_\pi = 0$। এই প্রান্তিক লাভকেই প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধা (Marginal Net Private Benefit) বলা হয় অর্থাৎ M_π রেখাই MNPB রেখা।

MEC বা প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয় রেখার সাহায্যে আমরা প্রতি একক উৎপাদন দূষণের মাধ্যমে অতিরিক্ত যতটা ক্ষতি করে তার মূল্যকে পরিমাপ করি। তাই উৎপাদন যত বেশি হবে, প্রান্তিক ক্ষতি বা প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়ও তত বাড়বে। সেকারণে MEC রেখাটি ধনাত্মক ঢালবিশিষ্ট (দ্রষ্টব্য 3.3 নং ছবি)।

এখন দূষণের কাম্য পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য আমরা MNPB ও MEC রেখার সাহায্য নেব।

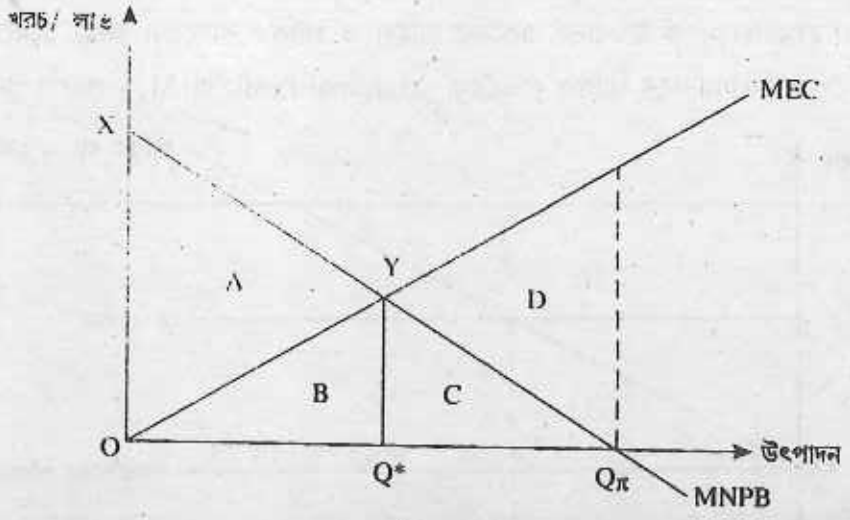

চিত্র—3.3

ওপরের ছবিতে দেখান হচ্ছে, বাহ্যিকতা তখনই কাম্য পরিমাণে পৌঁছায় যেখানে প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধা প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়ের সমান হয়। অর্থাৎ Y বিন্দুতে MNPB = MEC এবং উৎপাদন = Q। এই Q* পরিমাণ উৎপাদনই কাম্য উৎপাদন। MNPB রেখার নীচের অংশ উৎপাদকের মোট ব্যক্তিগত লাভ আর MEC রেখার নীচের অংশ মোট বাহ্যিক ব্যয়। যেহেতু সামগ্রিকভাবে মোট খরচ বাদ দিয়ে নীট সুবিধা যতটা থাকবে সেটিকেই সর্বাধিক করা আমাদের লক্ষ্য, অতএব OXY অংশ হল সব খরচ বাদ দিয়ে নীট লাভ। Q* পরিমাণ উৎপাদনের ফলে যে দূষণ সৃষ্টি হয়, সেটিই হল কাম্য পরিমাণ দূষণ। OYQ* হল দূষণজনিত ক্ষতির কাম্যমাত্রা অর্থাৎ বাহ্যিকতার কাম্যমাত্রা।

উপরে বর্ণিত বিষয়টি নিম্নোক্তভাবেও দেখানো যায়।

Q*-এ MNPB = MEC

কিন্তু, MNPB = P - MC

$\therefore$ P-MC = MEC

$\therefore$ P = MC + MEC = MSC

MSC হল প্রান্তিক সামাজিক ব্যয় (Marginal Social Cost বা MSC) যেটি প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়ের যোগফলের সমান। অর্থাৎ প্যারেটো কাম্য অবস্থার শর্তটি হল P = MSC।

3.3 নং ছবি থেকে আমরা কয়েকটি জিনিস পরিমাপ করতে পারি।

B অংশ = কাম্য পরিমাণ বাহ্যিকতা।

(A+B) ,, = দূষণ-সৃষ্টিকারী উৎপাদকের কাম্য পরিমাণ নীট ব্যক্তিগত সুবিধা।

A ,, = উৎপাদকের নীট সামাজিক সুবিধার কাম্য পরিমাণ।

(C+D) ,, = অ-কাম্য পরিমাণ বাহ্যিকতা যেটাকে আইনকানুন দিয়ে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

C ,, = সামাজিকভাবে অন্যায্য নীট ব্যক্তিগত সুবিধা।

Q_π ,, = সেই পরিমাণ উৎপাদন যা সর্বাধিক ব্যক্তিগত সুবিধা দেয়।

এই ছবি থেকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানতে পারছি তা' হল যখন বাহ্যিকতা থাকে তখন ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থেকে যায়। এই পার্থক্যটাকে দূর না করলে উৎপাদক Q_π পর্যন্ত উৎপাদন করবে যেখানে তার ব্যক্তিগত সুবিধা সর্বাধিক হবে। কিন্তু যেহেতু এখানে বাহ্যিক ব্যয় B+C+D অংশের সমান, সুতরাং নীট সামাজিক সুবিধার পরিমাণ A + B + C – B – C – D = A – D। কিন্তু Q*-এ সামাজিক সুবিধা হল A অংশের সমান। অর্থাৎ Q_π-তে নীট সামাজিক সুবিধা কম। (C + D) পরিমাণ বাহ্যিকতাকে বলা হয় প্যারেটো-প্রাসঙ্গিক কারণ; এটিকে দূর করতে পারলে প্যারেটো উন্নতি হয় অর্থাৎ সামাজিক সুবিধার ক্ষেত্রে নীট লাভ হয়। আর B পরিমাণ বাহ্যিকতাকে বলা হয় প্যারেটো-অপ্রাসঙ্গিক কারণ; একে দূর করলে সামাজিক সুবিধাতে লাভ হয় না।

আমরা জানি যে, পরিবেশের একটি স্বাঙ্গীকরণ ক্ষমতা থাকে যার সাহায্যে নিক্ষিপ্ত বর্জ্যপদার্থগুলি প্রাকৃতিক উপায়ে অক্ষতিকর এমনকি উপকারী জিনিসেও পরিণত হতে পারে। পরিবেশের এই ক্ষমতার কারণে আমরা 3.3 নং ছবির MEC রেখাটিকে অন্যভাবে আঁকতে পারি।

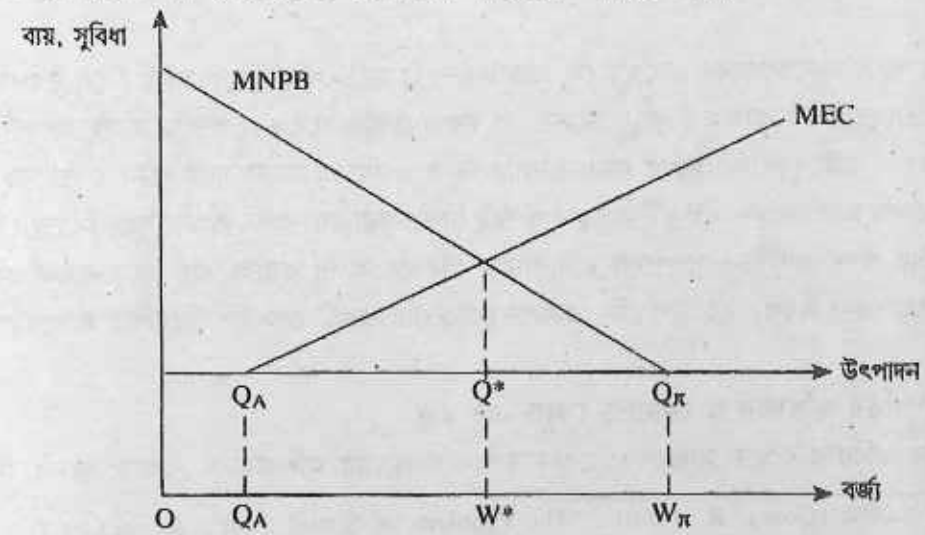

চিত্র—3.4

ওপরের 3.4 নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে MEC রেখাটি O থেকে শুরু না হয়ে কিছু পরিমাণ (Q_A) উৎপাদনের পর শুরু হচ্ছে। অর্থাৎ Q_A-এর কম পরিমাণ উৎপাদনের ফলে সৃষ্ট বর্জ্যপদার্থ প্রাকৃতিক উপায়ে পুরোটাই পরিবেশের অঙ্গীভূত হয়ে আগের পরিবেশকে বজায় রাখছে। অর্থাৎ Q_A-এর থেকে কম পরিমাণ অর্থনৈতিক কাজের জন্য কোন দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে না। এই ছবি থেকে আমরা বর্জ্যপদার্থের কাম্য পরিমাণও পাচ্ছি। অর্থনৈতিক কাজকর্মের সাথে সরাসরি অনুপাতে বর্জ্যপদার্থ সৃষ্টি হয় ধরে নিয়ে কাম্য পরিমাণ Q*-এর জন্য আমরা কাম্য পরিমাণ বর্জ্য (W*) পাই। শুধুমাত্র যখন দূষণ প্রতিরোধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয় তখনই W উৎপাদনের সাথে সরাসরি অনুপাতে বাড়ে না। পরবর্তী বিভাগগুলিতে আমরা এগুলি আলোচনা করব। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, যেহেতু MEC রেখা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে তার ওপর Q ও W-এর কাম্য পরিমাণ নির্ভর করছে না। সুতরাং পরবর্তী আলোচনাতে আমরা 3.3 নং ছবির MEC রেখাটিকেই ব্যবহার করব।

৩.৪ বাহ্যিকতা ও তার সমাধান

অর্থনৈতিক কাজকর্মজাত দূষণ যে বাহ্যিক ব্যয়ের সৃষ্টি করে তাকে কমিয়ে আনার জন্য অর্থাৎ পরিবেশের গুণগত মানকে বজায় রাখার জন্য নানাধরনের নীতি নেওয়া হয়। এই নীতিগুলি কার্যকর করার জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করা হয় সেগুলি সাধারণতঃ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার (institution) মাধ্যমেই কাজ করে। এই ব্যবস্থাগুলি হল— (ক) বাজারব্যবস্থা; (খ) সরকারি নীতি ও (গ) বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী গঠন। সাধারণতঃ দেখা যায়, পরিবেশ রক্ষার জন্য এই তিনপ্রকার ব্যবস্থারই প্রয়োজন রয়েছে।

আগের আলোচনাতে আমরা দেখেছি যে, বাজারব্যবস্থার হাতে পরিবেশকে ছেড়ে দিলে উৎপাদক বা ভোক্তারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সুবিধার্থে সর্বাধিক করার চেষ্টা করবে এবং তার ফলে দূষণের পরিমাণও সর্বাধিক হবে। তাই দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি নীতি ও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী গঠন ও তাদের হাতে পরিবেশ রক্ষার ভার প্রদান—এই দুটি ব্যবস্থার ওপরই নির্ভর করা হয়। এখন আমরা দূষণ-নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ওপর প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানার অধিকার অর্পণ করলে তার কি ফলাফল হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করব। এই উপায়টি রোনাল্ড কোজ্-এর একটি লেখাতে নির্দেশিত হয়েছে।*

৩.৪.১ সম্পত্তির অধিকার ও রোনাল্ড কোজ্-এর তত্ত্ব

সম্পত্তির অধিকার বলতে সাধারণতঃ কোন সম্পদ ব্যবহারের অধিকারকে বোঝায়, যেমন, নিজের

* দ্রষ্টব্য : কোজ্ (Coase, R. 1960) : 'The Problem of Social Cost', *Journal of Law and Economics*. 3, 1-44।

জমি, চাষ করার অধিকার বা প্রাকৃতিক পরিবেশকে নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করার অধিকার। এই ধরনের অধিকার সাধারণতঃ কিছু গৃহীত সামাজিক নিয়মাবলী মেনে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, নিজের জমিতেও কেউ বড় বড় ক্ষতিকারক আগাছা লাগাতে পারে না। যখন কোন জনগোষ্ঠী কোন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার পায়, তখন সেই সম্পদটিকে 'সাধারণের সম্পত্তি' বলে গণ্য করা যায়। যেমন, কোন অঞ্চলে এমন কোন মাঠ থাকতে পারে যেটি সকলেই ব্যবহার করতে পারে।

রোনাল্ড কোজ্-এর তত্ত্বের মূলসুরটি হল যে যদিও বাজারব্যবস্থা কাম্য পরিমাণ বাহ্যিকতায় পৌঁছতে পারে না, তবুও সেই ব্যবস্থাই কাম্য অবস্থানের দিকে নিয়ে যায় যদি সম্পত্তির অধিকার থাকে এবং সেক্ষেত্রে কর বা নির্দিষ্ট দূষণ-মান নির্ধারণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের দরকার হয়না। এখন আমরা জানি যে, নিয়ন্ত্রণের অভাবে দূষণ-সৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি হয়। এখন দেখা যাক, দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কোন লোকের যদি দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার 'অধিকার' থাকে (অর্থাৎ এখানে দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকারটি একটি সম্পত্তির অধিকার) এবং উৎপাদকের যদি দূষণ সৃষ্টির অধিকার না থাকে, তাহলে ভারসাম্য অবস্থান কি হয়।

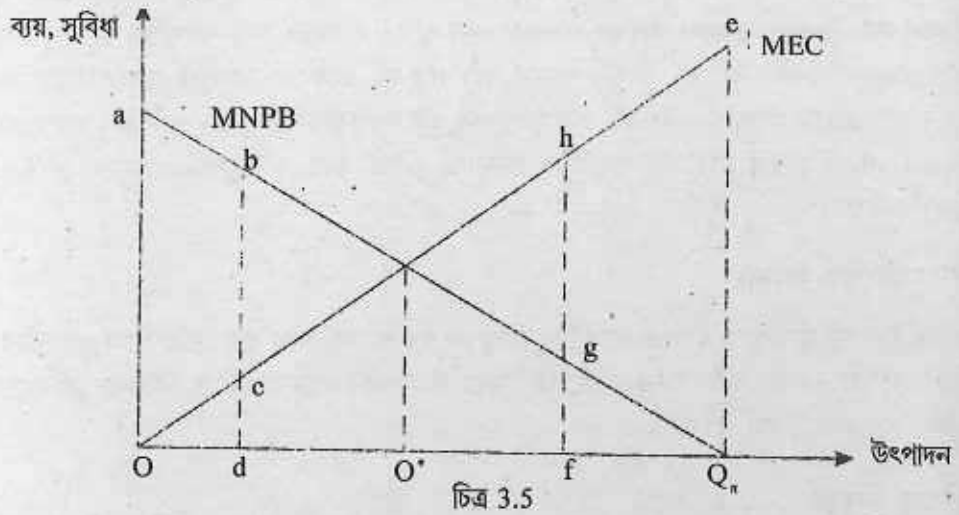

চিত্র 3.5

দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ চাইবে যে কোন দূষণ না হোক, আর উৎপাদক চাইবে কিছু উৎপাদন করতে। এখন দেখা যাক, এই দুই বিপরীত স্বার্থযুক্ত মানুষ তাদের নিজেদের লাভের জন্য কোনরকম দরকষাকষি (bargaining) করতে পারে কি না। মনে করা যাক, সমস্যাটি হল Od পরিমাণ উৎপাদন হবে কি না তার সিদ্ধান্ত নেওয়া (দ্রষ্টব্য : 3.5 নং ছবি)। এখন যেহেতু d বিন্দুতে উৎপাদকের লাভ (Oabd) ক্ষতিগ্রস্ত লোকটির ক্ষতির (Ocd) থেকে বেশি, উৎপাদক ক্ষতিগ্রস্ত লোকটিকে Ocd অঞ্চলের সমান বা তার কিছু বেশি (কিন্তু Oabd অঞ্চলের থেকে কম) পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে উৎপাদন চালাতে পারে। কারণ তাতেও তার কিছু লাভ থাকছে। আর দরকষাকষি করে Ocd-এর বেশি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পেলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরও নীট লাভ হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুজনেই লাভবান হবে। একে বলা হয় প্যারেটো

উন্নতি। d থেকে Q* পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াতে থাকলে এইভাবে প্যারেটো উন্নতি হতে থাকবে। কিন্তু Q*-এর পরে উৎপাদন বাড়াতে গেলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর উৎপাদকের নীট লোকসান হবে। সেজন্য Q*-এর পর উৎপাদন আর বাড়বে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত থাকলে এবং দুই পক্ষের দরকষাকষির সম্ভাবনা বজায় থাকলে বাজার ব্যবস্থাতেই সামাজিকভাবে কাম্য পরিমাণ উৎপাদন হতে পারে।

এবার ধরা যাক, উৎপাদকের পরিবেশ ব্যবহারের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সুতরাং উৎপাদক Q_π পর্যন্ত উৎপাদন করতে চাইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি হওয়ায় সে চাইবে কম উৎপাদন। f বিন্দুতে তার ক্ষতির পরিমাণ Q_π অপেক্ষা fhi Q_π পরিমাণ কম আর উৎপাদকের লাভ fg Q_π পরিমাণে কম। সুতরাং, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উৎপাদককে fg Q_π এর চেয়ে বেশি অথচ fhi Q_π-এর চেয়ে কম পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিলে উৎপাদন হবে of এবং সেক্ষেত্রে দুজনেই লাভবান হবে। এভাবে উৎপাদন Q* পর্যন্ত কমতে পারবে এবং Q*-এর পর আর কমবে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাজারব্যবস্থাতেও যদি উৎপাদক ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকে তাহলে সামাজিকভাবে কাম্য অবস্থাতেই ভারসাম্য হবে। এক্ষেত্রে কার সম্পত্তির অধিকার আছে তার ওপর ভারসাম্য বিন্দুর অবস্থান নির্ভর করবে না। অতএব এক্ষেত্রে সরকারি বাধানিষেধের কোন প্রয়োজনই নেই। এখানে উল্লেখ্য পূর্বশর্তটি হল দু'পক্ষের এই দরকষাকষির কোন লেনদেন ব্যয় (transaction cost) থাকা চলবে না। এই তত্ত্বটিকে রোনাল্ড কোজ্ তার নামানুসারে কোজ্তত্ত্ব (Coase Theorem) বলা হয়।

৩.৪.২ কোজ্তত্ত্বের সমস্যা

কোজ্তত্ত্বটি যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য হলেও এতে কিছু কিছু বিশেষ সমস্যা দেখা যায়। যার ফলে পরবর্তীকালে দূষণ-নিয়ন্ত্রণে সরকারের কার্যকরী ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। নীচে কোজ্তত্ত্বের কয়েকটি সমস্যার কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রতিযোগিতার অবস্থা

আমরা জানি যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় MNPB = P – MC

অর্থাৎ P = MSC।

এখানে MNPB রেখা অনুসারে উৎপাদক দরকষাকষি করে থাকে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকলে MNPB ≠ P – MC এবং অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় MNPB = MR – MC, যেখানে MR হল প্রান্তিক আয় (revenue) এবং P ≠ MR। অর্থাৎ এখানে পূর্বের আলোচ্য উপায়ে বাজারের মাধ্যমে দূষণ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। যেহেতু বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অস্তিত্বই প্রায় নেই, সেহেতু দূষণের মত সমস্যার সমাধান বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে কাম্য অবস্থায় পৌঁছানো যাবে না।

আবার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপূর্ণ প্রতিযোগিতাতেও কোজ্ তত্ত্ব প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন, যদি আমরা (P – MC) কে প্রান্তিক লাভ (marginal profit)- এর বদলে প্রান্তিক উদ্বৃত্ত (marginal surplus) হিসাবে দেখি। নীচের 3.6 নং ছবিতে এটি দেখানো হল।

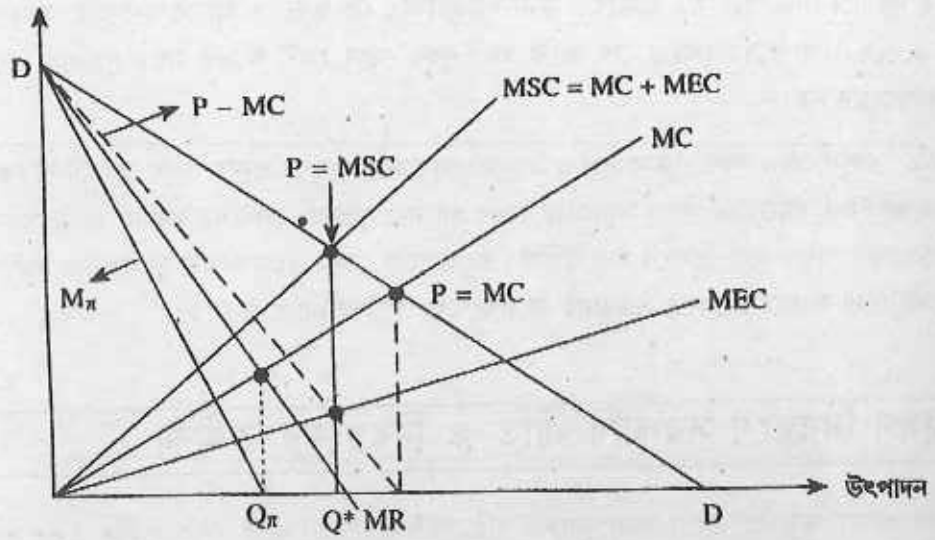

চিত্র—3.6

ওপরের 3.6 নং ছবিতে চাহিদারেখা DD। এখানে MR = MC বিন্দুতে ভারসাম্য হয়েছে। অর্থাৎ $Q = M_\pi$। এখানে $M_\pi = 0$। যদি M_π-এর ওপর উৎপাদকের ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত নির্ভর না করে (P – MC)-এর ওপর করে, তাহলে P – MC = MEC অর্থাৎ P = MSC বিন্দুতেই সামাজিকভাবে কাম্য ভারসাম্য হবে। এখানে $P - MC \neq M_\pi$ এবং (P – MC) রেখা যুক্তভাবে ভোক্তা ও উৎপাদকের উদ্বৃত্তে প্রাজ্ঞিক পরিবর্তনকে সূচিত করছে। অর্থাৎ এখানে উৎপাদক, ভোক্তা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি—সকলেই দরকষাকষির সাথে যুক্ত। বাস্তবে এইধরনের দরকষাকষি লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং কোজ্ তত্ত্ব অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত : বাস্তবে দেখা যায় দুই পক্ষের দরকষাকষিতে কিছু পরিমাণ ব্যয় যুক্ত থাকে যাকে বলে সমস্যার সাথে জড়িত লেনদেন ব্যয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের খুঁজে বার করা ও একজায়গায় আনার ব্যয়, দুইপক্ষকে একত্রিত করার ব্যয়, দরকষাকষিজনিত ব্যয় ইত্যাদিকেই লেনদেন ব্যয় বলা হয়। যদি কোন পক্ষের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ লেনদেন ব্যয়ের থেকে কম হয়, তাহলে সেই পক্ষ দরকষাকষিতে আগ্রহী হবে না। এই ব্যয়টির কারণেই প্রাথমিকভাবে সম্পত্তির অধিকার কার ওপর থাকছে তার ওপর নির্ভর করে কাম্য পরিমাণ দূষণ Q*-এর থেকে কম বা বেশি হতে পারে। সুতরাং দরকষাকষি ব্যবস্থাটি কার্যকর না-ও হতে পারে।

তৃতীয়ত : যদি লেনদেন ব্যয় থেকে সুবিধার পরিমাণ বেশিও হয়, তবুও দরকষাকষি না হতে পারে। যখন কোন উৎস থেকে দূষণ একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে সব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে একত্রিত করা সম্ভব না-ও হতে পারে। আবার, যে সমস্ত দূষণের ফলে একাধিক প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে দূরবর্তী কোন অনাগত প্রজন্মের জন্য দরকষাকষি কে করবে? আবার সকলের ব্যবহারযোগ্য (open access) সম্পদের ক্ষেত্রে কে কাকে ক্ষতিপূরণ দেবে সেটি নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং, এক্ষেত্রেও দরকষাকষি সম্ভব নয়।

চতুর্থত : কোন কোন দূষণ, যেমন জল ও বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে দূষণের প্রকৃত উৎস কোনটি বা কোনগুলি তা' জানা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সবসময়ে সম্ভব হয় না। সুতরাং, লেনদেন ব্যয়ের সাথে সঠিক তথ্য জানার ব্যয়কেও প্রকৃত ব্যয় হিসাবে ধরা উচিত। প্রকৃতপক্ষে কোন উৎস কতটা দূষণজনিত ক্ষতির সৃষ্টি করছে সেই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

৩.৫ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতি ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা

এতক্ষণ আমরা সামাজিকভাবে কাম্য দূষণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানবগোষ্ঠীর ওপর সম্পত্তির অধিকার অর্পণের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। দেখা গেছে যে, এক্ষেত্রে সবসময় কাম্য পরিমাণ দূষণ সৃষ্টি না-ও হতে পারে। সুতরাং বিকল্প হিসাবে সরকারের ভূমিকা আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সরকার সাধারণতঃ বাজার-নির্ভর বা অর্থনৈতিক নীতি এবং বাজারের ওপর নির্ভরশীল নয় এমন নীতি—এই দু'ধরনের উপায় গ্রহণ করে থাকে। বাজার-নির্ভর উপায়গুলির মধ্যে আছে দূষণ কর ও ভর্তুকী এবং বাজারে লেনদেনযোগ্য দূষণ সৃষ্টির অনুমতিপত্র। আর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দূষণের সর্বাধিক মাত্রাকে নির্ধারণ করে বেঁধে দেওয়া এবং সেটি লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না তা' দেখার নীতিটি হল অ-বাজার নির্ভর। একে আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণের (Command and Control) নীতিও বলা যায়।

বাজার-নির্ভর উপায় দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। বাজার-নির্ভর উপায়গুলি আবার দু'রকম—একটি দাম-ভিত্তিক ব্যবস্থা, যেমন দূষণ কর বা ভর্তুকী, অপরটি পরিমাণ-ভিত্তিক ব্যবস্থা যেখানে দূষণ-সৃষ্টির জন্য অনুমতিপত্র প্রদান করা হয় যা আবার লেনদেনযোগ্য।

৩.৫.১ কর এবং কাম্য পরিমাণ দূষণ

অনেক অর্থনীতিবিদের মতে সরকার করারোপের মাধ্যমে দূষণ-নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই করের পরিমাণ নির্ভর করবে দূষণজনিত বাহ্যিক ব্যয় বা ক্ষতির ওপর। এই ধরনের করকে সাধারণতঃ অর্থনীতিবিদ এ.সি. পিগু-র (A. C. Pigo)-নামানুসারে 'পিগোভিয়ান কর' (Pigovian tax) বলা হয়। এই করটি দূষণ

সৃষ্টির জন্য কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (penalty) হিসাবে আরোপিত হয়। বর্তমানে বাস্তবে এই ধরনের কিছু শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে, যদিও তত্ত্ব নির্ধারিত পিগোভিয়ান করের সাথে তার কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণতঃ বাস্তবে দূষণ এবং করের কাম্য পরিমাণের বদলে 'গ্রহণীয়' পরিমাণের ধারণাটি ব্যবহৃত হয়।

৩.৫.২ কাম্য পরিমাণ পিগোভিয়ান কর নির্ধারণ

পিগোভিয়ান করের কাম্য পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আমরা নীচের 3.7 নং চিত্রের সাহায্য নেব।

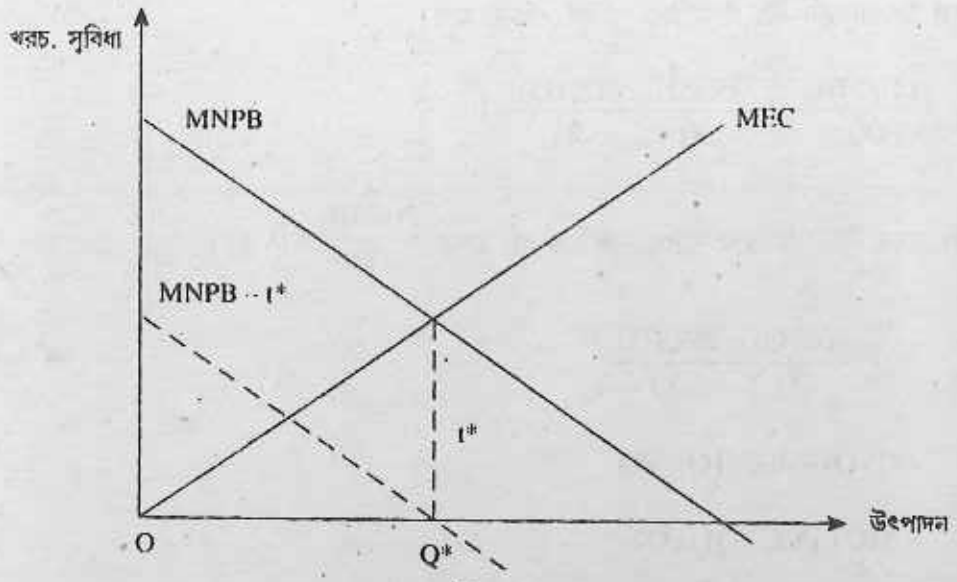

চিত্র 3.7

ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি একক উৎপাদনের জন্য যদি t* পরিমাণ কর নেওয়া হয় তাহলে MNPB রেখা t* পরিমাণ বাঁদিকে সরে (MNPB – t*) রেখায় পরিণত হবে। উৎপাদকের ব্যক্তিগত নীট সুবিধা সর্বাধিক হবে Q* পরিমাণ উৎপাদনে। অতএব t* পরিমাণ করই হল কাম্য পরিমাণ কর। যেহেতু এটি সামাজিকভাবে কাম্য পরিমাণ উৎপাদন হতে সাহায্য করছে। এখন, দেখা যাচ্ছে যে এই t*, Q* পরিমাণ উৎপাদনে MEC-এর সমান। অতএব বলা যায় যে, কাম্য পরিমাণ পিগোভিয়ান কর কাম্য পরিমাণ দূষণের সময় প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়ের সমান।

এখন দেখা যাক, সাধারণ কলনবিদ্যার সাহায্যে কিভাবে আমরা পিগোভিয়ান করের কাম্য পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারি।

$NSB = PQ - C(Q) - EC(Q)$

NSB = নীট সামাজিক সুবিধা

P = দ্রব্যের দাম

Q = দ্রব্যের পরিমাণ

C(Q) = খরচ-অপেক্ষক

EC(Q) = বাহ্যিক খরচ-অপেক্ষক

অর্থাৎ দ্রব্য বিক্রয় থেকে মোট যে আয় পাওয়া যায়, তার থেকে উৎপাদন ব্যয় ও মোট বাহ্যিক ব্যয় বাদ দিলে উৎপাদনের নীট সামাজিক সুবিধা পাওয়া যায়।

$$\frac{\partial(NSB)}{\partial Q} = P - \frac{\partial C(Q)}{\partial Q} - \frac{\partial EC(Q)}{\partial Q} = 0$$

অর্থাৎ যখন নীট সামাজিক সুবিধা সর্বাধিক হয় তখন $\frac{\partial(NSB)}{\partial Q} = 0$ হয়।

$$\therefore P = \frac{\partial C(Q)}{\partial Q} + \frac{\partial EC(Q)}{\partial Q}$$

$$= C'(Q) + \partial EC^{*}(Q) / \partial Q$$

$$= MC + \partial EC^{*}(Q) / \partial Q$$

$$\therefore P - MC = \frac{\partial EC(Q)}{\partial Q} = MEC$$

$\therefore$ MNPB = MEC

$\therefore$ কাম্য ভারসাম্য অবস্থায় MNPB = MEC

অর্থাৎ, P – MC = MEC

অথবা, t^{*} = MEC

এখানে C(Q) + EC(Q) হল উৎপাদনের মোট ব্যয় + বাহ্যিক ব্যয় = উৎপাদনের মোট সামাজিক

ব্যয়। দূষণ কর কেমন হবে তা নির্ভর করছে উৎপাদকের পরিবেশ ব্যবহারের অধিকারের ওপর।

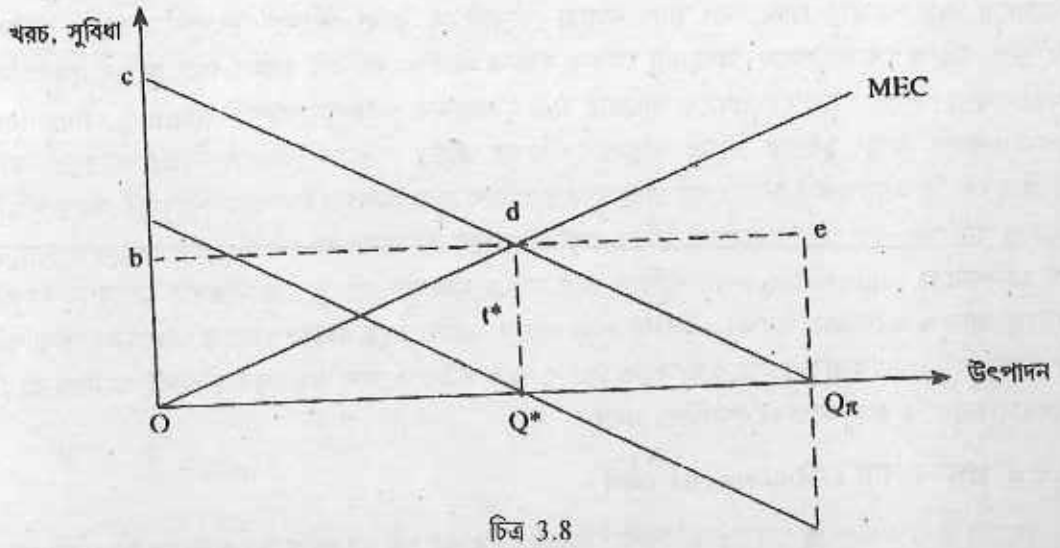

চিত্র 3.8

উপরের 3.8 নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, যখন উৎপাদক Q_{π} পর্যন্ত উৎপাদন করে তখন তাকে মোট ($ObdQ^* + Q^*de Q_{\pi}$) পরিমাণ কর দিতে হয়। কিন্তু Q^* পর্যন্ত উৎপাদন করলে তাকে মোট $ObdQ^*$ পরিমাণ কর দিতে হয়। Q^*-এ তার নীট সুবিধা হল bcd পরিমাণ, আর Q_{π}-এ নীট সুবিধা হল ($bcd-de Q_{\pi}$) পরিমাণ। অতএব Q_{π} পর্যন্ত উৎপাদন না করে Q^* পর্যন্ত উৎপাদন করলেই উৎপাদকের নীট সুবিধা বেশি হবে।

যদি উৎপাদকের পরিবেশে বর্জ্য নিক্ষিপ্ত করার কোন অধিকার না থাকে, তাহলে $ObdQ^*$ পরিমাণ কর তার অন্যের সম্পত্তি ব্যবহার করার জন্য দেয় অর্থ। কিন্তু যদি তার পরিবেশ ব্যবহার করার অধিকার থাকে এবং অন্যদের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পাওয়ার অধিকার সুরক্ষিত না থাকে, তাহলে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই নেওয়া চলে না। তবে ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, উৎপাদকের OQ^* পর্যন্ত উৎপাদন ও তার জন্য দূষণ সৃষ্টি করার অধিকার আছে এবং তার বেশি দূষণ সৃষ্টির কোন অধিকার নেই।

৩.৫.৩ করারোপের সুবিধা ও সমস্যা

বর্তমানে বলা হয় যে দূষণ করের একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল যে এটি দ্বিগুণ লাভ দেয়, কারণ এটি যে শুধুমাত্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে তা-ই নয়, এর থেকে সরকারেরও আয় হয়। আর দূষণ কর থেকে প্রাপ্ত আয়কে ব্যবহার করে সরকার তার নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করভার কমিয়ে তাদের সমৃদ্ধি হ্রাসের পরিমাণ কমাতে পারে। অর্থাৎ করারোপ করে একদিকে যেমন সরকার দূষণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে (কারণ উৎপাদন Q_{π} থেকে কমে Q^* হচ্ছে এবং সেজন্য দূষণও কমছে), অপরদিকে $ObdQ^*$ পরিমাণ করও সংগৃহীত হচ্ছে। এই হল দূষণ করের দ্বিগুণ লাভদানের (double dividend) ক্ষমতা।

যদিও কাম্য পরিমাণ দূষণ সৃষ্টিতে দূষণ কর একটি উল্লেখযোগ্য উপায় হিসাবে কাজ করে, তবে এটি প্রয়োগে কিছু সমস্যাও লক্ষ্য করা যায়। আমরা দেখেছি যে, কাম্য পরিমাণ উৎপাদনে করের পরিমাণ প্রান্তিক বাহ্যিক খরচের সমান। আর এই প্রান্তিক বাহ্যিক খরচ অপেক্ষকটি আমরা পাই প্রান্তিক দূষণজনিত ক্ষতি থেকে। সুতরাং MEC রেখাকে পাওয়ার জন্য দূষণজনিত ক্ষতি অপেক্ষকটি (damage function) জানা দরকার অর্থাৎ দূষণের বিভিন্ন পরিমাণের ওপর ক্ষতির পরিমাণ কিভাবে নির্ভর করে তা জানা দরকার। ক্ষতি অপেক্ষকটি জানার পর সেই ক্ষতির আর্থিক মূল্য নিরূপণ করাও জরুরী। এই সমস্ত পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অনেক সময়েই ক্ষতির প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতা (lack of knowledge) বা অনিশ্চয়তা (uncertainty)-এর কারণে তার সঠিক মূল্যায়ন হয় না। একইভাবে MNPB রেখাটি সম্বন্ধে জানাও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যেহেতু এধরনের তথ্যাবলী সাধারণতঃ উৎপাদকেরা সরকারকে জানাতে চায় না। এই সঠিক তথ্যের অভাবের কারণেই অনেকে করের মাধ্যমে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন।

৩.৫.৪ প্রশমন ব্যয় (Abatement cost)

দূষণের জন্য অর্থ শাস্তি ধার্য করার একটি সুবিধা হল যে এই ধরনের শাস্তি উৎপাদককে দূষণ এড়ানোর উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য করে। দূষণের জন্য যখন উৎপাদককে কিছু শাস্তিমূলক অর্থ প্রদান করতে হয় যেটি দূষণের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে, তখন সে বাধ্য হয়েই দূষণ-নিয়ন্ত্রক কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। যেমন, তরল বর্জ্য নিক্ষেপ করার আগে তাকে শোধন করে অক্ষতিকর করে তোলা ইত্যাদি। অর্থাৎ দূষক-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার সাহায্যে উৎপাদক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবকে প্রশমিত করে। দূষণের প্রভাব প্রশমিত করার জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকে বলে প্রশমন ব্যয়। নীচের 3.9 নং ছবিতে আমরা দূষণ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করব।

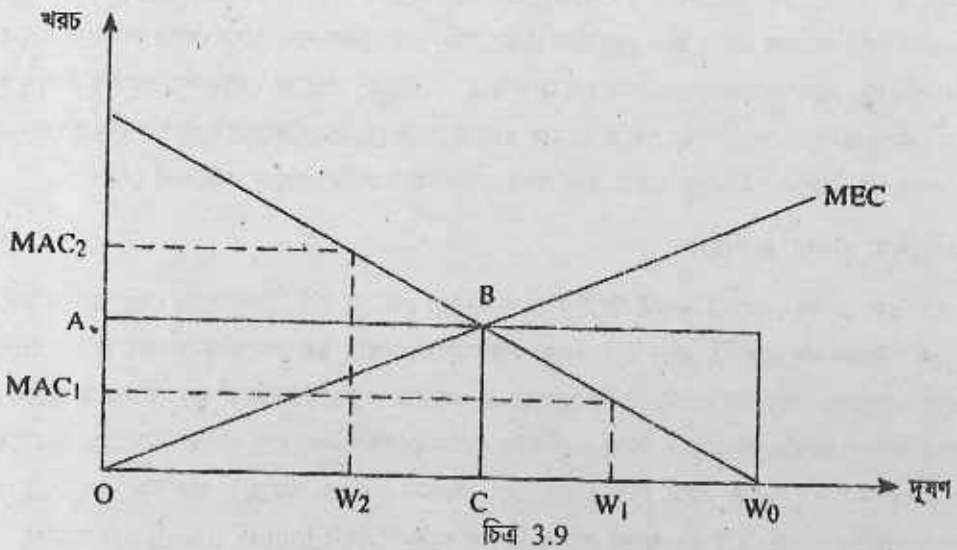

চিত্র 3.9

3.9 নং ছবিতে MNPB রেখার বদলে MAC (Marginal Abatement Cost) বা প্রান্তিক প্রশমন ব্যয় রেখা আঁকা হয়েছে। অনুভূমিক অক্ষটিতে এখন উৎপাদনের পরিবর্তে সরাসরি দূষণের পরিমাণ চিহ্নিত করা হচ্ছে। দূষণ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সৃষ্ট দূষণের পরিমাণ এক একক কমানোর জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হয় MAC রেখা সেটাকেই দেখাচ্ছে। যেমন, দূষণকে W_0 থেকে W_1 পর্যন্ত কমিয়ে আনতে গেলে MAC_1 পরিমাণ অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হবে। দূষণের পরিমাণ আরও কমিয়ে W_2 পর্যন্ত করতে গেলে MAC_2 পরিমাণ অতিরিক্ত খরচ করতে হবে। অর্থাৎ দূষণকে যত কম রাখতে চাইব তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বহনের পরিমাণ তত বেশি হবে। এর কারণ যখন খুব বেশি দূষণ থাকে তখন তাকে অল্প একটু কমানোর জন্য খুব বেশি খরচ করতে হয় না। কিন্তু পরিবেশ যখন মোটামুটিভাবে পরিচ্ছন্ন বা বিশুদ্ধ থাকে অর্থাৎ দূষণের পরিমাণ যেখানে কম থাকে সেখানে দূষণকে সামান্য কমানোর জন্যই উন্নত ধরনের দূষণ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় যা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ। সুতরাং, অল্পদূষণ অবস্থায় দূষণ কমানোর প্রান্তিক প্রশমন ব্যয় অনেক বেশি। সুতরাং, প্রান্তিক প্রশমন ব্যয় বা MAC রেখাটি ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট।

MAC রেখা যেখানে MEC রেখাকে ছেদ করে সেই বিন্দুতেই কাম্য দূষণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে MNPB রেখার সাথে MAC রেখার একটি যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। MNPB রেখার ক্ষেত্রে কর বসানো হলে উৎপাদক তার উৎপাদন কমিয়ে দেয় যার ফলে তার নীট ব্যক্তিগত সুবিধা কমে যায়। অর্থাৎ কর বসিয়ে উৎপাদন কম করে যখন দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন নীট ব্যক্তিগত সুবিধার পরিমাণ কমে যাওয়াকেই আমরা উৎপাদকের করজনিত নীট খরচ হিসাবে ধরতে পারি। সুতরাং তখন MNPB রেখাকেই প্রান্তিক প্রশমন ব্যয়রেখা হিসাবে কল্পনা করা যায়। আর যখন দূষণের পরিমাণ কমানোর জন্য উৎপাদন না কমিয়ে দূষণ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তখন MAC রেখাটিই প্রযোজ্য।

নীচের 3.10 নং ছবিতে MNPB রেখাকে বসানো (superimpose) হল।

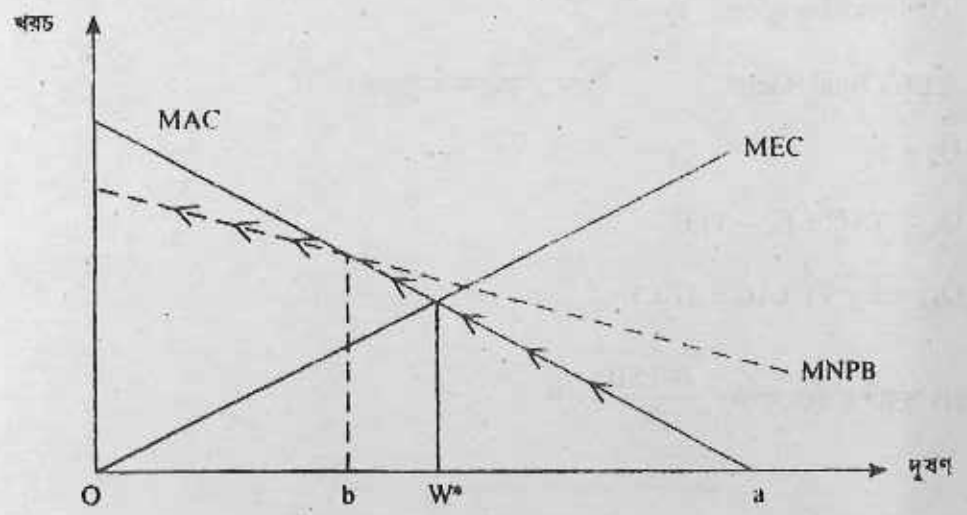

চিত্র 3.10

উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে দূষণের পরিমাণ a এবং b-এর মধ্যে থাকলে MAC < MNPB, অর্থাৎ দূষণ b পর্যন্ত কমিয়ে আনার জন্য দূষক- নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদন কমানোর থেকে কম ব্যয়বহুল। আবার b থেকে O পর্যন্ত দূষণ কমানোর জন্য উৎপাদন কমানোই কম ব্যয়বহুল। সুতরাং, দূষণ কমানোর খরচ সর্বাপেক্ষা কম করার জন্য তীর চিহ্ন অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ b পর্যন্ত দূষণ কমানোর জন্য প্রশমন ব্যয় বহন করতে হবে এবং b থেকে O পর্যন্ত দূষণ কমিয়ে আনার জন্য উৎপাদন কমাতে হবে। যেহেতু আমরা জানি যে ভারসাম্য অবস্থায় MNPB = MEC এবং উৎপাদন কমানোই যখন দূষণ রোধের সর্বাপেক্ষা কম খরচসাপেক্ষ উপায় তখন MNPB আর MEC সমার্থক সুতরাং MAC = MEC বিন্দুতেই ভারসাম্য সূচিত হয়।

এখন আমরা সহজ কলনবিদ্যার সাহায্যে ওপরের MAC = MEC শর্তটি প্রমাণ করব। ধরা যাক, Q_c এবং Q_N হল যথাক্রমে দূষণ-নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থার উৎপাদন।

$$\therefore Q_c = Q_N - TAC$$

এখানে TAC হল Total Abatement Cost বা দূষণ প্রশমনের মোট খরচ। আরো অনুমান করা যাক যে, E_c এবং E_N হল নিয়ন্ত্রণযুক্ত এবং নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থায় পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সুবিধার মূল্য।

$$\therefore E_c = E_N - TEC$$

TEC হল মোট বাহ্যিক ব্যয় অর্থাৎ পরিবেশের ক্ষতিজনিত মোট খরচ।

$\therefore$ মোট সামাজিক সুবিধা = $Q_c + E_c$

$\therefore$ TEC (Total Social Be[illegible] মোট সামাজিক সুবিধা)

$= Q_c + E_c$

$= Q_N - TAC + E_N - TEC$

$= Q_N + E_N - (TAC + TEC)$

TSB সর্বাধিক হবে যখন $\dfrac{\partial(TSB)}{\partial W} = 0$

$$\therefore \frac{\partial(TSB)}{\partial W} = -\left[\frac{\partial(TAC)}{\partial w} + \frac{\partial(TEC)}{\partial w}\right] = 0$$

[যেহেতু $\frac{\partial Q_N}{\partial W} = 0$ এবং $\frac{\partial E_N}{\partial W} = 0$, কারণ Q_N ও E_N নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থার উৎপাদন ও পরিবেশের সুবিধা।]

$$\therefore -\frac{\partial(TAC)}{\partial W} = \frac{\partial(TEC)}{\partial W}$$

অর্থাৎ –MAC = MEC

[(–) চিহ্নটি MAC-এর ঋণাত্মক ঢালের কারণে হয়েছে।]

ওপরে বর্ণিত W হল দূষণের পরিমাণ যা উৎপাদনের সাথে একটি নির্দিষ্ট হারে বাড়ে।

৩.৫.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত আকারে উত্তর দিন :

(1) ক্ষতি অপেক্ষক কাকে বলে?

(2) প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধার সংজ্ঞা দিন।

(3) বাহ্যিকতার সমাধান কী কী ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার মাধ্যমে করা যায়?

(4) সম্পত্তির অধিকার বলতে কী বোঝায়?

(5) লেনদেন ব্যয় বলতে কী বোঝায়?

(6) সরকার দূষণ-নিয়ন্ত্রণে কী কী ধরনের নীতি গ্রহণ করে থাকে?

(7) দূষণ করের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে কাম্য ভারসাম্যের শর্তটি কী?

(8) দূষণ করের দ্বিগুণ লাভদান (double dividend)-এর ক্ষমতাটি কী?

(9) মোট সামাজিক ব্যয় কাকে বলে।

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(10) ——— একটি অপুঞ্জীভবনশীল দূষক পদার্থ

(11) বাহ্যিকতা থাকলে ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধা = ———

(12) কোজ্ তত্ত্ব অনুসারে দুই পক্ষের দরকষাকষিতে কোন ——— ব্যয় থাকে না।

(13) দূষণ-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারসাম্য অবস্থায় ——— = প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়।

(১৩) বাঁদিকের স্তম্ভের সাথে ডানদিকের স্তম্ভের মিল নির্দেশ করুন :

বাঁ দিক	ডান দিক
(i) সাধারণ দ্রব্যের পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার	(i) P = MSC
(ii) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বাহ্যিক ব্যয়ের উপস্থিতি	(ii) $t^* = MEC$
(iii) দূষণ করের উপস্থিতি	(iii) MAC = MEC
(iv) প্রশমন ব্যয়ের উপস্থিতি	(iv) P = MC

৩.৬ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বাজার-নির্ভর উপায়ের দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ দূষণ-সৃষ্টির অনুমতিপত্র প্রদান সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে আমরা দূষণ-নিয়ন্ত্রণে আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করব। কারণ অনুমতিপত্র প্রদানের ব্যবস্থায় দূষণের একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয় যেটি আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারই অঙ্গ।

আমরা দেখেছি যে করারোপের পদ্ধতিটির কতকগুলি সমস্যা আছে যার জন্য দূষণ নির্ধারণের উপায় হিসাবে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। দূষণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত উপায়টি হল দূষণের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা বেঁধে দেওয়া। এই পদ্ধতিতে দূষণের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে পরিবেশের গুণগত মান বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। কোন একটি নির্দিষ্ট দূষক-পদার্থ সর্বাধিক যতটা পরিমাণে প্রকৃতিতে থাকলে পরিবেশের ওপর কোন ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে না, তার ওপর ভিত্তি করে দূষণের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। আমাদের দেশে শব্দদূষণের মাত্রা 65 ডেসিবেল-এ বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থাটি এর উদাহরণ। সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের ওপর দূষকের প্রভাবের মাত্রার ওপরে নির্ভর করে এই সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যেমন, জলে সর্বোচ্চ কতটা পরিমাণ আর্সেনিক থাকলে তা' মানুষের শরীরে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে না তার ওপর নির্ভর করে আর্সেনিক দূষণের সর্বোচ্চ সহনশীল পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

দূষণের এই সর্বোচ্চ সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না তা' দেখার জন্য একটি নজরদারী সংস্থা (monitoring agency) থাকে এবং সেই সংস্থার শাস্তিদানের ক্ষমতাও থাকে। অন্যথায় উৎপাদকেরা এই সর্বোচ্চ সীমা মেনে উৎপাদন করত না। তাই দূষণ নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে দূষণ-সৃষ্টিকারীকে কিছু শাস্তি ভোগ করতে হয়। অনেক সময় এই শাস্তি আর্থিক প্রদানের মাধ্যমে হয়।

৩.৬.১. দূষণ সমস্যার সমাধানে সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ ব্যবস্থা

এই প্রকার মাত্রা নির্ধারণ ব্যবস্থার অসুবিধা হল যে এটি প্রায়শঃই অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ সমাধান দিতে পারে না, অর্থাৎ এর থেকে আমরা সামাজিকভাবে কাম্য পরিমাণ বাহ্যিকতা পাই না। নীচের 3.11 নং ছবি থেকে এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

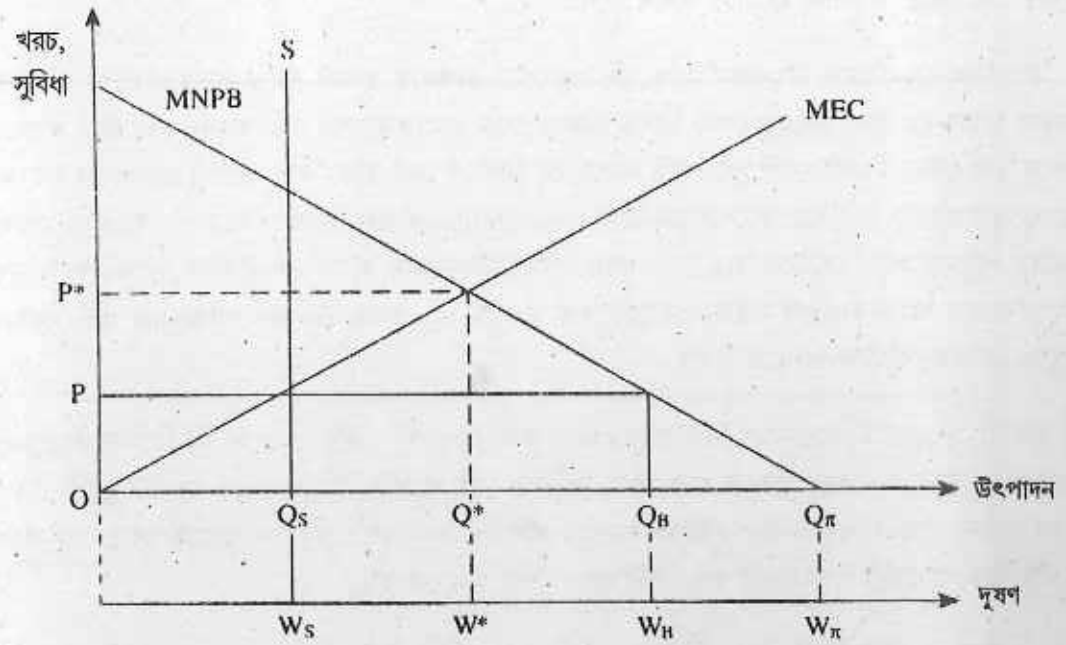

চিত্র 3.11

মনে করা যাক, দূষণের সর্বোচ্চ মাত্রা বেঁধে দেওয়া হল W_s-এর সমান করে। এখানে উৎপাদন Q_s-এর বেশি হতে পারবে না। আরও মনে করা যাক, দূষণ W_s-এর বেশি হলে OP পরিমাণ খরচের সমান অর্থ শাস্তি হিসাবে দিতে হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে, সর্বোচ্চ মাত্রা মেনে উৎপাদন করলে যতটা উৎপাদন হবে (O_s) তা কাম্য পরিমাণ উৎপাদনের (Q^*) থেকে কম। অর্থাৎ নির্ধারিত দূষণ-মান মেনে চললে উৎপাদন কাম্য পরিমাণের থেকে কম হবে। একমাত্র যদি দূষণের নির্ধারিত মাত্রা W_s থেকে বাড়িয়ে W^*-এর সমান হয়, তবেই আমরা সামাজিকভাবে কাম্য অবস্থানে থাকব। এক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ হওয়া উচিত OP^*-এর সমান, যা আবার Q^*-এ প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়ের সমান। যেহেতু কাম্য অবস্থানটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য MNPB এবং MEC রেখা সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং বাস্তবে এই ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, সেজন্য বলা হয় দূষণের মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতি বাস্তবে দক্ষ অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে না।

আবার এটাও দেখা যায় যে, OP পরিমাণ শাস্তি-ও অদক্ষ। কারণ এই পরিমাণ শাস্তির ক্ষেত্রে W_B পরিমাণ দূষণ সৃষ্টি করা লাভজনক। কারণ Q_B পরিমাণ উৎপাদনের জন্য প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধা শাস্তির পরিমাণের সাথে সমান। অর্থাৎ এখানে নীট ব্যক্তিগত লাভ সর্বাধিক। Q_B-এর বেশি উৎপাদনের জন্য শাস্তির পরিমাণ প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধার চেয়ে কম হওয়াতে নীট সুবিধা কমতে থাকবে। সুতরাং এক্ষেত্রে উৎপাদন Q_B-এর সমান হবে।

উৎপাদক Q_Bপরিমাণ উৎপাদন করে যদি ধরা পড়ে একমাত্র তখনই শাস্তি পাবে। বাস্তবে এই ধরা পড়ার সম্ভাবনাও কম। যেহেতু কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোন প্রকার দূষণের জন্য অনেকগুলি উৎস থাকতে পারে তাই কোন উৎসটি বেশি দূষণ সৃষ্টি করছে তা' নির্ধারণ করা কঠিন এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সুতরাং, এক্ষেত্রে উৎপাদক তার ধরা পড়ার সম্ভাবনাকে (probability) শাস্তির পরিমাণ দিয়ে গুণ করে যে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ পায়, সেটিকে তার বেশি দূষণ-সৃষ্টির নীট সুবিধার সাথে তুলনা করে দেখে। তা সত্ত্বেও যেখানে তার ধরা পড়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, সেখানেও সে Q_B পর্যন্ত উৎপাদন শাস্তিমূলক অর্থ দেওয়ার পরেও লাভজনকভাবে চালাতে পারে।

সুতরাং, দূষণের সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাম্য অবস্থানে পৌঁছতে হলে দুটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথমত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে, এবং দ্বিতীয়ত সেই শাস্তির পরিমাণ 3.11 নং চিত্রানুযায়ী OP* -এর সমান হতে হবে। অর্থাৎ, দূষণের সর্বোচ্চ পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যার ফলে অর্থনৈতিক কার্যাবলী কেবলমাত্র কাম্য পরিমাণ পর্যন্তই চালানো হয়।

৩.৬.২ কর ও মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা

এতক্ষণ কর ও মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি, তাতে দেখা যাচ্ছে যে উভয় পদ্ধতিতেই সামাজিকভাবে কাম্য অবস্থানে পৌঁছনোর জন্য MNPB ও MEC—উভয় রেখা সম্বন্ধেই সম্যক ধারণা থাকা দরকার। যেহেতু এই ধারণা করা বাস্তবে কঠিন তাই দুটি পদ্ধতিই অসুবিধাজনক। উপরন্তু, মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতিতে যেহেতু শাস্তির পরিমাণও অদক্ষ হয়, সেজন্য অনেক সময়েই মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতি অপেক্ষা কর নেওয়াকেই পছন্দ করা হয়।

এছাড়াও, দূষণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য করকে পছন্দ করার আরও কয়েকটি কারণ আছে। নীচে কয়েকটিকে আলোচনা করা হল।

(ক) করই সর্বনিম্ন খরচসাপেক্ষ সমাধান

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কর ছাড়া যদি দূষণের সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে যে খরচ

হয় তার থেকে কর নিলে কম খরচে নির্দিষ্ট মাত্রা মেনে উৎপাদন করা যায়। অর্থনীতিবিদ বমল এবং ওটস্-এর লেখা থেকে আমরা এটা জানতে পারি। নীচের ছবিতে এটি দেখান হল।

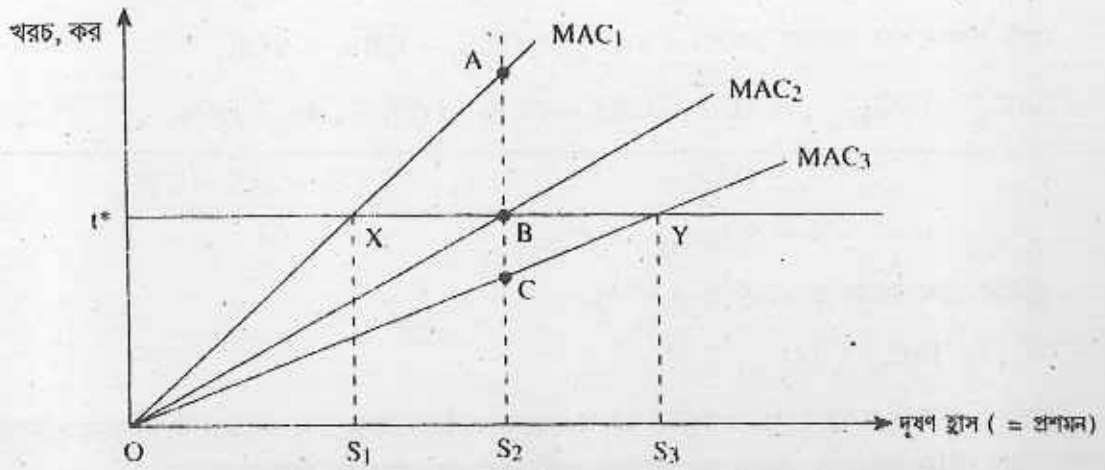

চিত্র ৩.১২

ওপরের ছবিতে অনুভূমিক অক্ষে দূষণ-হ্রাস বা দূষণ প্রশমনের মাত্রাকে দেখানো হয়েছে এবং লম্ব অক্ষে খরচ এবং করকে মাপা হয়েছে। MAC_1, MAC_2 ও MAC_3 তিনজন উৎপাদকের তিনটি প্রান্তিক প্রশমন ব্যয়রেখা। এরা ধনাত্মক ঢালবিশিষ্ট কারণ যত দূষণ হ্রাসের পরিমাণ বাড়ানো হবে প্রশমন ব্যয় তত বেশি হবে। যেহেতু উৎপাদকেরা বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্য নেয়, তাই তাদের MAC রেখাগুলি ভিন্ন ভিন্ন। ছবিতে প্রথম উৎপাদকের প্রশমন ব্যয় সর্বাধিক এবং তৃতীয় উৎপাদকের প্রশমন-ব্যয় সর্বনিম্ন। আলোচনার সুবিধার জন্য ধরে নেওয়া হচ্ছে $S_1S_2 = S_2S_3$ এবং $S_1 + S_2 + S_3 = 3S_2$।

এখন মনে করা যাক, দূষণের পরিমাণ S_2 পর্যন্ত কমানোর আদেশ জারি করা হল। প্রথম উৎপাদকের খরচ হবে AS_2 পরিমাণ, দ্বিতীয় উৎপাদকের BS_2 এবং তৃতীয় উৎপাদকের CS_2 পরিমাণ। মোট দূষণ হ্রাসের পরিমাণ = $3S_2$।

এবার যদি আদেশ জারি না করে t* পরিমাণ কর বসানো হয়, তাহলে প্রথম উৎপাদক x বিন্দু অর্থাৎ S_1 পর্যন্ত দূষণ হ্রাস করবে, ** দ্বিতীয় উৎপাদক B বিন্দু অর্থাৎ S_2 পর্যন্ত এবং তৃতীয় উৎপাদক Y বিন্দু অর্থাৎ S_3 পর্যন্ত দূষণ হ্রাস করবে। এখানে মোট দূষণ হ্রাসের পরিমাণ $S_1 + S_2 + S_3 = 3S_2$।

---

* দ্রষ্টব্য Baumol Oates (1971) – 'The Use of Standards and Prices for the Protection of the Environment', *Swedish Journal of Economics*, 73, 42-54.

** এখানে S_1 পর্যন্ত উৎপাদকের পক্ষে কর দেওয়ার চেয়ে দূষণ কমানো কম খরচসাপেক্ষ, S_1-এর পরে কর দেওয়াই সুবিধাজনক।

যদিও দুটি পদ্ধতিতেই দূষণ একই পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু দেখা যাবে যে করের ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ কম।

মোট প্রশমন ব্যয় (মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে) = $TAC_{st} = OAS_2 + OBS_2 + OCS_2$

মোট প্রশমন ব্যয় (করের ক্ষেত্রে) = $TAC_{tax} = OXS_1 + OBS_2 + YOS_3$

$$TAC_{St} - TAC_{tax} = OAS_2 + OBS_2 + OCS_2 - OXS_1 - OBS_2 - OYS_3$$

$$= OXS_1 + S_1XAS_2 + OYS_3 - S_2CYS_3 - OXS_1 - OYS_3$$

$$= S_1XAS_2 - S_2CYS_3$$

ছবিতে দেখা যাচ্ছে $S_1XAS_2 > S_2CYS_3$

$$\therefore TAC_{St} > TAC_{tax}$$

অতএব, মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রশমন ব্যয় যত হবে, করের মাধ্যমে সেই একই পরিমাণ দূষণ সৃষ্টিতে খরচ তার থেকে কম হবে। অর্থাৎ কর দূষণের একটি কম খরচ-সাপেক্ষ সমাধান।

(খ) গতিশীল দক্ষতা

আমরা 3.11 নং ছবিতে দেখছি যে Q_s পরিমাণ উৎপাদককে দূষণ হ্রাস করতে কোন উৎসাহ দেওয়া হয় না বা এই পরিমাণ উৎপাদনের এবং দূষণ সৃষ্টির জন্য সে কোন শাস্তিও পায় না। তাই উৎপাদক কখনোই দূষণকে W_s -এর কম করতে চায় না। কিন্তু উৎপাদককে যদি সবসময়েই দূষণ-হ্রাসে উৎসাহ দেওয়াই সামাজিকভাবে কাম্য, তাহলে করের সাহায্যে এটি করা যায়, কারণ কর প্রদান এড়াতে উৎপাদক সব সময়েই উন্নত দূষণ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রশমন ব্যয় কমিয়ে দূষণ হ্রাস করবে।

(গ) সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর নিশ্চিতভাবেই মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতি অপেক্ষা অদক্ষ। কিছু কিছু দূষক পদার্থ থাকে যেগুলি এত বেশি ক্ষতিকর যে সেই ধরনের দূষণের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত। এখানে MEC রেখা লম্বা হওয়া উচিত অর্থাৎ সেই প্রকার দূষণের জন্য প্রান্তিক ক্ষতির পরিমাণ অসীম। এক্ষেত্রে দূষণের সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রাটি হল শূন্য পরিমাণ দূষণ। এক্ষেত্রে করের সাহায্যে দূষণকে সম্পূর্ণভাবে রোধ করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

৩.৬.৩ দূষণ-নিয়ন্ত্রণে ভর্তুকী প্রদান

দূষণ নিয়ন্ত্রণের অন্য একটি কার্যকর উপায় হল ভর্তুকী। উৎপাদক দূষণের পরিমাণ কমাতে পারলে

তাকে সেজন্য ভর্তুকী দেওয়া হয় এবং দূষণ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার উৎসাহ দেওয়া হয়। উৎপাদক যদি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সৃষ্ট দূষণকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার কম রাখতে পারে, তবেই তাকে ভর্তুকী দেওয়া হয়।

এখন এই ভর্তুকীর প্রকৃতি আলোচনা করা যাক। মনে করা যাক, প্রতি একক দূষণের নিয়ন্ত্রণের জন্য 's' পরিমাণ ভর্তুকী দেওয়া হবে এবং সেজন্য দূষণের সর্বোচ্চ পরিমাণ W-এর সমান বা তার কম হবে। অর্থাৎ যদি উৎপাদকের সৃষ্ট দূষণের প্রকৃত পরিমাণ হয় M এবং M, W-এর থেকে কম হয়, তাহলে দেয় ভর্তুকীর পরিমাণ হবে s(W–M)-এর সমান। নীচে (3.13a) এবং (3.13b) নং চিত্রে ভর্তুকী দিলে যথাক্রমে একজন উৎপাদক এবং বাজারের আচরণ কি হবে তা দেখানো হয়েছে।

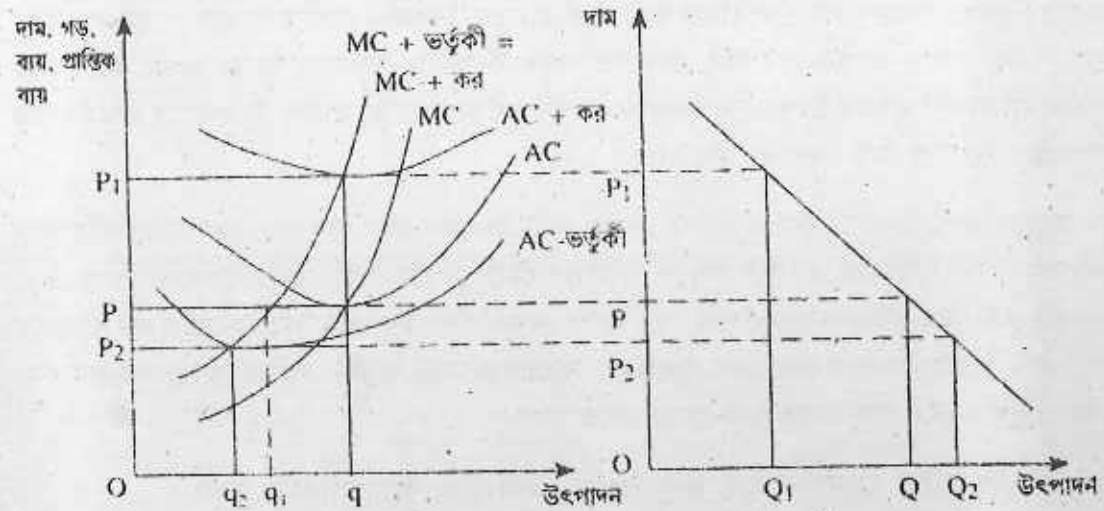

চিত্র 3.13a চিত্র 3.13b

চিত্র (3.13a)-তে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিকভাবে অর্থাৎ ভর্তুকী না থাকলে উৎপাদক P দামে Q পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে এবং P দামে বাজারে মোট যোগানের পরিমাণ হল Q (3.13b চিত্র দ্রষ্টব্য)। এখানে, অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, ভারসাম্যের দাম = গড় ব্যয় (P = AC) শর্তটি পূর্ণ হচ্ছে। এখন যদি করারোপ করা হয়, তাহলে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখা উভয়েই ওপরদিকে সরে যাবে। পুরানো দামে এখন q উৎপাদনে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হলেও যেহেতু দাম নতুন গড় ব্যয়ের থেকে কম সেহেতু উৎপাদকের লোকসান হবে। সুতরাং কয়েকজন উৎপাদক উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। অতএব, এখানে বাজারের নতুন ভারসাম্য দাম ও উৎপাদন হবে যথাক্রমে P_1 ও Q_1। ওপরের ছবি অনুযায়ী যদিও একজন উৎপাদকের উৎপাদনের পরিমাণ অপরিবর্তিত আছে তথাপি মোট উৎপাদকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় Q_1, Q-এর থেকে কম।

এখন, যদি করের পরিবর্তে ভর্তুকীর ব্যবস্থা থাকে তাহলে কি হয় দেখা যাক। যদি করের পরিমাণের সাথে সমান পরিমাণে ভর্তুকী বসে তাহলে প্রান্তিক ব্যয়রেখা ওপরদিকে ঘুরে গিয়ে MC+ কররেখার সমান হবে। উৎপাদক তার উৎপাদন যতই বাড়ায়, তত বেশি দূষণ সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে তার ভর্তুকী

পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং উৎপাদক উৎপাদন না কমালে ভর্তুকী বন্ধ হয়ে যাবে। উৎপাদন কমানো বা ভর্তুকী বন্ধ হয়ে যাওয়া দুটি অবস্থাই কর প্রদানের মত আর্থিক ক্ষতি। সুতরাং, এক্ষেত্রে MC রেখা নীচে না সরে ওপরদিকে সরে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে AC রেখা নীচের দিকে সরে আসবে কারণ উৎপাদন কম করার জন্য উৎপাদকের কিছু আর্থিক লাভ হচ্ছে। সুতরাং নতুন MC রেখাটি হল MC+ ভর্তুকী রেখা এবং নতুন AC রেখাটি হল AC– ভর্তুকী রেখা।

স্বল্পকালে দাম যখন নতুন MC বা প্রান্তিক ব্যয়ের সমান, সেখানে ভারসাম্য হবে ($q = q_1$)। দীর্ঘকালে দাম গড় ব্যয়ের থেকে কম হওয়াতে অতিরিক্ত লাভ থাকবে। সুতরাং অনেক নতুন উৎপাদক উৎপাদন শুরু করবে। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত অতিরিক্ত লাভ থাকবে নতুন উৎপাদক আসতে থাকবে। যখম দাম কমে দাম = গড় ব্যয় = প্রান্তিক ব্যয় হবে, সেখানেই নতুন দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থা পাওয়া যাবে। এই ভারসাম্য অবস্থায় একজন উৎপাদকের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, তথাপি উৎপাদকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে বাজারে মোট যোগান বেশি হচ্ছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘকালে করের প্রভাবে মোট উৎপাদন কমে যায় বলে দূষণ সৃষ্টির পরিমাণও কম হয়। কিন্তু দীর্ঘকালে ভর্তুকীর প্রভাবে বাজারের মোট যোগান অর্থাৎ মোট উৎপাদন বেড়ে যায়, সুতরাং মোট দূষণ-সৃষ্টির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, যদিও একজন উৎপাদক এখন আগের থেকে কম পরিমাণে দূষণ সৃষ্টি করেছে। অতএব দেখা গেল, যদিও দূষণ কমানোর জন্যই ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়, কিন্তু ভর্তুকীর ফলে দূষণ প্রকৃতপক্ষে বেড়ে যেতে পারে।

৩.৬.৪ দূষণ সৃষ্টির লেনদেনযোগ্য অনুমতিপত্র প্রদান এবং কাম্য পরিমাণ দূষণ

পরিবেশ দূষণকে নিয়ন্ত্রিত রাখার অন্য যে একটি অর্থনৈতিক উপায় আছে, সেটি হল দূষণ সৃষ্টি করার অনুমতিপত্র প্রদান করা যা বাজারে লেনদেনযোগ্য। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতিটির কথা প্রথম জানা যায় ডি. এইচ. ডেলস্-এর একটি লেখা* থেকে। এই ব্যবস্থায় প্রথমে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কাম্য বা সর্বোচ্চ সহনশীল পরিমাণ দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তারপর যে কটি উৎস থেকে সেই দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে সেই উৎসগুলিকে অর্থনৈতিক কার্যাবলী চালিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু কিছু পরিমাণে দূষণ সৃষ্টি করার অনুমতি দেওয়া হয়। দূষণ সৃষ্টির কয়েকটি অনুমতিপত্র তৈরি করে সেগুলিকে বিনামূল্যে অথবা নীলামের মাধ্যমে উৎপাদকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এভাবে মোট যতটা দূষণ সৃষ্টি করার অনুমতি দেওয়া হয়, তা ধার্য করা কাম্য বা সহনশীল পরিমাণ দূষণের সাথে সমান। এই অনুমতিপত্রগুলি আবার বাজারে কেনাবেচা হতে পারে। কোন উৎপাদক তার উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানোর জন্য মোট যতটা

---

* (দ্রষ্টব্য : D. H. Dales (1968) : *Pollution, Property and Prices,* Toronto : University of Toronto Press.)

দূষণ সৃষ্টি করার অনুমতি পেল, দক্ষভাবে উৎপাদন করে সে যদি তার থেকে কম পরিমাণ দূষণ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সে অবশিষ্ট দূষণের জন্য অনুমতিপত্রটি অপেক্ষাকৃত অদক্ষ উৎপাদকের কাছে বিক্রয় করতে পারে। অর্থাৎ দক্ষ উৎপাদক যতটুকু দূষণ সৃষ্টি করার অনুমতি পেয়েছে তার মধ্যে যদি দূষণকে সীমাবদ্ধ না রাখতে পারে তাহলে দক্ষ উৎপাদকের কাছ থেকে আরও অনুমতিপত্র কিনে বেশি দূষণ সৃষ্টি করেই উৎপাদন চালিয়ে যাবে। এইভাবে, দূষণ-সৃষ্টির অনুমতিপত্রের একটি বাজার তৈরি হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুমতিপত্রের মোট চাহিদা তার মোট যোগানের সমান হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই লেনদেন চলবে এবং ভারসাম্য অবস্থায় অনুমতিপত্রের দাম প্রত্যেক উৎপাদন এককের প্রান্তিক প্রশমন ব্যয়ের সমান হবে। যদি এই ব্যবস্থার ওপর নজর রাখা সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, মোট দূষণ নির্ধারিত মাত্রার মধ্যেই আছে।

নীচের 3.14 নং ছবিতে এই ব্যবস্থাকে দেখানো হল।

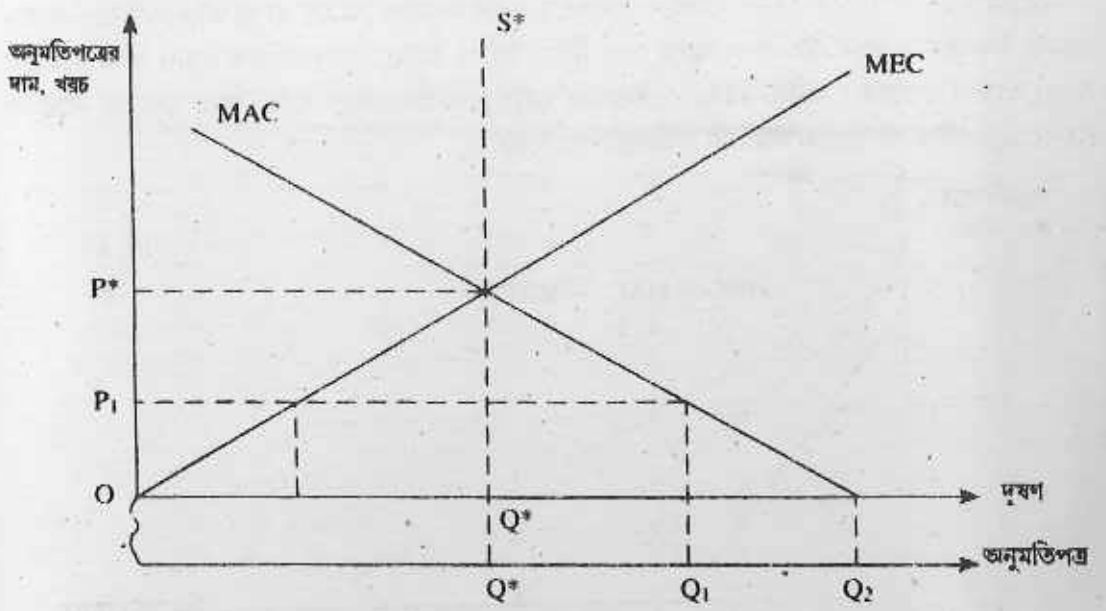

চিত্র 3.14

ওপরের ছবিতে লম্ব-অক্ষে অনুমতিপত্রের দাম এবং খরচকে দেখানো হয়েছে এবং অনুভূমিক অক্ষে দূষণের পরিমাণ এবং অনুমতিপত্রের সংখ্যাকে দেখানো হয়েছে। এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য অনুমান করা হয়েছে যে, এক একক দূষণের জন্য একটি অনুমতিপত্রের প্রয়োজন। এখানে OQ* হল কাম্য সংখ্যক অনুমতিপত্র এবং OP* হল অনুমতিপত্রের দাম। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ যদি প্যারেটো-কাম্য অবস্থায় পৌঁছতে চায়, তাহলে OQ* সংখ্যক অনুমতিপত্র বাজারে ছাড়বে। এখানে S* রেখাটি অনুমতিপত্রের যোগানরেখা। এই রেখাটি দামের ওপর নির্ভরশীল হয় এবং এর অবস্থান নির্ভর করে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর।

MAC রেখাটিকে এখানে অনুমতিপত্রের চাহিদারেখা হিসাবে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অনুমতিপত্রের দাম যখন P_1-এর সমান, তখন উৎপাদক OQ_1 সংখ্যক অনুমতিপত্র কিনবে, কারণ দূষণের পরিমাণ Q_2 থেকে Q_1 পর্যন্ত কমিয়ে আনতে হলে দূষণ প্রশমনের ব্যবস্থাই কম খরচসাপেক্ষ এবং Q_1 থেকে আরও কমিয়ে আনতে হলে অনুমতিপত্র কেনাই সুবিধাজনক। সুতরাং QQ_1 পর্যন্ত অনুমতিপত্র উৎপাদক P_1 দামে কিনবে। দাম যখন বেড়ে p* হবে তখন OQ^* (OQ^*, $<OQ_1$) পরিমাণ অনুমতিপত্র কেনাই উৎপাদকের পক্ষে লাভজনক। অর্থাৎ MAC রেখাটিকে অনুমতিপত্রের চাহিদারেখা হিসাবে কল্পনা করা যায়।

৩.৬.৫ অনুমতিপত্রের লেনদেন

অনুমতিপত্রগুলি যে বাজারে লেনদেনযোগ্য হয় তার কতগুলি কারণ আছে। নীচে সেগুলি আলোচনা করা হল।

(ক) সর্বনিম্ন ব্যয়

নীচের 3.15 নং ছবিতে MEC রেখাকে বাদ দিয়ে একটি সামগ্রিক MAC রেখা আঁকা হয়েছে। এখানে আমরা কেবলমাত্র দুজন উৎপাদক আছে ধরে নিয়ে তাদের MAC রেখাগুলিকে যোগ করে সামগ্রিক MAC রেখা পেয়েছি। অর্থাৎ MAC রেখাগুলি যেহেতু চাহিদারেখার কাজ করে, সেহেতু সামগ্রিক MAC রেখাটিও বাজারের সামগ্রিক চাহিদারেখার সমান।

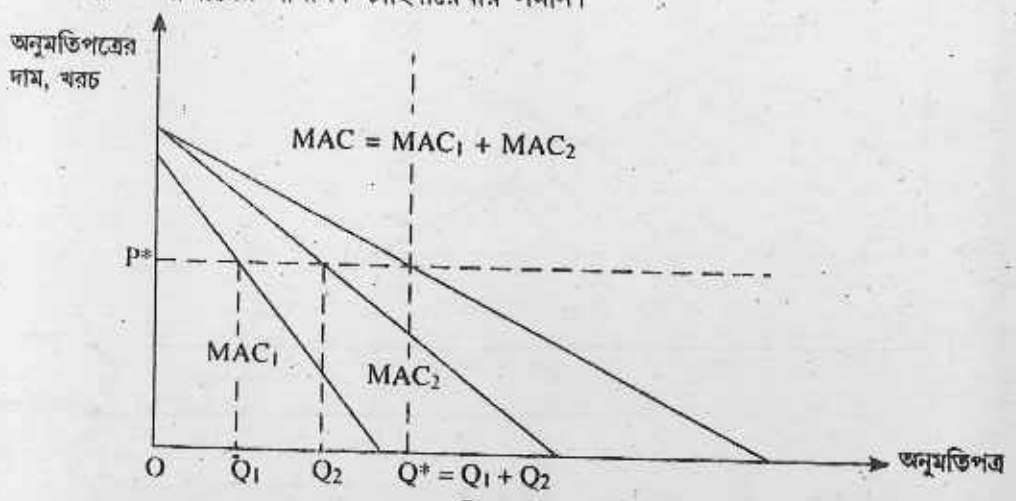

চিত্র 3.15

ছবিতে প্রথম উৎপাদক P* দামে OQ_1 সংখ্যক এবং দ্বিতীয় উৎপাদক OQ_2 সংখ্যক অনুমতিপত্র কেনে। দেখা যাচ্ছে যে, প্রশমন ব্যয় বেশি যে উৎপাদকের, সে বেশি সংখ্যক অনুমতিপত্র কিনছে, অর্থাৎ যে সমস্ত উৎপাদক অল্প খরচে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাদের পক্ষে অনুমতিপত্র কেনার চেয়ে দূষণ-নিয়ন্ত্রণ করাই সুবিধাজনক, আর দূষণ-নিয়ন্ত্রণের ব্যয় যাদের বেশি তারা বেশি সংখ্যক অনুমতিপত্র কিনবে। এইভাবে দেখা যায়, কম প্রশমন ব্যয় যে সমস্ত উৎপাদকের তারা বেশি প্রশমন ব্যয় নির্বাহী উৎপাদকদের কাছে অনুমতিপত্র বিক্রয় করবে। অর্থাৎ অনুমতিপত্রের লেনদেন সম্ভব হলে তা' সর্বনিম্ন খরচে একটি নির্দিষ্ট দূষণ-মান বজায় রাখতে সাহায্য করে।

(খ) নতুন উৎপাদকের শিল্পে প্রবেশ

শিল্পে যদি নতুন নতুন উৎপাদক প্রবেশ করে, তাহলে দেখা যাবে নির্দিষ্ট দূষণ মান বজায় রাখার সময়ে অনুমতিপত্রের দাম বেড়ে যাবে। নীচের 3.16 নং ছবিতে এটি দেখান হল।

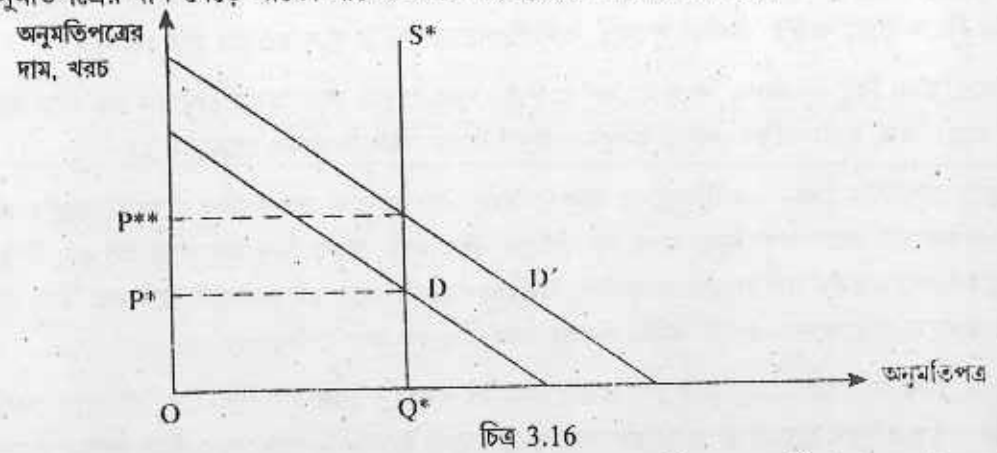

চিত্র 3.16

নতুন নতুন উৎপাদক যখন শিল্পে প্রবেশ করবে, তখন অনুমতিপত্রের চাহিদা বেড়ে যাবে অর্থাৎ D চাহিদারেখা ডানদিকে সরে D' রেখায় পরিণত হবে। যদি কর্তৃপক্ষ অনুমতিপত্রের যোগান আর না বাড়ায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অনুমতিপত্রের দাম P* থেকে বেড়ে P** হবে। যদি নতুন উৎপাদকরা কম খরচে দূষণ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে, তাহলেই তারা বর্ধিত দামে অনুমতিপত্র কিনবে। আর যদি কর্তৃপক্ষ অনুমতিপত্র যোগানের সংখ্যা বাড়ায়, তাহলে S* রেখাটি ডানদিকে সরে যাবে, দামও কমে আসবে। যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে যে আগের দূষণ মানকে আরও কমানো উচিত, তাহলে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মতই বাজারে এসে কিছু পরিমাণ অনুমতিপত্র নিজেরা কিনে নেবে এবং তখন S* রেখা বাঁদিকে সরে যাবে। অর্থাৎ অনুমতিপত্র প্রদানের ব্যবস্থাটি থাকলে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুসারে দূষণের সর্বোচ্চ সহনশীল মানকে বাড়াতে বা কমাতে পারে।

(গ) দূষণের বিরোধীদের সুবিধা

অনুমতিপত্র প্রদান ব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল এই যে, এর বাজার যদি সর্বাংশেই অনিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে যে কেউ এখানে কেনাবেচা করতে পারে। যেমন, কোন পরিবেশ সচেতন গোষ্ঠী কিছু অনুমতিপত্র কিনে রাখতে পারে যাতে করে প্রকৃত উৎপাদকেরা কম দূষণ সৃষ্টি করার সুযোগ পায়। এই সমাধানটি একটি দক্ষ সমাধান কারণ এটি দূষণ নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছার তীব্রতাকে প্রকাশ করে। যদিও এক্ষেত্রে সরকার যদি চায় তাহলে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত উৎপাদন বজায় রাখার জন্য বেশি করে অনুমতিপত্র ছাড়তে পারে।

(ঘ) মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুমতিপত্রের সুবিধা

যখন মূল্যবৃদ্ধি হয় দূষণ করের প্রকৃত মূল্য কমে গিয়ে তার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। কিন্তু অনুমতিপত্রের দামই কেবল বাজারের চাহিদা ও যোগানের ওপর নির্ভরশীল। সেজন্য মূল্যবৃদ্ধিতে অনুমতিপত্রের সংখ্যার কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, অর্থাৎ দূষণের পরিমাণ একই থাকে।

(ঙ) অন্যান্য সুবিধা

দূষণ করের ক্ষেত্রে অনেকসময় করটি ভুল পরিমাণে আরোপিত হয় যেহেতু কাম্য অবস্থায় এটি প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়ের সমান। অন্যদিকে অনুমতিপত্রের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দূষণের মান নির্ধারণ করা এবং অনুমতিপত্র প্রদানের নিয়ম তৈরি করাই জরুরি। সুতরাং, অনুমতিপত্রের ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

আবার, যখন কিছু উৎপাদক শিল্পে প্রবেশ বা শিল্প থেকে প্রস্থান করে অনুমতিপত্রের দাম সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায়। কিন্তু, দূষণ করের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক রকম সমন্বয়সাধনের প্রয়োজন হয়।

বাস্তবে দেখা যায় কোন একটি দূষণের অসংখ্য উৎস এবং অসংখ্য গ্রাহক বিন্দু রয়েছে। করকে যদি ক্ষতির পরিমাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হয়, তাহলে উৎস এবং গ্রাহক বিন্দু অনুসারে কর হার বিভিন্ন হতে হবে। কিন্তু এরকম ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। অনুমতিপত্রের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি খানিকটা মিটে যায় যেহেতু এখানে পরিবেশের একটি নির্দিষ্ট গুণগত মান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

আবার, দেখা যায় অল্প একটু দূষণ হ্রাস করার জন্য উৎপাদককে বেশ বড় পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হয়। যদি কর্তৃপক্ষ দূষণ-হ্রাসের ওপর নির্ভর করে কর, ভর্তুকী ইত্যাদি নির্ধারণ করে তবে প্রশমন ব্যয়ের ধারণা সঠিক না হলে কম কর আরোপিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদকের পক্ষে হয়ত দূষণ হ্রাস অপেক্ষা কর প্রদানই লাভজনক হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পরিবেশের নির্দিষ্ট গুণগত মান বজায় থাকবে না। কিন্তু অনুমতিপত্র যেহেতু নির্দিষ্ট পরিমাণেই বাজারে ছাড়া হয়, সুতরাং এখানে পরিবেশের নির্দিষ্ট গুণগত মান বজায় থাকে, শুধুমাত্র দামেই কিছু পরিবর্তন আসতে পারে।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক উপায় দুটির মধ্যে পরিবেশের গুণগত মান বজায় রাখা বা দূষণ হ্রাস করার ব্যাপারে কর অপেক্ষা দূষণ সৃষ্টির অনুমতিপত্র প্রদানই বেশি কার্যকর ও দক্ষ।

৩.৬.৬ বিভিন্ন ধরনের অনুমতিপত্র প্রদানব্যবস্থা

সাধারণতঃ তিন ধরনের অনুমতিপত্র প্রদানব্যবস্থা দেখা যায়—আবহমণ্ডলের দূষণের জন্য গ্রাহক বিন্দু অনুযায়ী অনুমতিপত্র প্রদানব্যবস্থা (Ambient Permit System বা ASP), দূষক নিক্ষেপণের জন্য উৎসকে দেয় অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা (Emission Permit System বা EPS) এবং মোট দূষণ নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভরশীল অনুমতিপত্র প্রদানব্যবস্থা (Pollution Offset বা PO)।

APS-এর ক্ষেত্রে গ্রাহক বিন্দুতে দূষণের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রাহক অঞ্চলে আবহমণ্ডল কতটা দূষিত হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়। আমরা জানি যে, বিভিন্ন গ্রাহক বিন্দুতে আবহমণ্ডলের গুণগত মান বিভিন্ন হতে পারে। সুতরাং APS-এর ক্ষেত্রে গ্রাহক বিন্দু অনুযায়ী অনুমতিপত্র প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, যেকোন গ্রাহক বিন্দুতেই অনুমতিপত্রের একটি আলাদা বাজার গড়ে উঠবে। অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রাহক বিন্দুতে মোট যতটা পরিমাণ দূষণ সৃষ্টি করার অনুমতি দেওয়া হবে তার ভিত্তিতেই সেই নির্দিষ্ট গ্রাহক বিন্দুতে দূষণ সৃষ্টি করার জন্য অনুমতিপত্র দেওয়া হবে। এই

অনুমতিপত্রের ভিত্তিতে এমনভাবে উৎপাদন করা চলবে না যাতে অন্য কোন গ্রাহক বিন্দুতে দূষণ সৃষ্টি হয়। সুতরাং দূষণ-সৃষ্টিকারী উৎপাদক বিভিন্ন গ্রাহক বিন্দুতে আলাদা আলাদা অনুমতিপত্রের বাজারের সম্মুখীন হবে এবং সেজন্য গ্রাহক বিন্দু অনুযায়ী অনুমতিপত্রেরও দামও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

EPS-এর ক্ষেত্রে দূষণের উৎস অনুযায়ী অনুমতিপত্র প্রদান করা হয় এবং উৎসের দূষণ গ্রাহক বিন্দুতে কি প্রভাব ফেলে সেটি দেখা হয় না। সুতরাং, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে যেকোন দূষণ সৃষ্টিকারী উৎপাদক একটি মাত্র বাজারের সম্মুখীন হবে। তার অনুমতিপত্রেরও একটিই বাজারদর থাকবে। অর্থাৎ এখানে কোন একটি এলাকার মধ্যে দূষক পদার্থ নিক্ষেপণের অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেই অনুমতিপত্রের বাজার সেই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাহক-বিন্দু অনুযায়ী আলাদা হয় না।

যদিও EPS, APS-এর থেকে সহজতর এবং প্রশাসনিক কারণেও সুবিধাজনক, কিন্তু EPS-এর অন্য কয়েকটি সমস্যা আছে। গ্রাহক-বিন্দু অনুযায়ী দেওয়া হয় না বলে দূষণের বিভিন্ন উৎস কতটা করে ক্ষতি করছে, তা বোঝা যায় না। অর্থাৎ উৎস অনুযায়ী যে বিভিন্ন হারে প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয় সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলি দামের সমান করা যাচ্ছে না বলে (যেহেতু দাম একটিই) এটি একটি অদক্ষ ব্যবস্থা। আবার দেখা যায়, কোন একটি অঞ্চলের মধ্যেই কিছুটা অংশে দূষণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি (যেমন, কারখানার সন্নিহিত অংশ) এবং প্রকৃত দূষণ নির্দিষ্ট মান অপেক্ষা বেশি। EPS-এ যেহেতু একটি বড় অঞ্চলে মোট সৃষ্ট দূষণকে দেখা হয়, বিভিন্ন অংশের দূষণকে আলাদা আলাদা করে দেখা হয় না, সুতরাং বিভিন্ন অংশে এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট দূষণ মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। আর যদি প্রকৃত দূষণ অনুযায়ী অঞ্চলটি ছোট করে ভাগ করে ফেলা হয় তাহলে আমরা APS-এর মত জটিলতার সম্মুখীন হয়ে যাব। তাছাড়া যে অঞ্চলটিকে আলোচনায় আনা হচ্ছে তার বাইরের অঞ্চলে যদি দূষণের প্রভাব পড়ে তাহলে EPS-এর দ্বারা তাকে কমানো যায় না।

APS ও EPS ব্যবস্থায় কিছু সমস্যা থাকায় PO ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় EPS-এর মত করেই অনুমতিপত্র তৈরি করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই তার লেনদেন হয়। তবে বিভিন্ন গ্রাহক বিন্দুতে দূষণের মান বজায় রাখাটি এর একটি পূর্বশর্ত। বিভিন্ন দূষক পদার্থ বিভিন্ন গ্রাহক বিন্দুতে কতটা প্রভাব ফেলে তার ভিত্তিতে অনুমতিপত্রের বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ PO ব্যবস্থায় EPS-এর মত উৎস অনুযায়ী অনুমতিপত্র প্রদান করা হয় যেগুলি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই লেনদেন করা যায়, আবার APS-এর মত বিভিন্ন গ্রাহক বিন্দুতে দূষকের প্রভাবের ওপর নির্ভর করে অনুমতিপত্রের লেনদেন হয়। সুতরাং PO ব্যবস্থা APS ও EPS-এর একটি মিলিত ব্যবস্থা।

ওপরের তিনটি ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ টাইটেনবার্গ[৫] দেখেছেন যে EPS-এ মোট প্রশমন ব্যয় APS-এর থেকে বেশি। আবার APS কম খরচসাপেক্ষ হলেও জটিল এবং সেই কারণে একে ততটা কার্যকরী তোলা যায় না। আবার EPS-এর সাথে মাত্রা নির্ধারণ ব্যবস্থার তুলনা করতে গিয়ে কোন তুলনীয় প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

৩.৬.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত আকারে উত্তর দিন :

(1) আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি কীভাবে কার্যকর করা হয়?
(2) যদি কোনপ্রকার দূষণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে চাওয়া হয়, করের মাধ্যমে কী সেটি করা সম্ভব?
(3) দূষণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য উৎপাদককে ভর্তুকী দিলে উৎপাদকের MC ও AC রেখা কিভাবে স্থান পরিবর্তন করে?
(4) লেনদেনযোগ্য অনুমতিপত্র কাকে বলে?
(5) অনুমতিপত্রগুলি যখন বাজারে কেনাবেচা হয়, তখন ভারসাম্য অবস্থায় তাদের মোট সংখ্যার কি পরিবর্তন হয়?
(6) বাজারে কি কি ধরনের অনুমতিপত্র প্রদানব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়?
(7) APS ও EPS-এর মধ্যে পদ্ধতি হিসাবে কোনটি সহজতর?

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(8) একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ মান বজায় রাখতে কর ও মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতির মধ্যে———— সর্বাপেক্ষা কম খরচসাপেক্ষ।
(9) দীর্ঘকালে দূষণ-নিয়ন্ত্রণে কর ও ভর্তুকীর মধ্যে———— অপেক্ষাকৃত দক্ষ।
(10) অনুমতিপত্রগুলি বাজারে কেনাবেচা হওয়ার সময় ভারসাম্য অবস্থায় তার———— অপরিবর্তিত থাকে, শুধু ———— পরিবর্তিত হতে পারে।

নিম্নের বাক্যগুলি ভুল অথবা ঠিক নির্দেশ করুন :

(11) দীর্ঘকালে দূষণ-নিয়ন্ত্রণে ভর্তুকী একটি কার্যকর ব্যবস্থা।
(12) অনুমতিপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য সংখ্যা ও দাম বাজারের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ওপর নির্ভরশীল।
(13) অনুমতিপত্রের বাজার যোগান রেখা দামের ওপর নির্ভরশীল নয়।
(14) মাত্রা-নির্ধারণ পদ্ধতিতে (Standard setting) উৎপাদক সবসময়েই দূষণ কমাতে চায়।
(15) মাত্রা-নির্ধারণ পদ্ধতিতে শাস্তির পরিমাণ সব সময়েই দক্ষ।
(16) অনুমতিপত্রের লেনদেনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ব্যয়ে নির্দিষ্ট দূষণ মান বজায় রাখা যায়।

৩.৭ সারাংশ

তৃতীয় এককে আমরা যে আলোচনা করেছি তার মূল বিষয়গুলির সারাংশ নীচে দেওয়া হল।

- অত্যধিক পরিবেশ দূষণের ফলে স্বাস্থ্য এবং উৎপাদনশীলতার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। ক্ষতির পরিমাণ দূষণের নির্দিষ্ট মাত্রা (critical level)-এর পরে দূষণের সাথে সমহারে বা বর্ধিত হারে বাড়তে থাকে।
- পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষ এবং পরিবেশের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, তাকে বলে দূষণের কারণে সৃষ্ট বাহ্যিকতা।
- প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধা (MNPB) রেখা ও প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয় (MEC) রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করছে সেই বিন্দুতেই কাম্য উৎপাদন পাওয়া যায়।

- কোজ্ তত্ত্ব অনুসারে, যদি বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ওপর সম্পত্তির অধিকার থাকে এবং দূষণ-সৃষ্টিকারী ও দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এই দুই পক্ষের মধ্যে দরকষাকষি সম্ভব হলে বাজার ব্যবস্থাতেই দূষণ সামাজিকভাবে কাম্য অবস্থানে থাকবে।
- দূষণ-নিয়ন্ত্রণে সরকার সাধারণতঃ আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণের নীতি এবং অর্থনৈতিক বা বাজারনির্ভর নীতি—এই দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করে থাকে।
- দূষণ-নিয়ন্ত্রণে করের ব্যবহার একটি অর্থনৈতিক বা বাজার-নির্ভর নীতি। যখন করের পরিমাণ কাম্য পরিমাণ উৎপাদনের সময় প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়ের সমান হয়, তখন দূষণ সমস্যার সমাধানে কর একটি অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ উপায়। এই করকে অধ্যাপক পিগু (Pigou)-এর নামানুসারে পিগোভিয়ান কর বলা হয়।
- দূষণ-সৃষ্টির জন্য শাস্তি হিসাবে কর প্রদান না করে উৎপাদক অনেক সময় দূষণ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি বসিয়ে দূষণ হ্রাস করে থাকে। তার জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয়, তাকে বলে প্রশমন ব্যয় (abatement cost)। প্রান্তিক প্রশমন ব্যয় যখন প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়ের সমান হয়, সেই বিন্দুতে কাম্য পরিমাণ উৎপাদন ও দূষণ সৃষ্টি হয়।
- আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দূষণের সর্বোচ্চ মান নির্ধারণ করে বেঁধে দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না তা' দেখার জন্য একটি নজরদারি সংস্থা থাকে। সর্বোচ্চ সীমার বেশি দূষণ সৃষ্টি হলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে।
- মাত্রা-নির্ধারণ পদ্ধতি সাধারণতঃ কাম্য অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে না। এক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণও অদক্ষ হয়।
- কর এবং মাত্রা-নির্ধারণ পদ্ধতি দুটি ক্ষেত্রেই MNPB ও MEC রেখা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার যা প্রায়শঃই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
- একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে দূষণকে রাখতে হলে করারোপ পদ্ধতিটি মাত্রা-নির্ধারণ পদ্ধতি অপেক্ষা কম খরচসাপেক্ষ।
- সরকারের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক নীতিটি হল অনুমতিপত্র প্রদান। এই অনুমতিপত্রগুলি বাজারে লেনদেনযোগ্য। দেখা যায়, এই ব্যবস্থাতেই সর্বনিম্ন খরচে একটি নির্দিষ্ট দূষণ-মান বজায় রাখা সম্ভব।
- দূষণ-সৃষ্টির অনুমতিপত্র প্রদানের তিনটি ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যথা, গ্রাহক বিন্দুতে দূষণ অনুযায়ী ব্যবস্থা (Ambient Permit System বা APS), উৎস অনুযায়ী ব্যবস্থা (Emission Permit System বা EPS) এবং মোট দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য APS ও EPS-এর মিলিত ব্যবস্থা (Pollution Offset বা PO)
- দূষণ-নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উৎপাদককে ভর্তুকী দিয়ে উৎসাহিত করতে চাইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট দূষণ কমার পরিবর্তে বেড়ে যেতে পারে।

৩.৮ সার্বিক অনুশীলনী

(1) পরিবেশ দূষণ কী কী ভাবে ক্ষতির সৃষ্টি করে থাকে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(2) ক্ষতি-অপেক্ষক কাকে বলে? চিত্রসহ আলোচনা করুন।

(3) **পার্থক্য নির্দেশ করুন :**

(i) পুঞ্জীভবনশীল ও অ-পুঞ্জীভবনশীল দূষক।

(ii) আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী দূষণ-সৃষ্টিকারী পদার্থ।

(iii) বিন্দু-উৎসজাত ও অ-বিন্দু-উৎসজাত দূষক।

(4) বাহ্যিকতা কাকে বলে? এই বাহ্যিকতার ধারণাটির সাহায্যে কীভাবে সামাজিকভাবে কাম্য দূষণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় আলোচনা করুন।

(5) 'বাহ্যিকতা' সমস্যার সমাধানে কোজ্ তত্ত্বটি আলোচনা করুন। দূষণের কাম্য পরিমাণ নির্ধারণে কোজ্ তত্ত্বটি কী যথেষ্ট দক্ষ? আলোচনা করুন।

(6) দূষণ-নিয়ন্ত্রণে পিগোভিয়ান করের ভূমিকাটি আলোচনা করুন।

(7) দূষণের প্রশমন ব্যয় বলতে কী বোঝায়? প্রশমন ব্যয়ের ধারণাটি ব্যবহার করে সামাজিকভাবে কাম্য পরিমাণ দূষণ নির্ধারণের ব্যাপারটি আলোচনা করুন।

(8) দূষণের কাম্য পরিমাণ নির্ধারণে সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতির ভূমিকা আলোচনা করুন।

(9) কর ও মাত্রা নির্ধারণ পদ্ধতির কোনটি বেশি দক্ষ বলে আপনার মনে হয়? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে আলোচনা করুন।

(10) দূষণ নিয়ন্ত্রণে লেনদেনযোগ্য অনুমতিপত্র প্রদানের ব্যবস্থাটি আলোচনা করুন।

(11) বিভিন্ন ধরনের অনুমতিপত্র প্রদানের ব্যবস্থাগুলি আলোচনা করুন।

(12) দূষণের পরিমাণ হ্রাস করতে ভর্তুকীর ভূমিকা আলোচনা করুন।

(13) APS ও EPS ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(14) অনুমতিপত্র প্রদান ব্যবস্থার সুবিধাগুলি আলোচনা করুন।

৩.৯ উত্তরমালা

[অনুশীলনী ৩.৫.৫]

(1) যে সম্পর্কের দ্বারা আমরা দূষণের সাথে ক্ষতির সম্পর্ক পাই, তাকে বলি ক্ষতি-অপেক্ষক।

(2) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন থেকে উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় বাদ দিয়ে যে নীট দাম অর্থাৎ যে অতিরিক্ত লাভ পাওয়া যায় তাকেই বলে প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধা।

(3) বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী গঠন, বাজারব্যবস্থা ও সরকারি নীতি।

(4) সম্পত্তির অধিকার বলতে সাধারণতঃ কোন সম্পদ ব্যবহারের অধিকারকে বোঝায়। উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(5) কোন একটি ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে পরোক্ষভাবে যে ব্যয় বহন করতে হয়, তাকে বলে লেনদেন ব্যয়। দ্রষ্টব্য : পৃ. ৪৮।

(6) অর্থনৈতিক বা বাজারনির্ভর নীতি এবং অ-বাজার নির্ভর বা আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণের নীতি।

(7) $t^* = MEC$।

(8) দূষণ কর পরিবেশ-দূষণকে কমায় এবং সরকারকে রাজস্ব দেয়। এটাই এই করের দ্বিগুণ লাভদান ক্ষমতা।

(9) শব্দ।

(10) প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়।

(11) লেনদেন।

(12) প্রান্তিক প্রশমন ব্যয়।

(13) (i) ⟶ (iv)
(ii) ⟶ (i)
(iii) ⟶ (ii)
(iv) ⟶ (iii)

(14) কোন দ্রব্য উৎপাদনের সময় মোট উৎপাদনের ব্যয় এবং দূষণজনিত মোট বাহ্যিক ব্যয়ের সমষ্টি হল মোট সামাজিক ব্যয়।

[অনুশীলনী ৩.৬.৭]

(1) আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দূষণের সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রা প্রথমে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। দূষণ তার বেশি হলে দূষণ-সৃষ্টিকারীকে তার জন্য শাস্তিমূলক অর্থ প্রদান করতে হয়। সমগ্র ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নজরদারী সংস্থা থাকে।

(2) না।

(3) MC রেখা উপরদিকে এবং AC রেখা নীচের দিকে সরে যায়। দ্রষ্টব্য : ৩.৪.২ গ।

(4) দূষণের একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করে বিভিন্ন দূষণ সৃষ্টিকারীকে মোট দূষণের কিছু কিছু অংশ সৃষ্টি করার অনুমতি দেওয়া হয়। যে আদেশপত্রের সাহায্যে এই অনুমতি দেওয়া হয় সেগুলি বাজারে লেনদেনযোগ্য। এই আদেশপত্রগুলিকে বলে লেনদেনযোগ্য অনুমতিপত্র।

(5) না।

(6) ASP, EPS ও PO ব্যবস্থা।

(7) EPS।

(8) কর।

(9) কর।

(10) মোট সংখ্যা, দাম।

(11) ভুল।

(12) ভুল।

(13) ঠিক।

(14) ভুল।

(15) ভুল।

(16) ঠিক।

[অনুশীলনী ৩.৮]

(1) দ্রষ্টব্য ৩.২.১।

(2) দ্রষ্টব্য উত্তরমালা, অনুশীলনী ১-এর (1) নং প্রশ্ন ও ৩.২.১।

(3) দ্রষ্টব্য ৩.২.২।

(4) দ্রষ্টব্য ৩.৩।

(5) দ্রষ্টব্য ৩.৪.১ ও ৩.৪.২।

(6) দ্রষ্টব্য ৩.৫.২ ও ৩.৫.৩।

(7) দ্রষ্টব্য ৩.৫.৪।

(8) দ্রষ্টব্য ৩.৬.১।

(9) দ্রষ্টব্য ৩.৬.২।

(10) দ্রষ্টব্য ৩.৬.৪।

(11) দ্রষ্টব্য : ৩.৬.৬।

(12) দ্রষ্টব্য : ৩.৬.৩।

(13) দ্রষ্টব্য : ৩.৬.৬।

(14) দ্রষ্টব্য : ৩.৬.৫।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

(1) Bhattacharyya. R. N. (ed) (2000) : *Environmental Economics—An Indian Perspective.*

(2) Field, Barry. C. (2nd ed) : *Environmental Economics—An Introduction.*

(3) Pearce and Turner : *Environmental and Resource Economics.*

(4) Titenberg : *Environmental Economics and Policy.*

(5) Shogren. J. F. and White, B : *Environmental. Theory and Practice.*

ই. ই. সি—৬

পর্যায়-২৪

অর্থনীতির ঐচ্ছিক পাঠক্রম

(স্নাতক পাঠক্রম)

৮—বি হু হু

৪২ ধাৰা

সংস্থাপন কৰ্মচাৰী নীতিনিয়ম

(সংস্থাপন কমাণ্ড)

একক ১ ❐ পরিবেশের মূল্যায়ন

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর মূল্যায়নের ধারণা

১.৩ মূল্যায়নের পদ্ধতি

১.৩.১ রূপায়িত পছন্দের তত্ত্ব (Revealed Preference Approach)

১.৩.২ ঘোষিত পছন্দের তত্ত্ব (Stated Preference Approach)

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর যদি ব্যবহারিক মূল্য থাকে তাহলে রূপায়িত পছন্দের তত্ত্ব অনুসারে ঐ বস্তুর মূল্যায়ন করতে পারবেন; এবং
- পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর যদি অব্যবহারিক মূল্য থাকে তাহলে ঘোষিত পছন্দের তত্ত্ব প্রয়োগ করে উক্ত বস্তুর মূল্যায়ন করতে পারবেন।

১.১ প্রস্তাবনা

'পরিবেশ' আমরা সবাই নিয়মিত ব্যবহার করি। এর ব্যবহার হয় মূলতঃ দুইভাবে—প্রত্যক্ষভাবে ভোগের (Consumption) জন্য অথবা কোন পণ্য উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে। কিন্তু, যেহেতু 'পরিবেশ'

বস্তুটির বাজারের অস্তিত্ব নেই, আমাদের এর জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। এই বাজারের অস্তিত্বই হল পরিবেশের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রধানতম সমস্যা।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তু (environmental goods)-এর কথা ভাবা যেতে পারে—বিশুদ্ধ বাতাস (অথবা বায়ুদূষণ), বিশুদ্ধ জল (অথবা জলদূষণ), জলাশয়, নদী কিম্বা সমুদ্রতট-এর রমণীয় দৃশ্যপট, অরণ্য এবং বন্যপ্রাণী প্রভৃতি।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা উপরোক্ত উদাহরণগুলির মধ্য থেকে একটিকে (বিশুদ্ধ জল বা বাতাস) বেছে নিয়ে এর থেকে কিভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হই তা দেখি। বিশুদ্ধতর জল ও বাতাস আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ায়, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে। এগুলি হল প্রত্যক্ষ প্রভাব। পরোক্ষ প্রভাবও অনেকগুলি—যেমন বিশুদ্ধতর জল ও বাতাস উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বাড়াতে সাহায্য করে (যেমন, কৃষিজাত ও মৎস্যজাত পণ্যগুলি) অথবা উৎপাদনের খরচ কমিয়ে পণ্যগুলির মূল্যহ্রাসে সহায়তা করে। কিন্তু, এই বস্তুগুলির ক্ষেত্রে বাজারের কোনো সরাসরি অস্তিত্ব নেই।

সাধারণভাবে, যে সমস্ত বস্তু বাজারজাত তার মূল্যায়ন একজন ব্যক্তি কিভাবে করেন—তা বোঝার জন্য অর্থনীতিবিদরা বাজারে ঐ ব্যক্তির কেনাবেচার ধরন প্রত্যক্ষ করে ঐ ব্যক্তির চাহিদা রেখার (ordinary demand curve) পরিমাপ করেন। এর সাহায্যেই বোঝা যায় ঐ ব্যক্তি ঐ পণ্যটির মূল্যায়ন কিভাবে করেন। ধরা যাক, আলোচ্য দ্রব্যটি একটি সাধারণ পণ্য (Normal Commodity) এবং ব্যক্তির চাহিদা রেখা (DD) নিম্নগামী (নীচের ছবির মতো)—

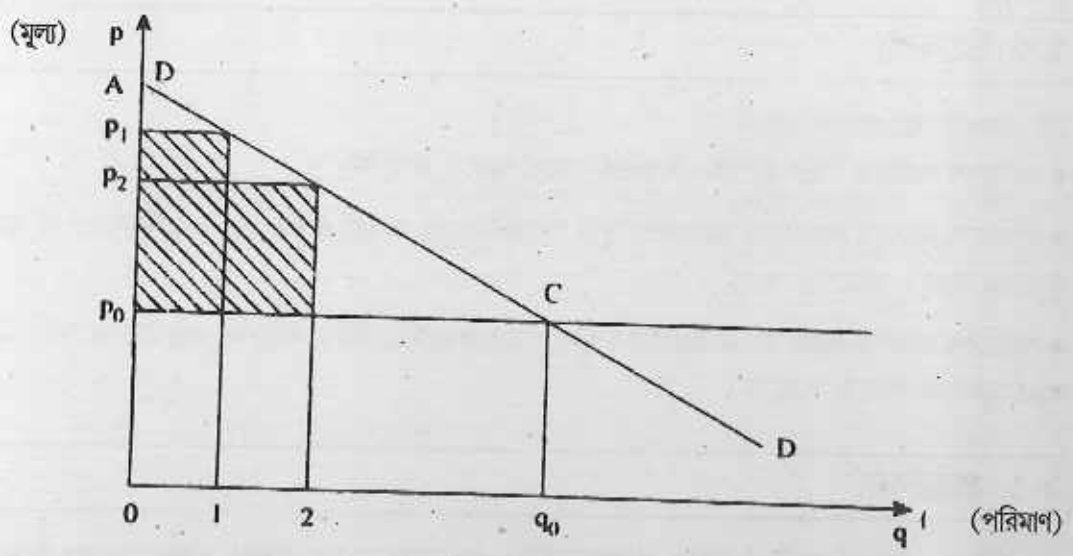

চিত্র 1

দ্রব্যটির মূল্য যখন p_1, ব্যক্তিটি বস্তুটি 1 একক পরিমাণে কেনেন। যখন p_1 তখন 2 একক এবং যখন p_0 তখন q_0 পরিমাণে কেনেন। এই চাহিদা রেখা থেকে অর্থনীতিকরা দু'টি মূল্যবান তথ্য আহরণ করেন—(1) বাজারে আরো বহু ক্রয়যোগ্য পণ্য থাকলেও, ঐ নির্দিষ্ট পণ্যটির জন্য ঐ ব্যক্তি তাঁর কাছে থাকা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের (আয়ের) কতটা অংশ ব্যয় করেছেন, (2) জিনিসটির মূল্য যদি বাড়ে, তাহলে তিনি ঐ পণ্যটির জন্য খরচ কতটা বা কি হারে কমান। এই দুটি তথ্য থেকে ঐ ব্যক্তির ঐ নির্দিষ্ট পণ্যটির মূল্যায়ন সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। যেমন—যদি দেখা যায়, পণ্যটির মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ঐ পণ্যটির জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কমেনি, তাহলে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তির কাছে ঐ বস্তুটির মূল্য বেশ বেশি। [এক্ষেত্রে চাহিদারেখা হবে উল্লম্ব (steep)]। আবার একইভাবে, পণ্যটির মূল্যবৃদ্ধির ফলে ঐ পণ্যটির জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ যদি অনেকটা কমে যায়, তাহলে বোঝা যাবে ঐ ব্যক্তির কাছে ঐ পণ্যটির মূল্য ততটা বেশি নয় [এক্ষেত্রে চাহিদা-রেখাটি হবে অনুভূমিক (flat)]। সুতরাং, চাহিদা রেখাটি উল্লম্ব না অনুভূমিক তা দেখে আমরা ঐ ব্যক্তির ঐ পণ্যটির মূল্যায়ন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি। আবার, চাহিদা রেখার প্রত্যেকটি বিন্দু থেকে জানা যায়, ঐ পণ্যটি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্রয় করার জন্য ঐ ব্যক্তি কত মূল্য দিতে রাজি আছেন। যেমন—উপরের চাহিদারেখাটি থেকে আমরা জানি পণ্যটির 1 একক কেনার জন্য ব্যক্তিটি p_1 টাকা দিতে রাজি আছেন। 2 এককের জন্য p_2 টাকা এবং q_0এককের জন্য p_0 টাকা দিতে রাজি আছেন। এখন বস্তুটি যদি বাজারে p_0 টাকায় পাওয়া যায়, তাহলে প্রথম এককের জন্য ব্যক্তিটি যে পরিমাণ টাকা বেশি দিতে রাজি ছিলেন, তা হল (p_1-p_0)। দ্বিতীয় এককের জন্য যে পরিমাণ টাকা বেশি দিতে রাজি ছিলেন, তা হল (p_2-p_0)। সুতরাং, প্রথম দুটি এককের জন্য ব্যক্তিটি যে পরিমাণ টাকা বেশি দিতে রাজি ছিলেন, তা হল $[(p_1-p_0) + (p_2-p_0)]$, যা উপরের চিত্রে (চিত্র ১-এ) আলাদা ক'রে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই যুক্তিতে, ব্যক্তিটি যখন p_0 দামে q_0 পরিমাণ পণ্য ক্রয় করেন, তখন তিনি যে পরিমাণ টাকা দিতে রাজি ছিলেন, তা হল—

$$\Delta Ap_0C\frac{1}{2}.Ap_0.p_0C = \int_{p_0}^{\Lambda} D(p)\,dp = \int_0^{q_0} p(q)\,dq - p_0q_0,$$ যেখানে $D(p)$ হল চাহিদা অপেক্ষক (Demand function) ; $p(q)$ হল বিপরীত চাহিদা অপেক্ষক (Inverse demand function) আর p_0q_0 হল p_0 মূল্যে ঐ পণ্যের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ। এই সংখ্যাটি হল ঐ মূল্যে ঐ ব্যক্তিটির পণ্যটির জন্য ব্যয় করবার ইচ্ছা বা total-willingness to pay-র পরিমাপ। বাজারের তত্ত্বে এই পরিমাণটিকে consumer surplusও বলা হয়।[1] এটিকেই ব্যক্তিটির ঐ মূল্যে ঐ পরিমাণ পণ্যের মূল্যায়ন

1. উল্লেখ্য, Consumer surplus-ই total willingness to pay-র একমাত্র পরিমাপক নয়। আরো দুটি উল্লেখযোগ্য পরিমাপকের কথা আমরা জানি— (1) Compensated variation আর (2) equivalent variation যেগুলির পূরণবাচক চাহিদা রেখা (compensated demand curve)-এর পরিপ্রেক্ষিতে মাপা হয়। আলোচনা সহজ রাখার জন্য আমরা এই দুটি পরিমাপ নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না। যদিও কয়েক ধরনের পছন্দের (preference structures) জন্য (যেমন—quasi-linear preference) কোনো নির্দিষ্ট মূল্যে এই পরিমাপগুলি সমান। আবার, মূল্য এবং পরিমাণের যদি খুব সামান্য পরিবর্তন ঘটে, তা হলেও এই পরিমাপগুলি প্রায় সমান। তাই consumer surplus-কেই আমরা এই আলোচনায় total willingness to pay-র আনুমানিক (approximate) পরিমাপ হিসাবে কল্পনা করব।

হিসাবে ভাবা হয়। এখন, যদি পণ্যটির মূল্য হ্রাস পায় তাহলে ব্যক্তিটি উপকৃত হন এবং যে পরিমাণ উপকৃত হন, তা total-willingness to pay-র বৃদ্ধির পরিমাণ থেকে পরিমিত হয়। যদি পণ্যটির মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, তাহলে ব্যক্তিটির ক্ষতি হয় এবং সেই ক্ষতির পরিমাণ total willingness to pay-র কমার পরিমাণ থেকে বোঝা যায়। পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির মূল্যায়ন কিন্তু এত সহজে বোঝা অসম্ভব। আমরা এখন পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর মূল্যায়ন পরিমাপের সমস্যাগুলি ও পরিমাপের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১.২ পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর মূল্যায়নের ধারণা

পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর ক্ষেত্রে যেহেতু বাজারের অস্তিত্ব নেই, তাই ঐ বস্তুটির জন্য কোন ব্যক্তির চাহিদারেখা আমরা বাজারজাত পণ্যের চাহিদারেখার মত প্রত্যক্ষ করতে পারি না। আর যেহেতু চাহিদারেখা প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই আগে বাজারজাত পণ্যের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে কোন নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর জন্য ঐ ব্যক্তির total willingness to pay পরিমাপ করতে পেরেছিলাম, সেই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য অর্থনীতিকরা পরোক্ষভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর চাহিদারেখা নিরূপণ করার চেষ্টা করেন। এর জন্য প্রাথমিকভাবে বস্তুগুলিকে তাদের মূল্যায়নের উৎস অনুযায়ী দুভাগে ভাগ করা হয়— (1) যে সমস্ত বস্তুর কেবলমাত্র ব্যবহারিক মূল্য (use value) আছে—এই জাতীয় বস্তুর মূল্য সম্পর্কে আমাদের ধারণার সৃষ্টি হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বস্তুটির ব্যবহার বা ভবিষ্যতে ব্যবহারের সম্ভাবনা থেকে, যেমন—বিশুদ্ধ জল ও বাতাস, অরণ্য বা সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণ ইত্যাদি। (2) যে সমস্ত বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য ছাড়াও অন্য মূল্য আছে অথচ কোনো ব্যক্তিগত মূল্যবোধের থেকে যে সমস্ত বস্তুর মূল্য দেওয়া হয় (non-use-value), যেমন—আফ্রিকার লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কিম্বা আমাজন অরণ্য সংরক্ষণ—ব্যক্তিগতভাবে কোনদিন আফ্রিকা বা আমাজন না গেলেও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের বহু মানুষ এই সংরক্ষণের বিষয়টিকে মূল্য দেন।

যে সমস্ত বস্তুর কেবলমাত্র ব্যবহারিক মূল্য আছে তাদের চাহিদারেখা নিরূপণ করা হয় যে পদ্ধতিতে, তাকে বলা হয় "রূপায়িত পছন্দের তত্ত্ব" (Revealed Preference Approach)। যে সব বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য ছাড়াও অন্য মূল্য আছে তাদের ক্ষেত্রে চাহিদারেখা নিরূপণের পদ্ধতিকে বলা হয় "ঘোষিত পছন্দের তত্ত্ব" (State Preference Approach)। এখন আমরা সংক্ষেপে এই পদ্ধতিগুলি আলোচনা করব।

১.৩ মূল্যায়নের পদ্ধতি

১.৩.১ রূপায়িত পছন্দের তত্ত্ব (Revealed Preference Approach)

এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির আচরণ প্রত্যক্ষ করে পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুটির চাহিদা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়। দুভাবে এই কাজটি করা হয়—

(1) **ভোগসুখ সম্পর্কিত মূল্য পদ্ধতি** (Hedonic Price Method) : এই প্রক্রিয়ায় এমন একটি পণ্যের বাজারে কেনাবেচার ক্ষেত্রে ব্যক্তিটির আচরণ লক্ষ্য করা হয় যার দামের ওপর পরিবেশের নিবিড় প্রভাব আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শহরের যে এলাকায় বায়ুদূষণ খুব বেশি, সেখানে বাড়ীভাড়া কম; আবার যেখানে বায়ুদূষণ কম, সেখানে বাড়ীভাড়া বেশি। আবার, এই যে শহরের দুই এলাকায় বাড়ীভাড়ার পার্থক্য, তা বায়ুদূষণ ছাড়াও আরো অনেক কারণের ওপর নির্ভর করতে পারে। এরকম হতেই পারে যে, শহরের যে অংশে বায়ুদূষণ কম, সেখানে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বেশি, বাড়ীগুলিতে ঘরের সংখ্যা বেশি। অভিজাত শ্রেণীর বাস এবং ফলত তুলনামূলকভাবে বাড়ীভাড়া বেশি। সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য নিয়ে অর্থনীতিকরা বুঝতে পারেন বাড়ীভাড়ার মোট পার্থক্য কোন্ কারণটির জন্য কতটা। যদি দেখা যায় বাড়ীভাড়ার পার্থক্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দূষণের মাত্রার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, তাহলে সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য নিয়ে এ-ও বোঝা যায় যে, দূষণের মাত্রার সামান্য একটু পরিবর্তন হ'লে এবং অন্য সমস্ত কারণগুলি অপরিবর্তিত রাখলে, বাড়ীভাড়ার হারের কতটা পরিবর্তন ঘটবে। একেই বলা হয় প্রান্তিক ব্যয় করার ইচ্ছা বা Marginal Willingness To Pay (MWTP) এখানে বাড়ীভাড়ার হারের এই অংশটুকুকে আমরা বিশুদ্ধ বায়ুর মূল্যের সূচক হিসাবে কল্পনা করতে পারি। সুতরাং, বায়ুর বিশুদ্ধতার মাত্রাকে যদি a এবং বিশুদ্ধ বায়ুর মূল্যকে যদি P দিয়ে সূচিত করি, তাহলে আমরা শহরের বিভিন্ন অংশের বাড়ীভাড়া প্রত্যক্ষ করে বায়ুর বিশুদ্ধতার মাত্রার সঙ্গে মূল্যের একটি সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি, যাকে হেডোনিক দাম অপেক্ষক বা Hedonic Price Function বলা হয়। আগেই বলা হয়েছে, Hedonic Price Function-এর চিত্রটি হবে নিম্নরূপ—

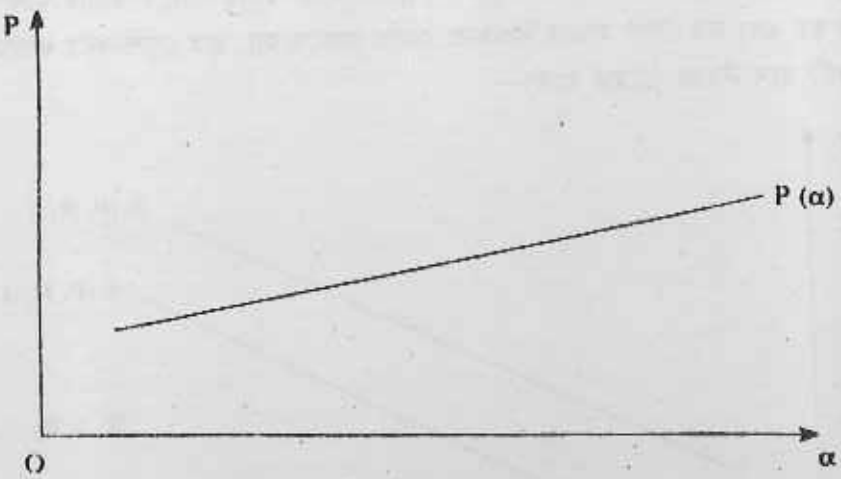

চিত্র 2

চিত্র ২-তে P(α) হল Hedonic Price Function। কিন্তু, বাজারে বিশুদ্ধ বায়ুর যে দাম আমরা প্রত্যক্ষ করি তা বিশুদ্ধ বায়ুর চাহিদা রেখা আর যোগান রেখার সংযোগের ফলে উদ্ভুত স্থিতিগুলিকে সূচিত করে।

বিষয়টি আরো একটু প্রাঞ্জল করা যাক্। যেহেতু বিশুদ্ধ বায়ু একটি সাধারণ পণ্য (normal commodity), এর চাহিদা অপেক্ষকটি হওয়া উচিত $\alpha = D(P, Y)$, যেখানে Y হল ব্যক্তির আয় এবং $D'(P) < 0$, $D'(Y) > 0$। নীচের চিত্রে চাহিদারেখাটি দেখানো হল—

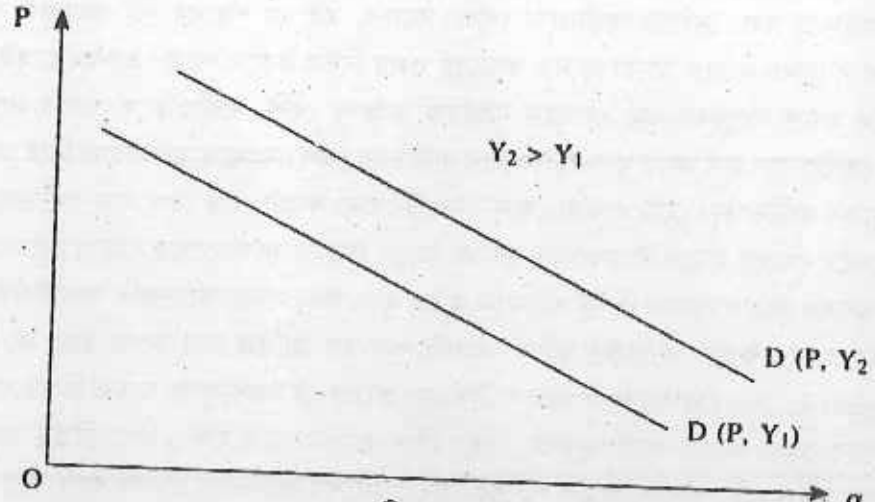

চিত্র 3

আবার, এর যোগান অপেক্ষকটি হওয়া উচিত $\alpha = S(P, r)$, যেখানে r হল অন্যান্য কাঁচামালের দাম এবং $S'(P) > 0$, $S'(r) > 0$, কারণ, বায়ুর বিশুদ্ধতার মাত্রা বজায় রাখতে বাড়ীর মালিককেও কিছু ব্যবস্থা নিতে হয় এবং যত বেশি মাত্রার বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে হয়, তত বেশি খরচ করতে হয়। তাই যোগান রেখাটি হবে নীচের চিত্রের মতো—

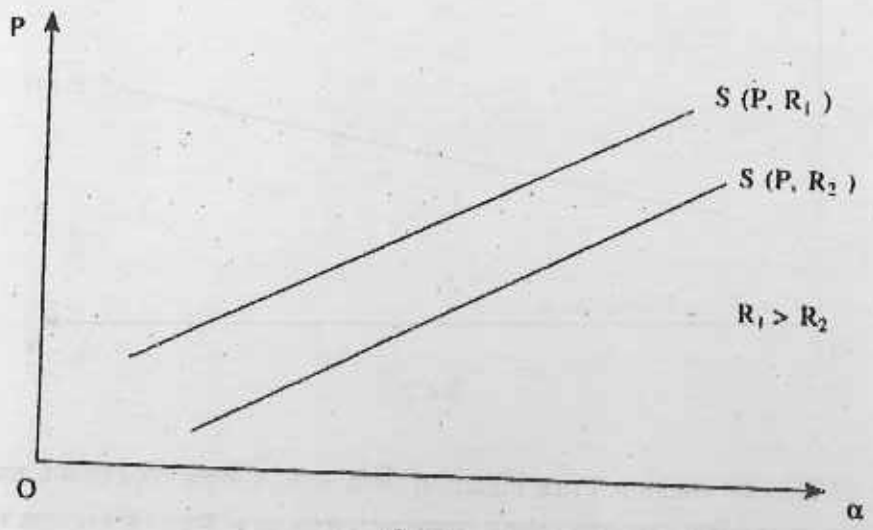

চিত্র 4

লক্ষণীয় যেহেতু অন্যান্য কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে একই মাত্রার বিশুদ্ধতা বজায় রাখার খরচ বাড়ে, তাই $S'(r) > 0$। ফলত, ওপরের চিত্রে $S(P, R_1)$ যোগান রেখাটি $S(P, R_2)$ যোগানরেখার ওপরে অবস্থিত। চিত্র 2-তে আমরা যে Hedonic Price Function-টি পেয়েছি, তা যে উপায়ে পাওয়া গেছে, তা পরবর্তী চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল—

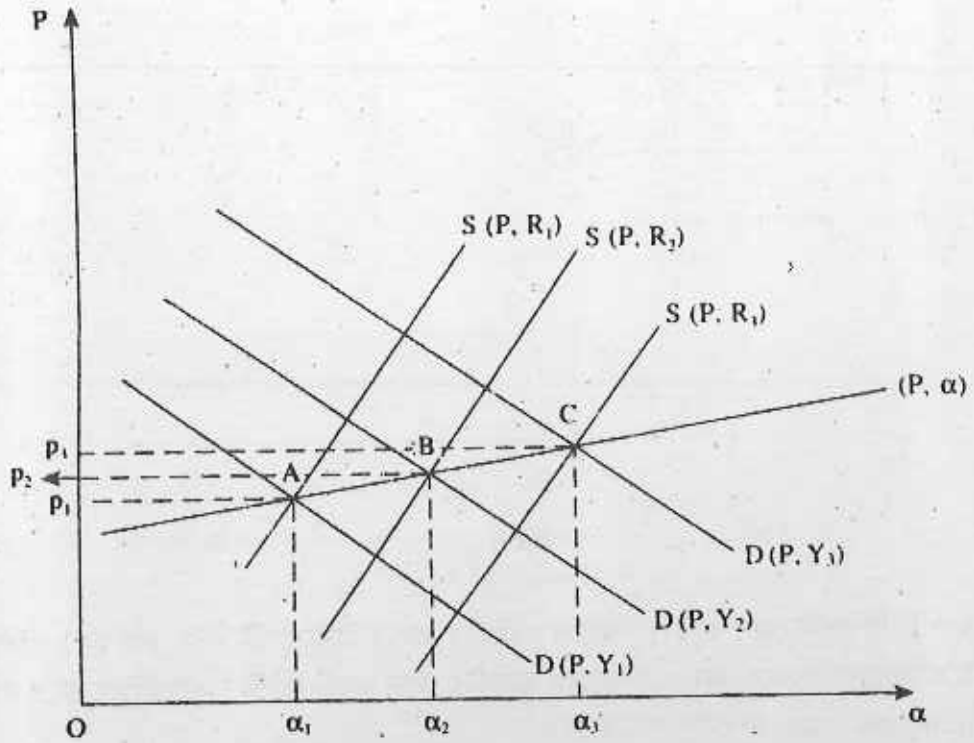

চিত্র 5

বাজারে আমরা যে মূল্যগুলি প্রত্যক্ষ করি, তা ঐ সমস্ত বস্তুর চাহিদা ও যোগানের ফলে উদ্ভুত স্থিতি অবস্থাকে সূচিত করে। আমরা আগেই বলেছি Hedonic Price Function-এর মূল্যগুলি বাজারে প্রত্যক্ষ করা, অতএব P_1, P_2, P_3-র মতো চাহিদা ও যোগানরেখার সংযোগের ফলে উদ্ভুত। উল্লেখ্য, আদতে আমরা D(p, y) বা S(p, r) রেখাগুলি বাস্তবে প্রত্যক্ষ করি না—যা প্রত্যক্ষ করি, তা হল A, B, C-র মতো স্থিতাবস্থার সূচক বিন্দুগুলি, যেগুলি Hedonic Price রেখাটির ওপর অবস্থিত। প্রশ্ন হল, তাহলে বিশুদ্ধ বায়ুর জন্য চাহিদারেখার পরিমাপ কিভাবে সম্ভব। এর জন্য আমরা যেটা করতে পারি তা হল, কোনো ব্যক্তির আয়ের পরিমাণটি (y) স্থির রেখে কাঁচামালের বিভিন্ন মূল্যমান (r)-এর ক্ষেত্রে বাজারে p এবং α-র যে মানগুলি প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং এই বিন্দুগুলি (α – p)-তলে স্থাপন করে ও যোগ

করে বিশুদ্ধ বায়ুর জন্য Y-আয়ের ব্যক্তির চাহিদারেখা নিরূপণ করতে পারি। এই পদ্ধতিটি নীচের চিত্রে বিশদে দেখানো হল—

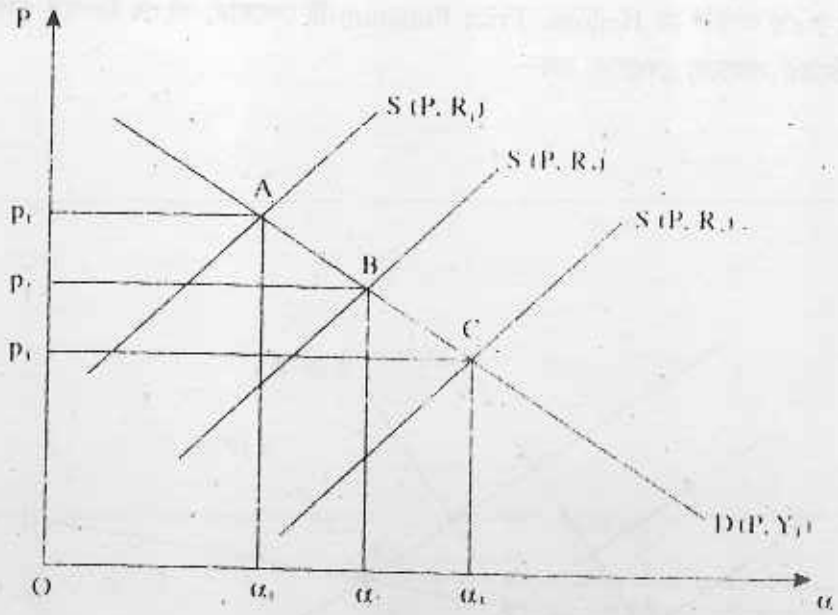

চিত্র 6

A, B ও C বিন্দুগুলি যোগ করে Y_1-আয়ের ব্যক্তিটির জন্য চাহিদারেখাটি নির্ণয় করা হল। সুতরাং, এবার এই চাহিদারেখাটি থেকে আমরা ঐ আয়ের ব্যক্তিটির কোন একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বিশুদ্ধ বায়ুর জন্য total willingness to pay পরিমাপ করতে পারি।

Hedonic Price Method হলো বাজারজাত নয়, এমন সমস্ত বস্তুর চাহিদারেখা নিরূপণের প্রাচীনতম পদ্ধতি। কিন্তু, এর সমস্যা হল, এই পদ্ধতিটি সফলভাবে প্রয়োগ করতে গেলে পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুটির কোন একটি বাজারজাত পণ্যের মূল্যের ওপর নিবিড় প্রভাব থাকতে হবে। কিন্তু, বাস্তবে সমস্ত পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রভাব না থাকতে পারে। যেমন—সমুদ্রসৈকত বা অরণ্যানীর রমণীয়তা, যা আমরা প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করি, পরোক্ষভাবে নয়। আবার, সমস্ত পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুই যে বাজারজাত পণ্যের মূল্যকে নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করবে, এমন নয়। পরিবেশ দূষণের ফলে হয়তো প্রতি মুহূর্তে বহু প্রজাতি ধ্বংস হচ্ছে—তাদের প্রভাব বাজারজাত পণ্যের মূল্যের ওপর প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়—সুতরাং, এই জাতীয় বস্তুর চাহিদারেখাও এই পদ্ধতিতে নিরূপণ করা অসম্ভব। তাই এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আরো কয়েকটি অন্য পদ্ধতিরও সাহায্য নেওয়া হয়, যেগুলি আমরা এবার একে একে আলোচনা করব।

(2) পরিবারের উৎপাদন অপেক্ষক পদ্ধতি (Household Production Function Method) :

এই পদ্ধতিটির মূলে আছে অর্থনীতিবিদ্ Gary Becker কর্তৃক উদ্ভাবিত পারিবারিক উৎপাদন বা 'Household Production' সম্পর্কিত ধারণা। Becker-এর মতে, আমরা যে সমস্ত বস্তু ভোগ করি (consume), সেগুলি আদতে আমরা গৃহের অভ্যন্তরে ভোগের জন্য প্রথমে উৎপাদন (produce) করে নিয়ে তারপর ভোগ করি। উদাহরণস্বরূপ—কোন বস্তু বাজার থেকে ক্রয় করা মানেই বস্তুটি ভোগ করা নয়, আমাদের অবসর সময়ের কিছুটা ব্যয় করে তবেই আমরা আর একটি নতুন ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করি, যে বস্তুটি আমরা ভোগ করতে পারি। সুতরাং, এই পদ্ধতিতে বস্তুটির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণে শুধুমাত্র বস্তুটির বাজারগত মূল্যের হিসাব নেওয়াই যথেষ্ট নয়, ব্যয়িত অবসরের মূল্যেরও হিসাব নেওয়া প্রয়োজন। Becker-এর এই ধারণা পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুগুলির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সার্থকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। যেমন—কোন সংরক্ষিত অরণ্য যেখানে মানুষ ভ্রমণ করতে আসেন, সেটি সম্পর্কে ভ্রমণার্থীদের মূল্যায়ন অথবা কোন অঞ্চলে যেখানে শব্দদূষণের প্রকোপ বেশি, সেখানে 'শব্দদূষণ' সম্পর্কে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মূল্যায়ন। প্রথমটির ক্ষেত্রে ভ্রমণার্থীরা কোন সংরক্ষিত অরণ্যে ভ্রমণের আনন্দ পাওয়ার জন্য যে অর্থব্যয় ও সময় ব্যয় করেন, তা থেকে 'সংরক্ষিত অরণ্য'-এর ক্ষেত্রে তাদের মূল্যায়ন কী, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, যে সব অঞ্চলে শব্দদূষণের প্রকোপ বেশি, সেখানে মানুষ শব্দদূষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থায় অর্থব্যয় ও সময়ব্যয় করেন, তা থেকে তাঁদের দূষণমুক্ত পরিবেশের মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নীচে পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। এগুলির মধ্যে দুটি প্রধান প্রচলিত পদ্ধতি হলো— (ক) Travel Cost Method বা ভ্রমণ ব্যয় পদ্ধতি এবং (খ) Averting Cost Method বা প্রতিরোধ ব্যয় পদ্ধতি।

(ক) ভ্রমণ ব্যয় পদ্ধতি (Travel Cost Method) :

আমরা প্রথমে আমাদের প্রথম উদাহরণটি অর্থাৎ 'সংরক্ষিত অরণ্যে ভ্রমণ'-এর চাহিদারেখা ভ্রমণের জন্য মানুষের খরচের পরিমাণ দেখে কিভাবে নিরূপণ করা যায়, তা সংক্ষেপে আলোচনা করব। যে পদ্ধতিতে এটি করা হয়, তাকে বলা হয় Travel Cost Method, প্রাথমিকভাবে ধরা যাক, সংরক্ষিত অরণ্যটি ভ্রমণের জন্য কোন প্রবেশ মূল্য নেই। এবার, কে কোন্ দূরত্ব থেকে আসছেন তার ভিত্তিতে আমরা ঐ অরণ্যে আগত পর্যটকদের কতকগুলি ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি। যেমন (i) Zone A (প্রবেশপথ থেকে 10 কিমি. ব্যাসার্ধের মধ্যের অঞ্চল) থেকে আগত পর্যটক (ii) Zone B (প্রবেশপথ থেকে 10-20 কিমি. ব্যাসার্ধের অঞ্চল) থেকে আগত পর্যটক (iii) Zone C (প্রবেশপথ থেকে 20-30 কিমি. ব্যাসার্ধের অন্তর্গত অঞ্চল) থেকে আগত পর্যটক (iv) Zone D (প্রবেশপথ থেকে 30-40 কিমি. ব্যাসার্ধের মধ্যের অঞ্চল) থেকে আগত পর্যটক এবং (v) Zone E (প্রবেশপথ থেকে 40 থেকে 50 কিমি. ব্যাসার্ধের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল) থেকে আগত পর্যটক। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ধরে নিলাম, একেকটি

অঞ্চল থেকে প্রবেশপথে পৌঁছানোর জন্য ঐ অঞ্চলের সমস্ত পর্যটকের একই রকম ভ্রমণ খরচ লাগে। নীচের সারণীতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত পর্যটকদের সংখ্যা ও তাঁদের ভ্রমণ খরচ দেওয়া হল—

সারণী 1

অঞ্চল	ভ্রমণ খরচ (টাকা)	পর্যটক সংখ্যা	জনসংখ্যা
Zone A	10	40	4000
Zone B	20	30	30,000
Zone C	30	20	2000
Zone D	40	10	10,000
Zone E	50	0	5000

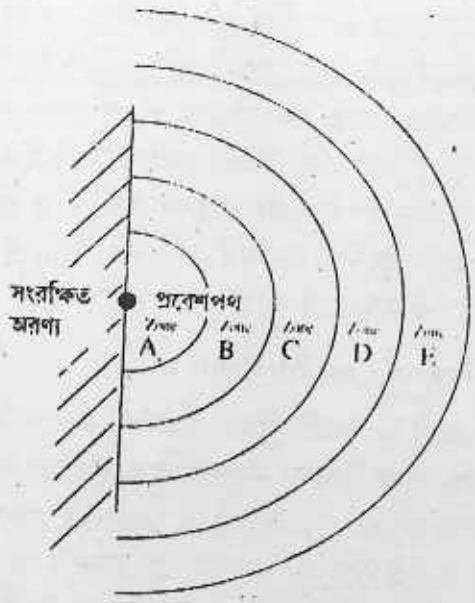

যদিও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বর্তমানে অরণ্যের কোন প্রবেশমূল্য নেই, কিন্তু সারণী 1-এর তথ্যগুলি কাজে লাগিয়ে নির্ণয় করা সম্ভব বিভিন্ন প্রবেশমূল্যের ক্ষেত্রে পর্যটক সংখ্যা কিভাবে পরিবর্তন করবে অর্থাৎ 'সংরক্ষিত অরণ্যে ভ্রমণ' এই পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুটির চাহিদারেখা কেমন হবে। বর্তমানে, যখন প্রবেশমূল্য = 0, তখন পর্যটকের সংখ্যা = (40 + 30 + 20 + 10 + 0) = 100। ধরা যাক্ প্রবেশ মূল্য বেড়ে হল 10 টাকা। ফলে প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে আগত ভ্রমণার্থীদের ভ্রমণখরচ 10 টাকা করে বৃদ্ধি

পাবে। যদি আমরা ধরে নিই প্রত্যেকটি অঞ্চলের পর্যটকদের পছন্দ (taste and preference) একইরকম এবং আয়ও একইরকম, তাহলে ভ্রমণখরচ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত পর্যটক সংখ্যার একইভাবে হ্রাস পাবে। এই পরিবর্তনের ধরন নীচের সারণীতে দেওয়া হল—

সারণী 2

অঞ্চল	ভ্রমণ খরচ (টাকা)	পর্যটক সংখ্যা (জন)
Zone A	10	30
Zone B	30	20
Zone C	40	10
Zone D	50	0

সুতরাং, প্রবেশমূল্য যখন 10 টাকা, মোট পর্যটক সংখ্যা = (30 + 20 + 10 + 0) = 60 জন। একইভাবে, আমরা দেখতে পারি প্রবেশমূল্য যখন 20 টাকা, মোট পর্যটক সংখ্যা 30 জন। যখন প্রবেশমূল্য 30 টাকা, পর্যটক সংখ্যা 10 জন এবং তার বেশি প্রবেশমূল্য হলে, পর্যটক সংখ্যা দাঁড়ায় শূন্য। এই সংখ্যাগুলি ব্যবহার করে নীচের চিত্রে আমরা 'অরণ্যভ্রমণ'-এর চাহিদারেখার একটি ধারণা পেতে পারি—

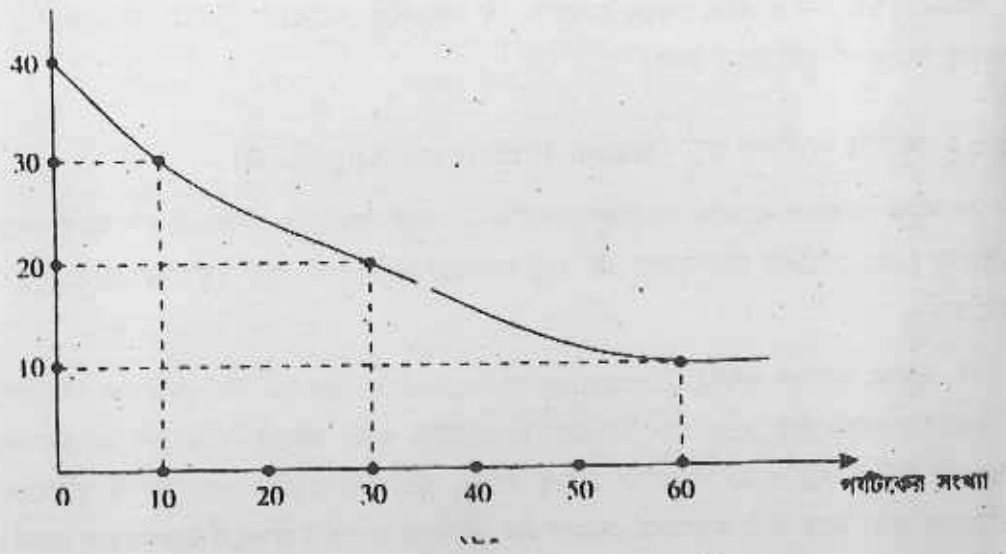

এখানে, পর্যটকের সংখ্যা 'অরণ্য ভ্রমণ'-এর চাহিদার সূচক। সুতরাং, এই চাহিদারেখা থেকে আমরা কোন নির্দিষ্ট প্রবেশমূল্যে পর্যটকদের total willingness to pay পরিমাপ করতে পারি, যা ঐ প্রবেশমূল্যে consumer surplus-এর পরিমাণের সমান।

(খ) প্রতিরোধ ব্যয় পদ্ধতি (Avertion Cost Method) :

দ্বিতীয় উদাহরণের ক্ষেত্রে শব্দদূষণ প্রতিরোধের জন্য মানুষের খরচের পরিমাণ দেখে সংখ্যাতাত্ত্বিক উপায়ে আমরা নির্ণয় করতে পারি শব্দদূষণ সামান্য পরিমাণ বাড়লে প্রতিরোধের খরচ কতটা বাড়ে। যেমন জানলায় দুই বা তিনস্তর কাঁচ বসিয়ে শব্দদূষণ কমানো যায়। এই খরচকে আমরা শব্দদূষণমুক্ত পরিবেশের মূল্য হিসাবে ভাবতে পারি। সুতরাং, একই আয়ের মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দদূষণ মাত্রার সঙ্গে শব্দদূষণ খরচের সম্পর্ক নির্ণয় করে আমরা শব্দদূষণমুক্ত পরিবেশের চাহিদারেখা নিরূপণ করতে পারি।

আমরা এখনো যে কটি পদ্ধতি আলোচনা করেছি, তার সবগুলিতেই মানুষ পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করে বা করার কথা ভাবে। কিন্তু এমন অনেক পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তু আছে যেগুলি মানুষ কোনভাবে ব্যবহার করে না বা ভবিষ্যতেও ব্যবহার করার কথা ভাবে না, কিন্তু, অনেকসময় এগুলি সম্পর্কে তাদের একটা মূল্যায়ন থাকে (যেমন—আমাজন অরণ্য সংরক্ষণ)। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য অনেকসময় এমন কিছু বস্তুর মূল্যায়নের দরকার পড়ে যার বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই (যেমন—বিশুদ্ধ বায়ু)। এসব ক্ষেত্রে যেভাবে এই বস্তুগুলির চাহিদারেখা নির্ণয় করা হয়, তা এরপরে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১.৩.২ ঘোষিত পছন্দের তত্ত্ব (Stated Preference Approach) :

যে সমস্ত পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তু মানুষ কোনদিন ব্যবহার করেনি বা ভবিষ্যতেও ব্যবহার করার কোন সম্ভাবনা নেই, সেগুলির চাহিদারেখা এই পদ্ধতির সাহায্যে নিরূপণ করা হয়। সাধারণতঃ দুভাবে এটি করা হয়—

(1) **সম্ভাব্য মূল্যায়ন পদ্ধতি** (Contingent Valuation Method) : এই পদ্ধতিতে পরিবেশের মূল্য ভোক্তাকে সরাসরি প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয় এবং মানুষকে প্রশ্ন করা হয় ঐ বস্তুটির যদি বাজারের অস্তিত্ব থাকত, তাহলে ঐ বস্তুটির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য তিনি কত টাকা দিতে রাজি থাকতেন। সমস্যা হল, এক্ষেত্রে ঐ বস্তুটি সম্পর্কে উত্তরদাতার কোন ধারণাই থাকে না, তাই এই প্রশ্নপত্র থেকে পাওয়া তথ্যগুলি অনেকসময়ই অবাস্তব হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে

যায়। তাই অনেকসময় উত্তরদাতার মনে বস্তুটি সম্পর্কে একটি ধারণাসৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। যেমন—বিশুদ্ধ বস্তুর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, বায়ুদূষণের ফলে দৃশ্যমানতা কতটা কমবে তা কৃত্রিমভাবে রচিত আলোকচিত্রের সাহায্যে উত্তরদাতাকে দেখানো হয়। এইভাবে এই পরিসংখ্যানগুলি পাওয়ার পর সংখ্যাতাত্ত্বিক উপায়ে প্রত্যেক আয়ের মানুষের ক্ষেত্রে বায়ুদূষণের চাহিদারেখা নির্ণয় করা হয় এবং তা থেকে সার্বিক চাহিদারেখা নিরূপিত হয়।

(2) পরীক্ষা পদ্ধতি (Experimental Method) : আগে বর্ণিত Contingent Valuation পদ্ধতির সবথেকে বড় সমালোচনার দিকটি হল আসলে বস্তুগুলির ব্যবহারের কোন অস্তিত্ব নেই। তাই ঐ বস্তুগুলির বিভিন্ন পরিমাণের জন্য যে মূল্য প্রতিশ্রুত হচ্ছে, এমন নয় তা চাহিদা আর যোগানের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে, অন্যান্য আরো অনেক সম্ভাব্য ক্রয়যোগ্য বস্তুর উপস্থিতিতে স্থিরীকৃত হচ্ছে। সেই কারণে, অনেকে এই পদ্ধতিতে নির্ণীত মূল্যায়নকে প্রামাণ্য বলে মানতে চান না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য experimental method-এর কথা ভাবা হয়। এই পদ্ধতিতে যে বস্তুগুলির বাজারের অস্তিত্ব নেই তাদের বাজার কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয় এবং সেখানে মানুষের কেনাবেচার ধরন প্রত্যক্ষ করে ঐ বস্তুগুলির চাহিদারেখা নিরূপণ করা হয়। দুভাবে এটি করা যায়।

(ক) ক্ষেত্রগত পরীক্ষণ (Field Experiment) : এই ধরনের পদ্ধতি শুধুমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব যেখানে বস্তুটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আছে। যেমন—ধরা যাক, কোন জলাশয়ে মাছ ধরার ওপর সরকারি বিধিনিষেধ আছে। এবার আমরা ঐ জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য কিছু অনুমতিপত্র তৈরি করে তা নিলাম করলাম। নিলামের দামের ওপর নির্ভর করে জলাশয়ের চাহিদারেখা নিরূপণ করা হল।

(খ) বীক্ষণাগার পরীক্ষণ (Laboratory Experiment) : এই পদ্ধতিতে কিছু মানুষকে একত্রিত করে তাদের কিছু টাকা দিয়ে সত্যি সত্যিই কোন বস্তু কেনাবেচার সুযোগ করে দিয়ে দেখা হয়, তারা বাজারে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং বিভিন্ন মূল্যে কি পরিমাণ দ্রব্য হাতবদল হচ্ছে। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে চাহিদারেখা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়।

১.৪ সারাংশ

পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুগুলির বাজারের কোন অস্তিত্ব নেই, অথচ এই বস্তুগুলির বিভিন্নরকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারিক মূল্য (use value) এবং অব্যবহারিক মূল্য (non-use value) আছে। কিন্তু যেহেতু এদের বাজার নেই, সাধারণ পণ্যের মতো এদের ক্ষেত্রে চাহিদারেখার সাহায্যে বস্তুটির মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। তাই বিভিন্ন পরোক্ষ উপায়ে এই বস্তুগুলির চাহিদারেখা নিরূপণ করে বস্তুটির মূল্যায়ন বোঝার

চেষ্টা করা হয়। যেসব বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য আছে, তাদের ক্ষেত্রে Revealed Preference Approach এবং যাদের অব্যবহারিক মূল্য আছে, তাদের ক্ষেত্রে Stated Preference Approach অবলম্বন করা হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়— Hedonic Price Method এবং Household Production Function Method। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও দুটি পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়— Contingent Valuation Method এবং Experimental Method। আমরা সংক্ষেপে এই পদ্ধতিগুলি আলোচনা করেছি। তবে উল্লেখ্য যে, অনেক বস্তুরই ব্যবহারিক এবং অব্যবহারিক—দুটি মূল্যই থাকতে পারে। সাধারণতঃ বস্তুটির ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কেই আমাদের সচেতনতা বেশি, অব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে সচেতনতা কম। তাই কোন বস্তুর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের সমস্ত সম্ভাব্য উৎসের কথা ভাবার চেষ্টা করা উচিত এবং এটাও সম্ভব যে হয়তো কোন একটি বস্তুর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ওপরে আলোচিত দুটি approach-ই ব্যবহৃত হতে পারে। একথা ঠিক যে, পরিবেশের প্রক্রিয়াগুলি ঠিকমতো বুঝতে না পারলে বস্তুর অব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে আমাদের চেতনা ঠিকমতো গড়ে ওঠে না এবং কোন বস্তুর মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু এই পরিমিতির মধ্যেও মূল্যায়িত সংখ্যাগুলি দিয়ে আমরা পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাত বুঝতে পারি, যা উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

১.৫ অনুশীলনী

(1) সাধারণ ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির মূল্যায়ন কিভাবে নির্ণয় করা হয়, বিবৃত করুন। পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না কেন—আলোচনা করুন।

(2) পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর মূল্যায়নের উৎস কি কি? উৎস অনুসারে এই বস্তুর মূল্যায়ন কি কি উপায়ে করা যায়—বিবৃত করুন।

(3) Revealed Preference Approach কোন ধরনের পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়? এই approach-এর প্রধান দুটি পদ্ধতি আলোচনা করুন।

(4) সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন—

(ক) Hedonic Price Method

(খ) Travel Cost Method.

(5) Hedonic Price Method এবং Travel Cost Method-এ যে ধরনের বস্তুর মূল্যায়ন করা হয়, তাদের পার্থক্য কী? Hedonic Price Method-এর ত্রুটিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(6) যেসব পরিবেশ সংক্রান্ত বস্তুর অব্যবহারিক মূল্য আছে, তাদের মূল্যায়ন কিভাবে করা হয়—সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

(1) Bary Field : *Environmental Economics.*

(2) Titenberg : *Environmental Economics & Policy.*

(3) Pearce and Tumer : *Environmental and Resource Economics.*

একক ২ ❐ পরিবেশ ও উন্নয়ন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক ও বিরোধ

২.৩ নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন (Sustainable Development) সম্পর্কে ধারণা

২.৪ সারাংশ

২.৫ অনুশীলনী

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- পরিবেশ এবং দারিদ্র্যের মধ্যে সম্পর্কটি অনুধাবন করতে পারবেন।
- পরিবেশ এবং উন্নয়নের মধ্যে বিরোধ কী কী সেই বিষয়ে অবগত হতে পারবেন; এবং
- নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

২.১ প্রস্তাবনা

দারিদ্র্য ও পরিবেশ দূষণ একে অপরকে প্রভাবিত করে। প্রথমে দেখা যাক্, পরিবেশ দূষণ কিভাবে দারিদ্র্যকে প্রভাবিত করে। দরিদ্র মানুষরা, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, জীবিকার জন্য অনেকাংশে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল—যেমন অরণ্য ও অরণ্যজাত দ্রব্যাদি, নদী ও জলাশয়ের মাছ, পশুচারণের জন্য তৃণভূমি কিম্বা জলসেচের জন্য জলাশয় ও নদী। স্বাভাবিকভাবেই অরণ্য, নদী ও জলাশয়গুলি দূষিত হয়ে পড়লে দরিদ্র মানুষের জীবিকানির্বাহ আরো দুরূহ হয়ে ওঠে। আবার অন্যদিক থেকে দেখলে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ জীবিকানির্বাহের জন্য অনেক সময় অরণ্য ধ্বংস করে, জমি ও জল অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করে, যা ভবিষ্যতে পরিবেশের ধারণক্ষমতা কমিয়ে দেয়। অতএব দ্রারিদ্র্য ও পরিবেশ দূষণ একটি

দুষ্টচক্রের (vicious circle) অংশ হয়ে ওঠে, কারণ, দারিদ্র্য পরিবেশকে দূষিত করে আবার পরিবেশ দূষিত হলে দারিদ্র্য ঘনীভূত হয়।

২.২ পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক ও বিরোধ

যে সমস্ত দরিদ্র দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যে এই দুষ্টচক্রের বাইরে আসতে সক্ষম হয়েছে, অর্থনীতিবিদরা লক্ষ্য করেছেন যে তাদের ক্ষেত্রে, সময়ের সাপেক্ষে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার আর পরিবেশের গুণগত মানের পরিবর্তনের সম্পর্ক হল নীচের চিত্রের মতো—যা 'Environmental Kuznets Curve' নামে সুবিদিত।

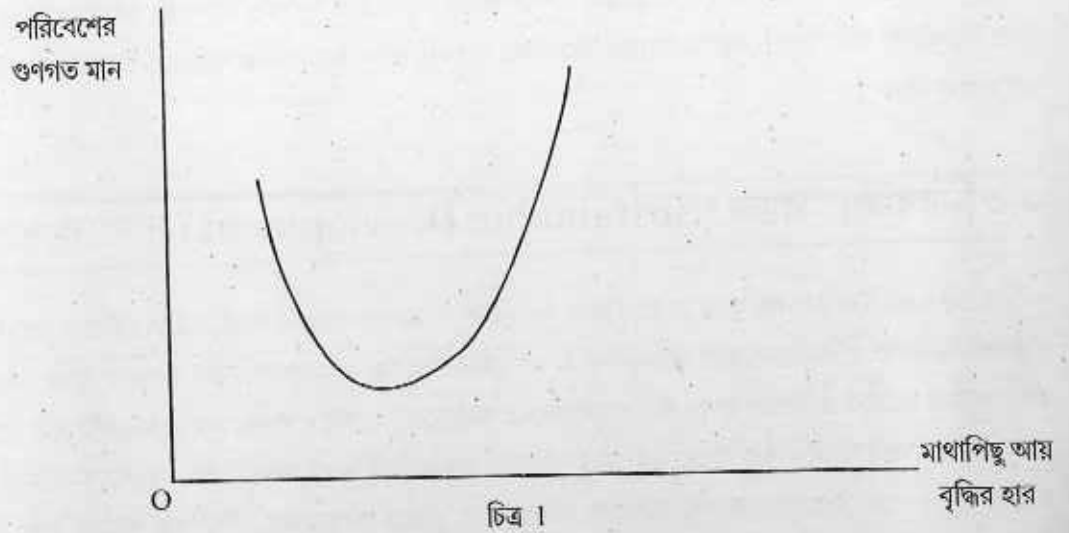

চিত্র 1

মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে পরিবেশের গুণগত মান হ্রাস পায় কিন্তু মাথাপিছু আয় খানিকটা বাড়ার পর পরিবেশের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থনীতিবিদ্‌রা এ রকম সম্পর্কের কারণ হিসাবে মনে করেন—(1) মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির থেকে (যেগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর) বিলাসদ্রব্যের দিকে ধাবিত হয়, ফলে পরিবেশের ওপর চাপ কমে ও তার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়; (2) মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সাথে সাথে কোন দেশের উৎপাদনের ধারা পরিবর্তিত হয়—কৃষির গুরুত্ব কমতে থাকে, শিল্প ও সেবামূলক ক্ষেত্রগুলি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, যেগুলি তুলনামূলকভাবে কম প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর। (3) আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ দূষণরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশ দূষণরোধে জাতীয় আয়ের অধিকতর অংশ ব্যয়িত হয়। অনেক অর্থনীতিবিদ অবশ্য মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ও পরিবেশের গুণগত মানের মধ্যে ওপরে উল্লিখিত সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ (1) 'Environmental Kuznets Curve'-এর পরিমাপের

সময় পরিবেশের গুণগত মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি বায়ু ও জলদূষক পদার্থের পরিমাণের ভিত্তিতে তা পরিমাপ করা হয়—সব ধরনের দূষক পদার্থের (যেমন—জলে Arsenic) সাপেক্ষে তা করা হয় না; (2) কিছু কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ একবার ধ্বংস হয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। পরিবেশের গুণগত মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকেও পরিমাপের মধ্যে আনা হয় না।

ওপরের আলোচনার মূল পন্থা এই যে, পরিবেশ দূষণ ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল এবং এখনো পুরোপুরি প্রণিধানযোগ্য নয়। যে কোনরকম উন্নয়নের ধারাই যেহেতু প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ব্যতিরেকে অব্যাহত থাকতে পারে না—তাই অর্থনীতিবিদ এবং পরিবেশবিদরা বহুদিন থেকেই ভাবার চেষ্টা করেছেন, প্রাকৃতিক সম্পদ ঠিক কিভাবে ব্যবহার করলে বা কি ধরনের সুসংগঠিত পথে উন্নয়নের ধারাকে পরিচালিত করলে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়েও পণ্যের উৎপাদন ও মানব উন্নয়নের ধারা নিরবচ্ছিন্ন রাখা যায়। এখানে আমরা নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা ও মতামত সংক্ষেপে আলোচনা করব।

২.৩ নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন (Sustainable Development) সম্পর্কে ধারণা

'যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা প্রাকৃতিক সম্পদ বা পরিবেশ ব্যবহার করে, তা নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের ধারণার ভিত্তিতে পরিচালনা করা উচিৎ'—এই মতামতের পক্ষে সাধারণতঃ তিন ধরনের যুক্তি দেওয়া হয়। প্রথমত বর্তমান প্রজন্মের মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সম্পর্কে একটি দায়িত্ববোধ থাকা উচিৎ—তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশ এমনভাবে ধ্বংস করা উচিৎ নয় যাতে আমরা যে পরিবেশ বর্তমানে উপভোগ করছি, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তার থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়ত আমরা যদি মনে করি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য (ecological diversity) মানবসভ্যতার অস্তিত্বের প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাহলে এমনভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা উচিৎ যাতে এই বৈচিত্র্য বজায় থাকে। তৃতীয়ত যে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে, সেগুলিই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সর্বোত্তম উপায়—সুতরাং, নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত না রাখলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা inefficient হয়ে পড়ে। এখন, এই তিনটি মতামতের মধ্যে তৃতীয়টির সপক্ষে বিশেষ কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। বাকী দুটি মতামতের অবস্থান অনেকটাই দার্শনিক ও নীতিগত। তাই, নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের ধারণার ভিত্তি দার্শনিক ও নীতিগত। প্রশ্ন হল নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার পদ্ধতিটি কি অর্থাৎ এর জন্য কি ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন।

এই উপায়টি কি, তা বুঝতে হলে প্রথমে 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন' কথাটির অর্থ ভালভাবে বোঝা দরকার—

কারণ, বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও পরিবেশবিদ্ এই কথাটির বিভিন্নরকম অর্থ করেছেন। স্বভাবতই এই অর্থের সঙ্গে 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন-এর উপায়ের ধারণাটি সম্পৃক্ত—একটির পরিবর্তন হলে অন্যটিরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই, প্রচলিত বিভিন্ন 'অর্থের' সঙ্গে সঙ্গে আমরা 'উপায়ের' সম্বন্ধেও ক্রমান্বয়ে আলোকপাত করব। 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন'-এর এরকম পাঁচটি সংজ্ঞার কথা এখানে আলোচিত হল—

(1) একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে তখনই 'নিরবচ্ছিন্ন' বলা যায়, যদি এর দ্বারা কোন দেশের মানুষের সামগ্রিক ভোগের (consumption) পরিমাণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্তিত থাকে বা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জন হার্টউইক একটি উপায়ের কথা বলেন যাতে এই সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন'-এর লক্ষ্যপূরণ অসম্ভব নয়। এই উপায়ে কোন ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদের (exhaustible resource) বা (extraction) থেকে সঞ্চিত লভ্যাংশ (rent) পুরোপুরি কোন উৎপাদনযোগ্য কাঁচামাল/ভোগ্যবস্তুর উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে।

লক্ষ্যণীয়, হার্টউইক-এর বর্ণিত উপায়ে 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন'-এর ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব কেবলমাত্র যদি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অথবা ভোগের ক্ষেত্রে ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প (Substitute) হিসাবে কোনভাবে উৎপাদনযোগ্য কোন বস্তু ব্যবহার করা সম্ভব হয়। স্বভাবতই, এই ধরনের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। তাই হার্টউইক-এর পদ্ধতির আবেদনও সীমিত।

(2) উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি তখনই নিরবচ্ছিন্ন যদি ভবিষ্যতে পণ্য উৎপাদনক্ষমতা অটুট থাকে।

অর্থনীতিবিদ সোলো (Solow) তাঁর এক গবেষণাপত্রে এই ধারণাটির খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেন। লক্ষ্যণীয়, এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা অটুট রাখা যে কেবলমাত্র ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সীমিত রেখেই করা সম্ভব, এমন নয়। Solow-র মতে, অনেকসময় তা ঈপ্সিত-ও নয়। কারণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রুচি ও প্রয়োজন সম্পর্কে কোন ধারণাই আমাদের নেই। সুতরাং, বর্তমান প্রজন্মের রুচি অনুযায়ী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টনের সেরকম কোন যুক্তি নেই। তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তে আমরা যে জ্ঞানের ভাণ্ডার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তৈরি করছি, তাই হয়তো ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট। Solow-র মতে তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ অটুট রাখার যে ধারণা, তা-ই অপ্রয়োজনীয়—এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ বিকল্প হল বর্তমান প্রজন্মের গড়ে তোলা জ্ঞানের ভাণ্ডার।

(3) একটি নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সময়ের সাপেক্ষে মোট প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ কখনো হ্রাস পায় না।

আপাতদৃষ্টিতে এই ধারণাটি Solow-র ধারণার বিপ্রতীপ। কিন্তু, লক্ষ্য করার বিষয় হল, উৎপাদন

প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ যদি একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, তা হলে Solow-র 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নে'র ধারণার সঙ্গে এই ধারণাটির কোন পার্থক্য নেই। পরিবেশবিদদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ক্রমশই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা প্রায় অপরিহার্য। তাই Solow-র মতামত মোটামুটিভাবে 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন' প্রক্রিয়ার উপরোক্ত মতটিকেই অনেক ক্ষেত্রে সমর্থন করে। এছাড়াও সরাসরি ভোগ্যপণ্য হিসাবেও প্রাকৃতিক বস্তুগুলির সমাদরও ক্রমশ বাড়ছে। সেদিক থেকে দেখলেও এই সংজ্ঞাটির পক্ষে সমর্থন মেলে।

(4) একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে তখনই 'নিরবচ্ছিন্ন' বলা যায়, যদি এই প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে, ভবিষ্যতেও ঐ প্রাকৃতিক সম্পদগুলি থেকে সমান উপযোগিতা লাভ করা যায়।

এই মতটি জীববিজ্ঞানীদের। তাঁরা মনে করেন, জলজ বা অরণ্যসংক্রান্ত সম্পদগুলি এমন পরিমাণে ধ্বংস করা উচিৎ নয় যাতে তাদের বংশবৃদ্ধি থেমে যায় এবং এগুলি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং কোন 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন' প্রক্রিয়ার ধারণার সঙ্গে এই মতটির সংযুক্তিও অতীব প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

(5) একটি 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন' প্রক্রিয়ায় সময়ের সাপেক্ষে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

এই মতটি পরিবেশবিদদের (ecologists)। এটি আগের সংজ্ঞাগুলির মতো মানবকেন্দ্রিক নয়—এখানে মানুষকে পরিবেশ ও জীবজগতের একটি অংশ হিসাবে ভাবা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য তখনই থাকে যখন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সে তার পূর্বাবস্থায় আবার ফিরে আসতে পারে। কিন্তু তাই বলে এই ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে জীবজগতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রজাতির ভারসাম্য বজায় থাকতে হবে। এটি ঘটতেই পারে যে, উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় কোন একটি প্রজাতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সেটি বিলুপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু তবুও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হল না। সুতরাং, এই মতামতের ভিত্তিতে কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ/প্রজাতির বিলোপ ঘটিয়েও 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন' সম্ভব যদি পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত না হয়।

২.৪ সারাংশ

দারিদ্র্য ও পরিবেশ দূষণের মধ্যে সম্পর্ক উভমুখী। দারিদ্র্য পরিবেশ দূষণকে ঘনীভূত করে, আবার পরিবেশ দূষণ দারিদ্র্য ত্বরান্বিত করে। দারিদ্র্য থেকে নিষ্ক্রমণের উপায় হিসাবে যে সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়, অর্থনীতিকদের হিসাবে তার ফলে মাথাপিছু আয় ও পরিবেশের গুণগত মানের মধ্যে সম্পর্ক হওয়া উচিৎ 'Environmental Kuznets Curve'-এর মতো। এর কিছু সংখ্যাতাত্ত্বিক সমর্থন পাওয়া গেলেও পরে লক্ষ্য করা গেছে, এগুলি নানা কারণে অসম্পূর্ণ। তাই উন্নয়নের প্রক্রিয়া আর পরিবেশের গুণগত মানের সম্পর্ক নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই এই উন্নয়নের প্রক্রিয়া পরিবেশবিদ তথা

অর্থনীতিবিদদের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন'-এর ধারণাই বহুমাত্রিক। কথাটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে বহু মতামত বিদ্যমান। আমরা এখানে পাঁচটি বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এছাড়াও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

২.৫ অনুশীলনী

(1) উন্নয়ন ও দারিদ্র্যের মধ্যে সম্পর্ক ও বিরোধ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(2) 'Environmental Kuznets Curve' কাকে বলে? Curve-টির 'u'-এর মতো আকৃতির কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(3) 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন'-এর ধারণাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(4) 'হার্টউইক ও Solow বর্ণিত 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন'-এর উপায়গুলির ভাল মন্দ ব্যাখা করুন।

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

(1) Bary Field : *Environmental Economics.*

(2) Titenberg : *Environmental Economics and Policy.*

(3) Pearce and Tumer : *Environmental and Resource Economics.*

একক ৩ ❐ পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ পরিবেশ দূষণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ

৩.৩ আন্তর্জাতিক চুক্তি ও তা রক্ষার সমস্যা

৩.৪ পরিবেশ সংক্রান্ত কতকগুলি আন্তর্জাতিক সমস্যা

৩.৫ আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ

৩.৬ প্রশ্নমালা

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি অধ্যয়ন করার পরে আপনি—

- দূষণ ও বিবিধ আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন।
- দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে অবগত হতে পারবেন।

৩.১ প্রস্তাবনা

আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক নানাবিধ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক মূলধন বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক পরিমাণ—এই সবকটি বিষয়েই পরিবেশ কিছু প্রভাব ফেলতে পারে।

এই বিষয়গুলিকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে :—

(i) **আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্য :** আমাদের দেশ যা আমদানি করে তার মধ্যে পরিবেশ দূষণ করে এমন পণ্য থাকতে পারে, বা এমন পণ্য থাকতে পারে যা অন্য দেশে পরিবেশ দূষণ করে উৎপাদন করা হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই এই আমদানির ওপর বিধিনিষেধ আসতে পারে। একইভাবে আমাদের রপ্তানীর মধ্যে এমন পণ্য থাকতে পারে যা পরিবেশ দূষণ করে বা যা পরিবেশ দূষণ করে উৎপাদন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে রপ্তানীর ওপর বিধিনিষেধ আসতে পারে।

(ii) **আন্তর্জাতিক লগ্নি :** বিভিন্ন দেশে পরিবেশ সংরক্ষণের মান ও আইন বিভিন্ন রকম। তাই যে উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলি পরিবেশ দূষণ করে, নিম্ন সংরক্ষণ মান যে দেশে—এখানে সেই প্রক্রিয়ায় লগ্নিগুলি এসে যাবার একটা প্রবণতা থাকে।

(iii) **আন্তর্জাতিক পরিযান :** পরিবেশ দূষণের মান কোনো দেশে এত বেড়ে যেতে পারে যে, যে সমস্ত মানুষের অন্য দেশে কাজের সুযোগ আছে তারা দূষণমুক্ত পরিবেশ থেকে অন্য দেশে চলে যেতে পারেন।

আন্তর্দেশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবেশ বিষয়টি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) দুটি বা তিনটি দেশ কোনো রসদ একত্রে ব্যবহার করেন তা সংক্রান্ত সমস্যা Trans boundary commons।

(ii) সব দেশ যে সম্পদ ব্যবহার করে তা সংক্রান্ত সমস্যা : (Global commons)।

(iii) এক দেশে সৃষ্ট দূষণ অন্য দেশে চলে যাওয়া : (International Pollution)।

৩.২ পরিবেশ দূষণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ

পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি মূলতঃ পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত। যখন একটি দেশে সৃষ্ট দূষণ জলবাহিত বা বায়ুতাড়িত হয়ে ঐ দেশের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশের পরিমণ্ডল দূষিত করে, তখনই দূষণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টির সঙ্গে তখন কেবলমাত্র দূষক দেশটির স্বার্থই জড়িত থাকে না, অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির স্বার্থও জড়িয়ে পড়ে এবং বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহুপাক্ষিক একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ের রূপ নেয়। দূষক দেশটি যদি আন্তর্জাতিক ক্ষতির

পরিমাণ না ভেবে, শুধুই তার নিজের ক্ষতির কথা ভাবে, তাহলে দূষণের মাত্রা আন্তর্জাতিক চাহিদার থেকে বেশি হয়। আমরা নীচের চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করব—

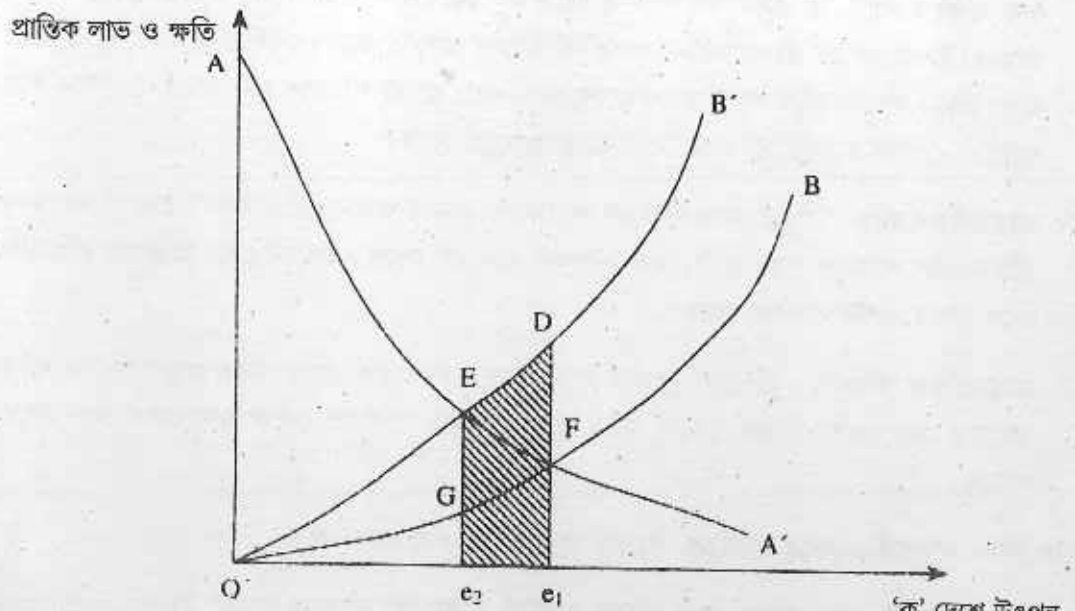

চিত্র 1

ধরা যাক্, 'ক' দেশ একটি দূষক পদার্থ উৎপাদন করে। পদার্থটি কোন একটি ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়। পণ্যটির উৎপাদন যত বেশি হয়, দূষণের মাত্রা তত বাড়তে থাকে এবং পণ্যটির থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিতা (marginal benefit) তত কমতে থাকে। ওপরের চিত্রে AA' রেখাটি দূষণের মাত্রার সঙ্গে প্রান্তিক উপযোগিতার পরিমাণের সম্পর্ক সূচিত করে। অন্যদিকে, দূষক পদার্থটি থেকে দেশটির ক্ষতিও হয়—যত বেশি দূষক পদার্থটি উৎপন্ন হয় প্রান্তিক ক্ষতির (marginal damage) পরিমাণ তত বাড়তে থাকে। OB রেখাটি প্রান্তিক ক্ষতির পরিমাণ সূচিত করে। দেশটি স্থিতাবস্থায় (equilibrium) দূষক পদার্থটি সেই মাত্রায় উৎপন্ন করে যেখানে প্রান্তিক উপযোগিতা আর প্রান্তিক ক্ষতির পরিমাণ সমান অর্থাৎ ওপরের চিত্রে e_1 পরিমাণ। কিন্তু, যেহেতু পদার্থটি বায়ুবাহিত অথবা জলবাহিত হয়ে অন্য দেশের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে সেই দেশগুলির পরিবেশের ক্ষতি করে, তাই কোন দূষণমাত্রায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক ক্ষতির পরিমাণ 'ক'-এর প্রান্তিক ক্ষতির পরিমাণের থেকে বেশি। ওপরের চিত্রে আন্তর্জাতিক প্রান্তিক ক্ষতির পরিমাণ OB' রেখাটি দ্বারা সূচিত হয়েছে। সুতরাং 'ক' যদি আন্তর্জাতিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করত তাহলে স্থিতাবস্থায় e_2 পরিমাণ দূষক পদার্থ উৎপন্ন করত। স্পষ্টতই, $e_2 < e_1$ —অর্থাৎ 'ক' যে পরিমাণ দূষক পদার্থ উৎপন্ন করে, তা আন্তর্জাতিক চাহিদার থেকে বেশি। কিন্তু, যেহেতু

e_1 'ক'-এর স্থিতাবস্থার পছন্দ, একটি সার্বভৌম দেশ হিসাবে সাধারণভাবে কখনোই সে আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে e_2 পরিমাণ দূষক পদার্থ উৎপাদনে রাজি হবে না। তাই, এক্ষেত্রে দূষণের মাত্রা e_2-তে হ্রাস করার বিষয়টি পুরোপুরি 'ক' দেশটির সদিচ্ছা অথবা আন্তর্জাতিক স্তরে 'ক'-এর সঙ্গে অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশের বোঝাপড়ার ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক আইনে এই জাতীয় সমস্যার সমাধানের দুটি উপায়ের কথা ভাবা হয়—

(1) Polluter Pays Principle (PPP) : এক্ষেত্রে দূষক দেশটি অন্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেয়।

(2) Victim Pays Principle (VPP) : এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলি দূষক দেশটিকে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থসাহায্য বা প্রযুক্তিগত সাহায্য দেয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই জাতীয় সমাধানের ক্ষেত্রে ঐকমত্যে পৌঁছানো খুবই কঠিন। সমস্যাটি ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাদের উপরোক্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে সমাধানসূত্রগুলি আমরা আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করব।

প্রথমে PPP নীতিটি বিশদভাবে দেখা যাক। এই নীতিতে দূষক দেশটিকে যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তা চিত্র 1-এ ট্রাপিজিয়াম Ee_2e_1D-এর আয়তন দ্বারা সূচিত হয়েছে। স্থিতাবস্থা F-এ 'ক'-এর total benefit-এর পরিমাণ ছিল AOe_1F, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ফলে তা কমে দাঁড়াবে $AOe_1F - Ee_2e_1D$। কিন্তু 'ক'-এর কাছে Ee_2e_1D-এর একটি opportunity cost-ও আছে। তাই, 'ক'-এর মতো দূষক দেশগুলি সাধারণতঃ এই নীতিতে সম্মত হয় না।

এবার VPP নীতিটি আমরা বিশদে আলোচনা করব। এই নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলি 'ক'-কে কিছু ক্ষতিপূরণ দেয়, তাতে 'ক' দূষণের মাত্রা e_1 থেকে e_2-তে হ্রাস করতে সম্মত হয়। দূষণমাত্রা e_1 থেকে e_2-তে হ্রাস করলে 'ক'-এর ক্ষতি হয় Ee_2e_1F পরিমাণ। এর কারণ দূষক পদার্থটির উৎপাদন কমাতে হলে সংশ্লিষ্ট পণ্যটিরও উৎপাদন কমাতে হয়। ফলে total benefit হ্রাস পায়। অন্যদিকে যেহেতু এর ফলে দূষণের মাত্রা কমে, 'ক'-এর লাভ হয় Ge_2e_1F. স্পষ্টতই, 'ক'-এর নীট ক্ষতির পরিমাণ এক্ষেত্রে EGF. সুতরাং, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলি 'ক'-কে EGF পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিলেই 'ক' দূষণ নিয়ন্ত্রণে সম্মত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিরও এই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়, কারণ এক্ষেত্রে তাদের নীট লাভের পরিমাণ Ec_2e_1D – EGF. আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি Pareto-improving সমাধানসূত্র—সুতরাং সহজেই রূপায়ণযোগ্য। কিন্তু, বাস্তবিকভাবে ব্যাপারটি এত সহজ নয়। কারণ, এক্ষেত্রে 'ক'-এর স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, নিজস্ব প্রান্তিক উপযোগিতার পরিমাণ বাড়িয়ে দেখানোর—AA′

রেখাটি যত ওপরের দিকে থাকে, EGF অর্থাৎ প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তত বেশি হয়। অন্যদিকে, অন্যান্য দেশগুলির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তত বেশি হয়। ফলতঃ, 'ক' লাভবান হয় এবং অন্যান্য দেশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেহেতু কোন দেশের প্রান্তিক উপযোগিতা সংক্রান্ত তথ্য একেবারেই সেই দেশটির নিজস্ব বিষয়, অন্যান্য দেশের পক্ষে তার সঠিক পরিমাপ নির্ণয় করা অসম্ভব ব্যাপার। তাই, শেষপর্যন্ত EGF-এর পরিমাণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে দরকষাকষি হয় এবং যদি শেষ পর্যন্ত কোন সমাধান সূত্রে পৌঁছানো যায়ও, EGF-এর পরিমাণ অনেকাংশেই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির ওপর।

৩.৩ আন্তর্জাতিক চুক্তি ও তা রক্ষার সমস্যা

এখন আমরা আর একটু অন্যরকম একটি সমস্যার কথা আলোচনা করব যেখানে অনেকগুলি দেশ পরিবেশ দূষণের সঙ্গে যুক্ত এবং দূষণ থেকে তারা সকলেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে, কোন দেশ দূষণের জন্য কতটা দায়ী তা নির্ধারণ করাই একটি জটিল সমস্যা। ফলতঃ কোন্ দেশ কতটা দূষণ নিয়ন্ত্রণ করবে বা পরিবেশ দূষণের খরচ কতটা বহন করবে, তা-ই একটি আন্তর্জাতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত ঐকমত্যে পৌঁছে আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে যদি কোন সমঝোতা হয়-ও, তা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দেশেরই সমঝোতা ভঙ্গ করার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। বিষয়টি নীচের সারণীর সাহায্যে আমরা ব্যাখ্যা করব।

সারণী 1 থেকে প্রণিধান করা যায়, সমঝোতা ভঙ্গ করা বা আদৌ সমঝোতায় আবদ্ধ না হওয়া-ই এক্ষেত্রে 'ক' দেশটির অভিপ্রেত। এখন, সব দেশেরই লাভক্ষতিরই হিসাব যদি একই ধরনের হয়, তাহলে

সারণী 1

অবস্থা	'ক'-এর খরচ	'ক'-এর benefits	'ক'-এর নীট benefit
1. সমস্ত দেশ সমঝোতাবদ্ধ	10	20	10
2. কোন দেশ সমঝোতাবদ্ধ নয়	0	–5	–5
3. 'ক' বাদে অন্য সমস্ত দেশ সমঝোতাবদ্ধ	0	19	19

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও তার রূপায়ণ প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। তাই, পরিবেশ দূষণ রোধের বিষয়টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কোন দেশ যদি পরিবেশ দূষণ-বিরোধী চুক্তিতে সম্মত না হয় অথবা যদি চুক্তিভঙ্গ করে, তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সেই দেশটিকে একঘরে করে দেওয়ার প্রস্তাব হয় অথবা সেই দেশটির পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাভাবিক ক্রয়বিক্রয়ের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা করা হয়।

এবারে আমরা সংক্ষেপে পরিবেশ সংক্রান্ত কতকগুলি আন্তর্জাতিক বিষয় ও চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব।

৩.৪ পরিবেশ সংক্রান্ত কতকগুলি আন্তর্জাতিক সমস্যা

(1) **অ্যাসিড বৃষ্টি :** এই সমস্যাটি প্রথম পরিলক্ষিত হয় পঞ্চাশের দশকে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশগুলিতে। কয়লা ও তেলের দহনের ফলে সৃষ্ট সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) এবং নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2) বায়ুবাহিত হয়ে শিল্পাঞ্চলগুলি থেকে প্রায় 600 মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসের আর্দ্রতায় এই পদার্থগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। ফলে, বৃষ্টিপাতের সময় বৃষ্টির জলের অম্লতা বেড়ে যায়। একেই অ্যাসিড বৃষ্টি বলা হয়। এছাড়াও এই পদার্থগুলি ভূপৃষ্ঠের জলের সঙ্গে মিশেও জলের অম্লতা বাড়ায়। জলের অম্লতা বাড়লে শস্য ও জলজ প্রাণী (যেমন—মাছ), ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেহেতু পদার্থগুলি 600 মাইল ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে পড়ে, অনেকসময় এটি একটি আন্তর্জাতিক বিষয় ওঠে।

(2) **ওজোন স্তরের অবক্ষয় :** বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এবং আয়নোস্ফিয়ারে অক্সিজেনের সঙ্গে অতিবেগুনী রশ্মির বিক্রিয়ায় ওজোন কণার সৃষ্টি হয়। ওজোন কণাগুলি দুভাবে আমাদের উপকার করে— (ক) অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণ শোষণ করে, (খ) লোহিত রশ্মি (Infrared radiation) শোষণ করে। সত্তর দশকের শুরুর দিকে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন স্তরের ঘনত্ব কমছে। আশির দশকের মাঝামাঝি আন্টার্কটিকার ওপরের ওজোনস্তরে ছিদ্র পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, ওজোন স্তরের ঘনত্ব 1% কমলে ত্বকের ক্যান্সারের ঘটনা প্রায় 3%-এর ওপর বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও তাঁরা সন্দেহ করেন, এর ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। উদ্ভিদ ও জীবজগতের জিনগত ত্রুটি ঘটে। এছাড়াও জীবজগতের ওপর অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ওজোনস্তরের অবক্ষয়ের মূল কারণ হল CFC (Chlorofluro Carbon) গ্যাসের উদ্গীরণ, যা বিভিন্ন

কাজে, যেমন—হিমায়ন (Refrigeration), প্রসাধন দ্রব্য ও শোধনের উপযোগী দ্রব্যের প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিবিদ্‌রা দেখেছেন, এই জাতীয় দ্রব্যগুলির ব্যবহার আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। সুতরাং, CFC গ্যাসের উদ্‌গীরণের ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ আরোপ না করলে ওজোন স্তরের অবক্ষয় রোধ করা প্রায় অসম্ভব—কারণ,সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত দেশের জাতীয় আয় বাড়ছে এবং এই জাতীয় দ্রব্যাদির ব্যবহারও বাড়ছে।

(3) **গ্রীনহাউস গ্যাস ও আবহাওয়ার পরিবর্তন :** কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও অন্যান্য কয়েকটি গ্যাস (যেমন— CFC, Methane) যা জ্বালানীর ব্যবহার এবং অন্যান্য কিছু দ্রব্যের ব্যবহার থেকে উৎসারিত হয়—বায়ুমণ্ডলে জমা হয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে সূর্যালোকের বিকিরণে বাধার সৃষ্টি করে এবং এইভাবে পৃথিবীর পরিমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়িয়ে তোলে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা 1.5° সেলসিয়াস থেকে 4.5° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে বিভিন্ন দেশে বৃষ্টিপাত কমে যেতে পারে ও মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পেতে পারে। ফলে, কৃষিব্যবস্থা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। মেরুদেশে তুষার বেশি গলে যাওয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বেড়ে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের নীচু স্থানগুলি প্লাবিত হতে পারে এবং দ্বীপ ডুবে যেতে পারে। কয়েকটি দেশ, যেমন—বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, হল্যান্ড প্রভৃতির অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। অন্যান্য দেশের নিচু এলাকাগুলি প্লাবিত হতে পারে। লক্ষণীয়, এই সমস্যাটির থেকে সব থেকে বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি দেশগুলির এবং কৃষিনির্ভর উন্নয়নশীল দেশগুলির। সমস্যাটির জন্য দায়ী মূলতঃ শিল্পোন্নত দেশগুলি এবং জনবহুল দেশগুলি, সেখানে জ্বালানীর ব্যবহার ও অরণ্যসংহারের হার খুব বেশি। তাই, গ্রীনহাউস গ্যাসের উৎপাদন কমানোও একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা।

৩.৫ আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ

আমরা এখানে উপরোক্ত বিষয়গুলির সমাধানের জন্য কতকগুলি আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ও চুক্তির কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

(1) **অ্যাসিড বৃষ্টি :** আশির দশকে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ স্বেচ্ছায় সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রাস অক্সাইডের উৎপাদন হ্রাস করতে সম্মত হয়। এরপরে ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সকলের ক্ষেত্রে এই নীতি মেনে চলার জন্য একটি ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা শুরু হয়। 1998-র জুন মাসে এই

দেশগুলির পরিবেশমন্ত্রীরা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে এই ক্ষতিকারক পদার্থগুলির উৎপাদন কমিয়ে আনার বিষয়ে একমত হন। কিন্তু, এখনো অ্যাসিড-বৃষ্টি জনিত দূষণের সম্ভাবনা নির্মূল করার জন্য দূরদর্শী কোন পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভবপর হয়নি।

(2) **ওজোন স্তরের অবক্ষয় :** এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও রূপায়নে সমন্বয়সাধনের কাজটি করে United Nations Environment Programme (UNEP)। 1985 খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে একটি আলোচনা সভায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই সমস্যাটির সমাধানে গবেষণা সহযোগিতা, তথ্যবিনিময় ও নজরদারির ক্ষেত্রে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। 1988 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 24টি দেশ মনট্রিল প্রোটোকল স্বাক্ষর করে। দেশগুলি ঠিক করে, 1990 খৃষ্টাব্দের মধ্যে তারা প্রত্যেক ওজোন স্তরের ক্ষয়কারী দ্রব্যগুলির ব্যবহার আভ্যন্তরীণভাবে 1986-র মাত্রায় এবং দ্রব্যগুলির উৎপাদন 1986-র মাত্রার 110%-এ কমিয়ে আনবে। উৎপাদনমাত্রা ক্রমশঃ আরো কমিয়ে 1994-এ 80% এবং 1999-এ 50%-এ আনা হবে। 1989 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই দ্রব্যগুলির উৎপাদন কমাতে 1989-91 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উন্নত দেশগুলি 240 মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেবে।

(3) **গ্রীনহাউস গ্যাস ও আবহাওয়ার পরিবর্তন :** 1988 খ্রীষ্টাব্দে কানাডার টরোন্টো শহরে একটি সম্মেলনে ঠিক হয়, 2005 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উন্নত দেশগুলি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের উদ্‌গীরণ 1988-র মাত্রার থেকে 20% হ্রাস করবে। 1992 খ্রীষ্টাব্দে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো শহরে অনুষ্ঠিত Earth Summit-এ 174টি দেশ CO_2-র উদ্‌গীরণ 2000 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 1990-এর মাত্রায় নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। এবার এই প্রস্তাবে শুধুমাত্র উন্নত দেশগুলিই নয়, উন্নয়নশীল দেশগুলিকেও সামিল করা হল। এরপরে, 1995-এর বার্লিন আলোচনাচক্রে অবস্থার পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, রিও-তে গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত বিভিন্ন দেশ যে হারে রূপায়ণ করছে তাতে 2000 খ্রীষ্টাব্দের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ অসম্ভব। ফলতঃ, 2000 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী পর্যায়ে এই সম্বন্ধীয় আইন প্রণয়নের কথা ভাবা হয়। এছাড়াও দেখা যায়, বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান হারে চলতে থাকলে 2000 খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি উন্নয়নশীল দেশগুলির মোট উদ্‌গীরণের মাত্রা উন্নত দেশগুলির থেকে বেশি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, ঠিক হয় উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বেশি করে সচেতন হতে বলা হবে—কিন্তু, তাদের প্রস্তাবিত আইনের আওতায় আনা হবে না। কেবলমাত্র উন্নত দেশগুলিই আইনের আওতায় আসবে। পরবর্তীকালে, 1997 খ্রীষ্টাব্দের কিয়োটা সম্মেলনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল দেশগুলিকেও এই আইনের আওতায় আনতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু, চীন ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জোট G-77 এই

প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে শেষপর্যন্ত আমেরিকার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। তবে, এর ফলে উদ্‌গীরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কতটা ত্বরান্বিত হল, তা বুঝতে হলে আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

৩.৬ অনুশীলনী

(1) পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কয়েকটি সমস্যার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(2) সমস্যাগুলির সমাধানে কি ধরনের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে, তা আলোচনা করুন।

(3) পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান কেন দুরূহ, তা কারণসহ আলোচনা করুন।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(1) Bary Field : *Environmental Economics.*

(2) Titenberg : *Environmental Economics and Policy.*

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মূর্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— *সুভাষচন্দ্র বসু*

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— *Subhas Chandra Bose*

Price : ₹ 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006